মহাপুরুষ আশুতোষ।

আশুতোষ—মহাপুরুষ।

অনেক লোক জগতে আসে,—অনেক লোক জগতে কাজ করে—অনেক লোক জল-বুদবুদের ন্যায় জগৎ হইতে চলিয়া যায়। বহু পক্ষী পতঙ্গ প্রকৃতির অঙ্গে খেলা করিয়া কিছুক্ষণেই বিলুপ্ত হয়। বহু বুদবুদ সাগরে ভাসিয়া সাগরের গায়ে মিশাইয়া যায়। তেমনি বহু মানবও পৃথিবীর কোলে জন্ম লইয়া অনন্তের অঙ্গে মিশাইয়া যায়। এইতো গতি—এইতো পরিণতি! প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব অদ্ভুত ক্রীড়া-রহস্যের রঙ-তামাসা দেখিয়া প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী চক্ষুষ্মান যে সে বিস্মিত-নেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে! কেন?—এ খেলা কেন? জগৎজননী—মহামায়াময়ী—মোহরূপিণী প্রকৃতির এ অপূর্ব্ব অদ্ভুত লীলা-চাতুরী কি জন্য? কেন জীব দুই দিনের জন্য জন্মায়—দুই দিনের জন্য জগতে আসে—আবার দুদিন পরে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চিরতরে চলিয়া যায়? এ কথা যে, মানব-জন্ম—বড় দুর্ল্লভ জন্ম—লাভ করিয়া একবারও চিন্তা করে, হয়তো সেই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে—হয়তো সেই ভাগ্যবান আপনার জীবন জন্মকে ধন্য করিয়া মানব-জন্মের সাফল্য লাভ করিতে পারে। আর যে হতভাগ্যের জীবনে এই শুভ মহর্ত্তের সুবর্ণ সুযোগ না আসে

সে কোন কালেই মানব জীবনের সাফল্য-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না।

এতো বড় জীবনের যত কিছু যাহা কিছু সৌভাগ্য—যাহা কিছু জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর শুভ আশীর্ব্বাদ তাদের সব চাইতে বড় জিনিষ চিন্তা—ভাব। এই চিন্তা—এই ভাব-রস যে ভাগ্যবান লাভ করিয়াছে সেই মানব, জীবনের সাফল্য—সারবত্ত্বা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে।

চাই চিন্তা—চাই ভাবরস—ভাবুকতা। ভাবের সুতা ধরিয়া যে ভাবিতে না পারে, সে কোন কালেই আগাইয়া উঠিতে পারে না। হতভাগ্য সে মাটীর ধুলায় পড়িয়া মাটীতেই মিশিয়া যায়। প্রকৃত উত্থান পতনের গূঢ় রহস্য—যে রহস্য ভাবিতে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়—অন্তরাত্মা যথার্থই প্রচণ্ডবেগে আলোড়িত হইয়া উঠে—সে বুঝিতে পারে না—চিন্তা করিতেও অসমর্থ! হায় রে ভ্রান্ত মূঢ় জীব! তুমি কি ভাবিতে—কি বুঝিতে জগতে আসিয়াছ? কোন দুর্ভাগ্যের বা সৌভাগ্যের ফলে প্রকৃতির হাতে এমন ক্রীড়া পুতুলি হইয়া কত কাল হইতে অন্ধ কীটের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? বড় রহস্য—অতি অদ্ভুত এ রহস্য-জাল! কে এ ভীষণ রহস্য-জালের হাত এড়াইয়া পলাইতে পারে? পারে যেই—সেই একমাত্র ভাগ্যবান—যে জন জীবনে চিন্তা ভাবের অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছে—কেবল সেই ভাবিতে—বুঝিতে পারে—জীবনের এ খেলা কেন—জগতের এ লীলা কোথা হইতে—কি জন্য? এই কথা—এই

তত্ত্ব—এই মহাতত্ত্ব ভাবিবার বুঝিবার জন্যই মানবের উদ্ভব—আর ইহাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ। যে এই মহাপন্থা ছাড়িয়া—এই মহত্ত্বের মহাপন্থা ভুলিয়া—অন্য পন্থায় প্রয়াণ করে কি অন্ধ কি ভ্রান্ত মূঢ় সেই হতভাগ্য! জীবনের গন্তব্য-পন্থা ছাড়িয়া সে না জানি কতকালই না ঘুরিয়া মরে।

বাস্তবিক আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু জনই যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু। কেবলমাত্র সেই জানিতে পারে—বুঝিয়া লয়—জগতের গতি কি—জীবনের সার্থকতা কোথায়! জগৎ—যে অনন্ত কাল যাইতেছে—জীবন প্রবাহ অনন্তের পথে ছুটিয়াছে! কে জানে কোথা বিরাম—কোথা শেষ—কোথা শান্তি! যে আত্মজিজ্ঞাসু, কেবল সেই এই ঘোর রহস্যের গূঢ় প্রহেলিকা উদ্ঘাটনে সমর্থ। সে ভিন্ন আর কেহই নয়।

সত্যই আমি কে—আমার কর্ম্ম কি—আমি এ জীবন ধরিয়া কোন সাধনা সাধিব—এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে জীবনে সেই জীবনই যথার্থ ধরায় ধন্য হইয়া থাকে। তাঁহারা যে কেবল নিজেরাই ধন্য হন এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে জগতের উন্নতি কল্যাণ তাঁহারাই বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার আত্ম-জিজ্ঞাসায়—আত্মোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজও উন্নতি সোপানে পরিচালিত হয়।

উন্নতির নামান্তর শুভ। শুভ মনুষ্যত্বের ভাবান্তর। আনন্দ পরিমাণের পরিবর্দ্ধন সাধনই শুভ শব্দ বাচ্য। এই শুভ আনন্দ সংবর্দ্ধনের জন্যই আত্মজিজ্ঞাসু বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহাপুরুষগণের

অবনীতে অবতরণের কারণ। যাঁহারা জগতে যথার্থ মঙ্গল আনন্দ সংবর্দ্ধনে সমর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ নামের উপযুক্ত ; মহাপুরুষরূপে তাঁহারাই মানব-সমাজের পূজা পাইয়া থাকেন।

বাঙ্গালীর মধ্যে, বাঙ্গালী-সমাজে আশুতোষ সত্যই মহাপুরুষ। যিনি জাতীয়-জীবনের জয়পতাকা ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন—যাঁহার সেই জয়-পতাকা তলে সমবেত হইয়া, জাতীয় ব্যক্তিবর্গ উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়, তাঁহাকে নিশ্চয়ই মহাপুরুষ বলিয়া প্রাণের পূজা প্রদান করিতে কোন হীনমতি হতভাগ্য কুণ্ঠা বোধ করিবে ? আশুতোষ নিশ্চয়ই জাতীয়-জীবনের জয়-পতাকা দৃঢ়করে ধারণ করিয়াছিলেন ; তাহার চরম পন্থায় তিনিও উপনীত হইতে পারিলেন না, জাতীয় জীবনও তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া উপযুক্ত স্থানে পঁহুছিতে পারিল না। নাই পারুক, আশুতোষ স্বজাতিকে মুক্তির পন্থা আনন্দের সংবাদ নিশ্চয়ই দিয়া গিয়াছেন। যদিও আশুতোষের মহামন্ত্র আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে এখনও সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত বা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই—যদিও আশুতোষকে আমরা রাজনীতির ব্যাপারে বিশেষরূপে জানিতে, চিনিতে বা বুঝিতে পারি নাই, ও আমাদের রাজনীতির যাহা মূলমন্ত্র বা মৌলিক-বীজ সেই স্বাধীন জীবনে যে বীর্য্য যে তেজস্বিতা প্রয়োজন—যাহার বলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভে প্রস্ফুটিত রূপে পূর্ণানন্দে অভিব্যক্ত হইবার সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারে, তাহার গূঢ় তত্ত্ব তিনি স্বীয় জীবনে ও কর্ম্মে অঙ্কিত করিয়াছেন ;

জাতির মধ্যে চক্ষুষ্মান্ যে সে তাহার নিদর্শন নিশ্চয়ই অতি উজ্জ্বল ভাবেই দেখিতে পাইবে। সেই মহাতত্ত্বের সন্দর্শন সন্ধান লাভ করিয়া দূরদর্শীদ্রষ্টা দেশের দশের গন্তব্যপন্থা আবিষ্কার ও পরিষ্কার করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। আশুতোষের জীবনী, স্বাধীনতার জীবন্ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের পক্ষে ব্যক্তিগত হিসাবে স্বাধীনতার এমন উজ্জ্বল মূর্ত্তি আর কোথায়? আশুতোষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে এ জনমে কিছু করুন বা নাই করুন—কিছু বলুন বা নাই বলুন—বীর্য্যবান বীর নীরব ভাষায় নীরব চিত্রে যে ছক আঁকিয়া গিয়াছেন—যে ঈঙ্গিত সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান বিবেচকের পক্ষে অতি অতুলনীয়। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে যাহা উপযুক্ত গন্তব্য পন্থা—যাহা ধীর ভাবে ধারণ করা, সাধন করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য, তাহা তিনি জাতীয় জীবনকে প্রচুর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পতিত অন্ধ আমরা—চক্ষুহীন দৃষ্টিহীন দেখিয়াও দেখিতে পাই না—বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। জাতীয়-জীবনের স্বাধীনতা-যজ্ঞে আশুতোষ নীরব কর্ম্মবীর। আস্ফালন—আন্দোলনের বজ্র-নির্ঘোষ আশুতোষের কণ্ঠে নিনাদিত হয় নাই। ফাকা মুখের ফাকা কথা অপেক্ষা—শূন্য কণ্ঠের—অসার হৃদয়ের ফাঁকা চীৎকার অপেক্ষা নীরব কণ্ঠের মন্ত্রদাতা কর্ম্মবীর যদি উচ্চ আসনের অধিকারী হইতে পারেন, তবে আশুতোষের পক্ষে সে দাবীর অধিকার যে যথেষ্টই আছে, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধ বৈরী ব্যতীত কে অস্বীকার করিতে পারে?

ধর্ম্ম-সংস্থাপন অবতারের কার্য্য। মহাপুরুষ অবতার বাচ্য না হইলেও, মহাপুরুষের জীবনের লক্ষ্য—ধর্ম্মরক্ষণ। নৈতিক ভাবের স্ফূরণ, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিবর্দ্ধন বা বিকাশ সাধন ধর্ম্মেরই এক একটি অঙ্গ বা প্রকটিত মূর্ত্তি। যে কোন বিশেষ গুণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিবর্দ্ধনে সমর্থ, তাহাই পূর্ণ অবতারের ভাব না হইলেও, আবতারিক চিহ্ন বলিয়া অবশ্যই স্বীকার্য্য। ভগবান এই গুঢ় অবতার তত্ত্বের ভাব লক্ষণ সম্বন্ধে স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এবতুদ্দেপতঃ প্রোক্তো বিভোতেবিস্তরো মম্॥" ১০
যদযদ্বিভূবিমৎ সত্তং শ্রী-মদূর্জিত মেব বা।
তথদেবা গচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্॥১১

হে পরন্তপ আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। এই বিভূতি বাহুল্য আমি সংক্ষেপে কহিলাম। ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, সম্পত্তি সম্পন্ন কিম্বা প্রভাব বলাদি গুণ দ্বারা সমৃদ্ধ যাহা কিছু আছে, তুমি সে সকলই আমার প্রভাবের অংশ সম্ভূত জানিও।

আশুতোষে বহু গুণের বহু ভাবের বিশিষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল। হেন আশুতোষকে মহাপুরুষ—বিরাটপুরুষ বলিতে কে কুণ্ঠিত?

আশুতোষের বিরাটত্ব সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পত্র 'বঙ্গবাসী' মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন :—"আশুতোষের সবটাই বিরাট ছিল। তাঁহার বপু বিরাট—তাঁহার হৃদয় বিরাট—তাঁহার

বিদ্যা-বুদ্ধি বিরাট—তাঁহার পরিকল্পনা বিরাট—তাঁহার কর্ম্মশক্তি বিরাট—তাঁহার অধ্যবসায় বিরাট। তাই এই বিরাট পুরুষের দ্বারা বাঙ্গালায় বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছিল।

মহাপুরুষের প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন—আত্ম-জিজ্ঞাসা। আমি কে—আমার কর্ম্ম কি—এই জিজ্ঞাসার সূত্র ধরিয়া মহাপুরুষ জগতের উৎকর্ষ ও মানব-সমাজের মঙ্গল বিধান করেন। সেই জন্যই মানব-সমাজের মস্তক স্বতঃই মহাপুরুষের পদতলে নমিত হইয়া থাকে। যে সকল গুণে সামর্থ্যের ফলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অভিব্যক্তি লাভ করে—মানব অতিমানবে বা মহাপুরুষে পরিণত হয়, তাহাদের সকলেরই একমাত্র মৌলিক কারণ—আত্ম-সন্ধান সূত্রে—আত্ম-সম্প্রসারণ-সূত্রে জগতের আনন্দ কল্যাণ বিধান।

মহাপুরুষ আপনাকে বুঝিয়া লইয়া আপনাকে ছাড়িয়া দেন—আপনাকে আপনার জন্য ভুলিয়া জগতের জন্য বিলাইয়া দেন; এইটাই মহাপুরুষের মহৎ লক্ষণ। যে যতই না জ্ঞানী হউক—যতই না শক্তিমান ঐশ্বর্য্যবান হউক যদি জগতের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য আপনাকে না বিলাইয়া দিতে পারে, সে আকাশের চাইতে উচ্চ হইলেও প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিতেও পারে না—মহাপুরুষ বলিয়া মানব-সমাজের পূজা পাইবারও দাবী করিতে পারে না। পরার্থে আত্মবলি মহাপুরুষের মহৎ লক্ষণ। জ্ঞান বুদ্ধি ধৈর্য্য বীর্য্য অপর সকল গুণ,

সকল শক্তি একমাত্র ঐ এক আত্ম-দানের পন্থানুগামী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মহাপুরুষের প্রকৃষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধে যতটুকু কথিত হইল, তাহা ধরিয়া যদি আমরা চরিত্র গুণের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝি তবে এমন পতিত-অবস্থায়ও আমাদের সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া আমরা গৌরব সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইতে পারি। এতো নিরাশার আঁধারেও আশার আলো দেখিয়া যুগপৎ উৎসাহিত পুলকিত হইয়া উন্নতির পথে সবলে সদর্পে অগ্রসর হইতে পারি। আশুতোষ নিশ্চয়ই আমাদের পূজ্য মহাপুরুষ। আশুতোষের অনুসরণ করিলে আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ করিতে পারিব।

আশুতোষ—যোগরূঢ় সজ্ঞার সর্ব্বতোভাবেই অধিকারী। যেমন 'পঙ্কজ' শব্দে পঙ্কে যাহা জন্মায়, তাহা না বুঝাইয়া কেবল এক পদ্মকেই বুঝাইয়া থাকে, তেমনি আশুতোষ বলিলে আমাদের একমাত্র স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কেই বুঝাইয়া থাকে। এই তো মহত্ত্বের মহাপুরুষত্বের এক শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

একটা কথা এদেশে যথেষ্টই প্রচলিত আছে। 'স্বনাম পুরুষ ধন্য'—এই প্রচলিত কথাটি আমাদের জাতীয়জীবনে বড় হৃদয়ের কথা, বড়ই প্রাণের সামগ্রী। এই কথাটি যাহার পক্ষে প্রযুজ্য হয়—যাহার পক্ষে খাটে সে বড় সৌভাগ্যবান পুরুষ। 'বনেদী ঘরের ছেলে' বলিয়া যে যতই বড়াই গর্ব্ব করুক না কেন এই যে 'স্বনাম ধন্য পুরুষ' কথাটা বড়ই দুর্ল্লভ—বড়ই সমাদরের

সামগ্রী। এ সামগ্রী সকলের ভাগ্যে তো ঘটেই না; যাহার ভাগ্যে ঘটে সেই তো মহাজন—মহাপুরুষ। বনেদী আভিজাত্য ইহার সম্মুখে স্বতঃই নতশির—সদাই সঙ্কুচিত। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্ব (personality) জীবনের যাবতীয় সম্পদের মধ্যে এক অতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ব্যক্তিত্বই মানুষকে শ্রেষ্ঠ মানবে—মহাপুরুষে পরিণত করিয়া থাকে। আশুতোষের ব্যক্তিত্ব বাস্তবিক যেমন ফুটিয়াছিল, বাঙ্গালীর ঘরে তেমন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্বের বলেই আশুতোষ প্রধানত মহামানবে পরিণত হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই আশুতোষ অতো বড় আশুতোষ। তাই 'আশুতোষ' বলিতে বাঙ্গালীর মধ্যে এক স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কেই বুঝাইয়া থাকে। তাই 'আশুতোষ' নামটি যোগরূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মহাপুরুষের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহাতে সকল গুণেরই কিছু কিছু আর একটা শ্রেষ্ঠ গুণের সকলই বিদ্যমান থাকে—something of everything and everything of something"। আশুতোষ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়াও গণিত শাস্ত্রের সকল সূক্ষ্মতত্ত্বই অধিগত করিয়াছিলেন। আর কেবল এক গণিতই বা বলিব কেন—আধুনিক বহু বিজ্ঞান দর্শনে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

আশুতোষ সত্যই বিদ্যাবুদ্ধিতে ভারতের হিমালয় ছিলেন। 'নায়ক' বড় কথাই বলিয়াছেন "আশুতোষ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, হিমালয়ের গিরিচূড়া খসিয়া পড়িয়াছে। ভারতীয়

মনীষার ইন্দ্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মনীষা ও কর্ম্ম শক্তির তিরোধান ঘটিয়াছে।

ভারতের স্যার আশুতোষ সত্যই একোমেবাদ্বিতীয়ং। স্যর আশুতোষের তুলনা স্যার আশুতোষ। কবির কথায় বলা চলে তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে। ভারতে দ্বিতীয় স্যার আশুতোষ নাই—কখনও হয় নাই—হইবে কিনা জানি না।

মনীষী-মনস্বী, বিদ্বান বিদ্যানুরাগী, কল্পনায় অতুলনীয়, কর্ম্ম-শক্তিতে অনুপম, স্বজাতি প্রীতির হিমালয় নির্ভীক অকুতোভয়, স্বাধীনচেতা, ব্যবহার-শাস্ত্রে ধুরন্ধর, উচ্চশিক্ষা-জ্যোতি-বিস্তারের অবলম্বন, মাতৃভাষার মর্য্যাদা-বর্দ্ধক, বাঙ্গালীর গৌরব-চূড়া, ভারতের স্পর্দ্ধা স্যর আশুতোষকে হারাইয়া আজ দেশ মাতৃকা যে রত্নহীন হইলেন তাহা বর্ণণার অতীত।”

বাস্তবিক আশুতোষ কি পরিমাণে কি সংখ্যায় এতই বহু গুণের আধার ছিলেন যাহা এই পতিত অভিশাপগ্রস্ত দেশে একেবারেই আকাশ কুসুম বলিয়া মনে হয়। এ হেন পুরুষ সিংহ পতিত জাতির প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

বড়ই সঙ্কটের যুগ, জাতীয় জীবনের সম্মুখে মহাকালের করাল গ্রাসের ন্যায়, মুখব্যাদন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতি মুহুর্ত্তেই কম্পিত প্রাণে জাতীয়-জীবন যেন বিধ্বংসের ভয়ে আকুলিত উৎকণ্ঠিত! অতি ক্ষীণ প্রাণে—ক্ষীণদেহে—ক্ষীণ দৃষ্টিতে প্রতি পলে আমরা বিনাশের আশঙ্কায় কম্পান্বিত! হেন

সঙ্কটের দিনে দুর্দ্দশার দুঃসময়ে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে—কে অধোপতনের মুখ হইতে উদ্ধার করিবে? আশুতোষকে দেখিয়া—আশুতোষের শক্তি দেখিয়া—আশুতোষের কার্য্যগতি দেখিয়া আমাদের পতিত জাতির হতাশ চক্ষু বড় আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল। তিনি যে মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান যুগে বর্ত্তমান অবস্থায় জাতির গতি মুক্তির পন্থা দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীর গভীর ভাবে জাতিকে প্রকৃত পথে পরিচালনা করিতে পারিতেন।

ভাবুক চিন্তাশীল অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি লেখক চিলশির সুধী পুরুষ কার্লাইল বলিয়াছেন:—

জাতীয় জীবনকে যিনি গড়িয়া তুলেন—গড়িয়া তুলিবার অসাধারণ শক্তি ধারণ করেন—সেই বীর্য্যবান, জ্ঞানবান লৌহ মানব (iron man) নেতা নায়ক—তিনিই মহাপুরুষ। আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন—দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সৎ শিক্ষার সূক্ষ্মসূত্র ধরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয়-জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আজি দেশের বহু চিন্তাশীল নেতা আমাদের জাতীয় জীবন-তত্ত্বের প্রশ্ন লইয়া চিন্তা করিতেছেন—নানাভাবে নানা সূত্রে তাহার আলোচনা করিতেছেন—মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সেই জটিল তত্ত্বের বিশদ মীমাংসায় আজিও কেহই সম্যকরূপে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই—কতদিনে হইবেন তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায় না। আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন—আর সেই বুঝ শেষ পর্য্যন্ত

ধরিয়া রাখিয়াছিলেন—যে সৎ শিক্ষার সূত্র অবলম্বন করিয়া জাতীয়-জীবন গঠনের জটিল-তত্ত্ব মীমাংসা করিতে হইবে।

বাঙ্গালী জাতি—একা বাঙ্গালী জাতিই বা বলি কেন—বিশাল ভারতের সকল জাতিই এখন অশিক্ষার কুশিক্ষার গাঢ় আঁধারে পড়িয়া অন্ধ জড় হইয়া রহিয়াছে। মৃতকল্প জাতীয়-জীবনে প্রদীপ্ত প্রাণের স্পন্দন আনিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সৎ শিক্ষার ব্যবস্থা বিধান করিতে হইবে। যে জাতির সৎ শিক্ষা নাই, সে জাতির জীবনে মহৎ চরিত্রের বিকাশ নিতান্তই অসম্ভব। চরিত্র-বলে বলীয়ান না হইলে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কখনই জীবনে জাগিতে পারে না। তাহাতে জাতীয় জীবন কখনই বীর্য্যবান হইতে পারে না, প্রতিভালোকে প্রদীপ্ত হইতে পারে না। সে স্বতঃই অবসন্ন মৃততুল্য হইয়া পড়ে। জাতীয় অবস্থা আমাদের তাই এতো হীন এতই দীন—দিন দিন এমনই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থার চক্র আর কিছুকাল চলিতে থাকিলে আমাদের জাতীয় জীবনের মৃত্যু অতি নিশ্চিত—অতি অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য। এক দিকে যেমন ভাত কাপড়ের সুব্যবস্থা করিয়া দেশের অন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে হইবে, তেমনি সৎ শিক্ষার বিধান ব্যবস্থা করিয়া জাতীয় জীবনকে সুগঠিত সমুন্নত করা প্রয়োজন। কেবল মুখে 'রাজনীতি' 'রাষ্ট্রনীতি' বলিয়া ফাঁকা চীৎকার বা লম্ফ ঝম্ফ করিলে, জাতীয় হিসাবে আমরা কোন শুভ ফল লাভ করিতে পারিব না। আশুতোষ জাতীয় জীবনে এ সূক্ষ্ম তত্ত্বে

গুঢ় গভীর মর্ম্ম প্রকৃত রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই আশুতোষের কর্ম্মক্ষেত্র ফাঁকা মৌখিক রাজনৈতিক ব্যাপারে নিবদ্ধ ছিল না। আশুতোষ জাতীয়-জীবনের উৎকর্ষ-প্রক্রিয়ার মৌলিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেন। সেই অনুসন্ধানের ফলে বেশ বুঝিয়াছিলেন, যে সৎশিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের-মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এই গুঢ়তত্ত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া আশুতোষ সৎশিক্ষার পন্থা সম্প্রসারণের জন্য মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন—শিক্ষার পবিত্র মন্দিরে আত্ম-বলিদান করিয়াছিলেন। হেন মহাপুরুষকে যে প্রাণের পূজা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে নিশ্চয়ই নরাকারে পশু বা পিশাচ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বংশ কথা।

আশুতোষ বিরাট পুরুষ—মহাপুরুষ। এমন মহাপুরুষের জীবনী লেখা যে কত বড় কঠিন ব্যাপার তাহা যে লেখক কখন সে চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, কেবল তিনিই জানেন—সে ব্যাপারের গুঢ় তত্ত্বের গুঢ় ফল তিনিই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাপুরুষ আশুতোষের কাহিনী কহিবার পূর্ব্বে তাঁহার বংশ কাহিনী একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

জিরাট বলাগোড় হুগলি জেলার অন্তর্গত এক অতি প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম। এই গ্রাম বহু গণ্য বরেণ্য ব্যক্তির বাসস্থান। বহু মান্য গন্য কুলীন ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিবাসে এই স্থান অলঙ্কৃত। তদ্ব্যতীত ইতর ভদ্র নানা জাতীয় নানা শ্রেণীর জনগণ এখানে বাস করিয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতেছে। জিরাট বলাগড় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান বঙ্গের এক বিশিষ্ট অঞ্চল বলিয়া বিখ্যাত। জিরাট বলাগড় দুই বিভিন্ন পল্লী হইলেও উভয়ের সান্নিধ্য বশতঃ সাধারণত এক বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে। এই স্থানে অনেক সময়ে অনেক গুনীগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

যে বংশে মহাপুরুষ আশুতোষের জন্ম হয় উহা জিরাট বলাগড়ের এক বিখ্যাত বংশ। ধনে মানে কুলে শীলে এই

বংশের খ্যাতি প্রতিপত্তি অতীব প্রসিদ্ধ। এই বংশ সময়ে সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছে।

আশুতোষের পিতা ৺গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই জিরাট বলাগড় গ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশের এক বিশিষ্ট বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থ সরল বঙ্গভাষায় লিখিত। বহু ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। এখন যাহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করিতেছেন, ডাক্তার গঙ্গপ্রসাদের এই গ্রন্থ তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। গঙ্গাপ্রসাদ যে কেবল ডাক্তারি গ্রন্থ প্রণয়নে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এমন নহে, চিকিৎসা-শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী হইয়াও বিশেষ দয়ালু ছিলেন। এদেশে ডাক্তারদের এক কলঙ্ক আছে, বিশেষতঃ আজি কালি সে কলঙ্কের মাত্রা বড় কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার ডাক্তারেরা রোগীর অবস্থা যেমনই হউক না, আপনাদের প্রাপ্য দাবীর টাকা তাঁহাদের বুঝিয়া পাওয়াই চাই। রোগী মরিতেছে, তাহার টাকা দিবার তেমন ক্ষমতা নাই, কিন্তু ডাক্তারের ফি তাহার যোগাড় করিতেই হইবে। নতুবা কিছুতেই তাহার নিস্তার নাই। অবশ্য সকল ডাক্তারই যে

এতটা কঠোর তাহা আমরা বলি না। সদাশয় হৃদয়বান ডাক্তারও আছেন বৈ কি। কিন্তু সে সংখ্যা বড়ই অল্প। ত্যাগের দৃষ্টান্ত আজি কালি ডাক্তারদের মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। গঙ্গাপ্রসাদ, ডাক্তারদলের এক অত্যুজ্জল রত্ন ছিলেন। তিনি বড়ই সদাশয় হৃদয়বান ডাক্তার ছিলেন। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তিনি প্রাপ্য টাকার দাবী করিতেন। অনেক স্থলে তিনি আদৌ টাকা লইতেন না। রোগী নিতান্ত নিরন্ন বা দুরবস্থাপন্ন হইলে, তিনি সকল স্থানেই প্রাপ্য টাকার আদৌ দাবী করিতেন না। এমন কি কোন কোন স্থলে নিজ ব্যয়ে রোগীর পথ্য সুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিতেন। যে রোগী তিনি হাতে লইতেন, তাহার আরোগ্য সাধনের জন্য প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা করিতেন। তাহাতে কি রাত্রি কি দিন—কি শীত কি বৃষ্টি তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার দায়ীত্ব জ্ঞান খুবই প্রবল ছিল। তিনি নাকি অনেক সময় বলিতেন—চিকিৎসা-ব্যবসা বড় কঠিন ব্যবসা। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া যে কাজের ভার হাতে লইতে হয়, তাহার গুরুত্ব দায়ীত্ব সব কাজ চাইতে বেশী; এমন গুরুতর কাজে হাত দেওয়া আর তীক্ষ্ণ তরবারি লইয়া লড়াই করা প্রায় একই কথা। বাস্তবিক এ কথাটি অতি কঠোর সত্য কথা। এ কথার মূল্য আজি কালি অনেক ডাক্তার জানেন না—বা জানিয়া বুঝিয়াও জানিতে বুঝিতে চান না।

শুনা যায় নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান গঙ্গাপ্রসাদের এতই দায়ীত্ব

জ্ঞান ছিল যে রোগীর জন্য তিনি প্রাণপণ করিতেও নাকি কুণ্ঠিত ছিলেন না। একবার কোনরূপে তাঁহার হাতে রোগীর ভার সমর্পণ করিতে পারিলে রোগীও নিশ্চিন্ত হইত—রোগীর আত্মীয়-স্বজনগণও নিশ্চিন্ত হইত। গঙ্গাপ্রসাদের এই গুণে—রোগীর জন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন চেষ্টা করিতেন—এই গুণে তাঁহার প্রতি রোগীর যেমন প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাইত, সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তিও তাঁহার প্রতিততই আকৃষ্ট হইত।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের সহৃদয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও তাঁহার সমসাময়িক লোক দুই এক জন আছেন। তাঁহাদের কাছে শুনা যায় গঙ্গাপ্রসাদ যথার্থ হিন্দু ডাক্তার ছিলেন। প্রকৃত হিন্দু যেমন হৃদয়বান হয় বা হওয়া উচিত, গঙ্গাপ্রসাদ তেমনি হিন্দু ডাক্তার ছিলেন। তিনি হিন্দুর প্রাণ হিন্দুর হৃদয় লইয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, হিন্দুর প্রাণ হিন্দুর হৃদয়ের সহিত সে ব্যবসা সমাধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের হিন্দু বৈদ্যগণ চিকিৎসার জন্য ধনীগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিতেন, আবার দরিদ্র অনাথগণকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা সাহায্য করিতেন। গঙ্গাপ্রসাদের ব্যবসা সম্বন্ধে ব্যবহারও সেইরূপ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ধনীগণের নিকট হইতে অন্যায়রূপে দাবী করিয়া ধন গ্রহণ করিতেন না। যদিও তিনি অকাতরে দরিদ্র রোগীদিগকে সাহায্য করিতেন,কিন্তু তাই বলিয়া ধনীগণের প্রতি অন্যায় দাবী দাওয়া করিয়া অর্থ লইতেন না।

গঙ্গাপ্রসাদ হিন্দুপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নৈতিক চরিত্র দৃঢ় ও পবিত্র ছিল। তাঁহার সময়ে ডাক্তার বলিতে প্রায় 'মদ মুরগী খোর' কলুষিত চরিত্র এক বিকট পুরুষকে বুঝাইত। 'ডাক্তার' বলিলেই সেইরূপ এক বিকট চিত্র সাধারণের মানস পটে স্বতঃই অঙ্কিত হইয়া উঠিত। সেই জন্য ডাক্তারি কার্য্যের উপর আস্থা থাকিলেও ডাক্তারি-চরিত্রের উপর সাধারণের বিশেষ আস্থা ছিল না। গঙ্গাপ্রসাদ নিজ চরিত্রগুণে সাধারণের হৃদয় হইতে সে বদ্ধমূল ধারণা বিদূরিত করিয়াছিলেন। গঙ্গা-প্রসাদ সৎগুণে, সৎচরিত্রতায়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁহার সম সাময়িক কালে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

বাঙ্গলা ভাষায় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের বেশ দখল ছিল। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলাভাষা দেশে বিদেশে বড় ঘৃণার সামগ্রী ছিল। এখন বাঙ্গালী জাতি বলিতে আমরা যেমন একটা ঘৃণিত জাতি হইয়াছি, তেমনি তখন জাতিহিসাবে না হউক ভাষা হিসাবে বাঙ্গালীর ভাষা—বাঙ্গলা ভাষা নিতান্ত নিকৃষ্ট হেয় বলিয়া বিবেচিত হইত। পরের কাছে তো দূরের কথা—আমাদের নিজেদেরও কাছে বাঙ্গলা ভাষা বড় নীচ ভাষা বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী 'বাঙ্গলা ভাষায়' কথা কহিতে —বা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে অপমান বোধ করিত। পরাধীন দাস হইলে, দাসের যেমন স্বভাব হয়, আপনার বলিয়া যাহা কিছু তাহা জানিতে চিনিতে পারে না—তাহার সম্মান সমাদর করিতে জানে না,—কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ঠিক সেই দশাই হইয়াছিল।

সেই শিক্ষা দীক্ষা গতি মতির ফলে তখন বাঙ্গালী নিজ মাতৃ-ভাষাকে পায়ে দলাইয়া পরকীয় ভাষাকে আপন করিয়া লইতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইত। পরপদলেহী কুকুরের মত পরের প্রদত্ত-প্রসাদ ভোজন করিয়া, পরের ভাষায় বুলি বলিয়া বুক ফুলাইয়া বড়াই করিয়া বেড়াইত। হেনকালে গঙ্গাপ্রসাদ মাতৃ-মন্দিরে বসিয়া মাতৃ-ভাষার পূজা করিয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ আপন ভাষায় পুস্তক লিখিয়া—যে সে পুস্তক নহে,কঠিন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গলা পুস্তক লিখিয়া—আপনাকে কৃতার্থ ও নিজ দেশকে ধন্য করিয়াছিলেন। যখন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি প্রথম লেখনী-হল পরিচালনায় বঙ্গভাষার অতি বন্ধুর অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রথম ফসল ফলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন বিজ্ঞানের দিক দিয়া গঙ্গাপ্রসাদের প্রভা-প্রভাব সেই ক্ষেত্রে দীপ্তিমান হইয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদের বাঙ্গলা ভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক সত্যই বড় সমাদরের সামগ্রী। যেমন ভাষার দিক দিয়া, তেমনি বৈজ্ঞানিক বিবৃতির দিক দিয়া তাঁহার চিকিৎসা পুস্তক অতি উপাদেয়। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে, বাঙ্গলা দেশে ইংরাজী-অনভিজ্ঞ বহু বাঙ্গালী ডাক্তার আবির্ভূত হইয়া, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িতা বাঙ্গালার দুস্থ-জনের মৃত-জীবনে সঞ্জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। এ কথা অস্বীকার করিলে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করা হয়। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের এই স্বজাতীয়তা সাহিত্যে অনুরাগ-সূত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পুত্র আশুতোষও জাতীয় সাহিত্যের

প্রতি যে কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, তাহা লিখিয়া জানাইবার বা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বহু গুণের আধার ছিলেন। তিনি যেমন অধ্যবসায়ী কঠোর কর্ম্মবীর ছিলেন, তেমনি স্বহৃদয় সদাশয় রূপে সমাজের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সুচিকিৎসার গুণে বহু পরিবার ঋণী রহিয়াছে—এ কথা এখনও পর্য্যন্ত অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরোধর্ম্ম ভয়াবহ" গীতার এই মহা-সূত্র তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি ডাক্তার হইয়া পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশারদ হইয়া, তখনকার তথাকথিত শিক্ষিত গণের ন্যায় নিজ ধর্ম্মে অবিশ্বাস বা অনাস্থা স্থাপন করেন নাই। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের সমসাময়িক কোন বিখ্যাত অধ্যাপক ও সম্পাদকের মুখে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের গুণ জ্ঞান গতিবিধি সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে পুত্রের ন্যায় পিতার মধ্যেও কিছু অসাধারণত্ব ছিল। তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ জনগণ হইতে অতি উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার মধ্যে কোনরূপ 'হামবড়াই' দম্ভ ভাব আদৌ ছিল না। তিনি নীরব কর্ম্মবীর ছিলেন।

কেবল ব্যবসার খাতিরে, অর্থের খাতিরে, তিনি ডাক্তারি ব্যবসা করিতেন না। অর্থাৎ তিনি ব্যবসায়ী'—কদর্থে 'ব্যবসায়ী' বলিতে যাহা বুঝায়—সেইরূপ ব্যবসায়ীরূপে ডাক্তারি বৃত্তি অবলম্বন বা পরিচালন করেন নাই। মানব সমাজের

একটা শ্রেষ্ঠ ও শুভপ্রদ বিজ্ঞান মনে করিয়া তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নও করিয়াছিলেন ও সেইরূপ পবিত্র ভাবেই উহা অবলম্বনও করিয়াছিলেন। চিকিৎসা-কার্য্য যেন তাঁহার জীবনের একটা পবিত্র সাধনা রূপে পরিণত ও পরিচালিত হইয়াছিল। চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, তিনি এক'এলাপ্যাথি' শাস্ত্রের আলোচনা ও পরিচালনা লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেন। এই ব্যাপারে তিনি অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি যথার্থই নীরব কর্ম্মবীর ছিলেন। পুত্রও তেমনি অসাধারণ অধ্যবসায়ী কর্ম্মী—কর্ম্মীনয় কর্ম্মযোগী বা কর্ম্মবীর হইয়াছিলেন। আশুতোষ গুণবান পিতার গুণবান পুত্র (worthy son of the worthy father) ছিলেন। আশুতোষ 'বাপকাব্যাটা' বা বাবারও বাবা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তেমনি বাপেরই তো এমনি ছেলে হইয়া থাকে।

একটা গাছ তৈয়ার করিতে কত যত্ন কত পরিশ্রমের প্রয়োজন। আর একটা ছোট ছেলেকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে যে কত যত্ন চেষ্টা বুদ্ধি বিবেচনার দরকার, তাহা কেবল দায়ীত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন পিতার নিকটই পরিজ্ঞেয়। জেমস্ মিল আপন পুত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিলকে গঠন করিয়াছিলেন। জেমন মিল নিজে পরম পণ্ডিত দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিজ পুত্রকে দর্শন শাস্ত্রে তেমনি বা ততোধিক ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য আধারে কিছু ইস্পাত থাকা চাই বৈ কি, নইলে শুধু

হাতুড়ির ঘায়ে ধার তীক্ষ্ণ হয় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দর্শনে, গভীর গবেষণা ক্ষেত্রে, যে কি অসাধারণ শক্তি ছিল, তাহা বহু আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সুপরিচিত। জেমস মিল, জন ষ্টুয়ার্টের কৃতীত্বের মৌলিক পূর্ণ কারণ না হইলেও, আংশিক হেতু যে তাহা কেহই অস্বীকার করে না—করিতে পারেও না। আশুতোষের জ্ঞান ও গুণ-গৌরবের জন্য পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদও যে এক মৌলিক বিশিষ্ট কারণ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

আশুতোষের জননী স্বর্গীয়া জগত্তারিণী দেবীও উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্তা জননী ছিলেন। জননী দেবীও অশেষ গুণের আধার-স্বরূপিণী ছিলেন। শ্রেষ্ঠ হিন্দুকুলের পবিত্র-গৃহ যেরূপ সতীসাধ্বী রমণী-রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত পরিশোভিত হইয়া থাকে, আশুতোষের জননী সতী-শিরোমণি জগত্তারিণী দেবী—তাহার আদর্শ স্বরূপা ছিলেন। বহু ভাগ্যফলে—বহু তপস্যার পুণ্য বলে,—এমন রমণী-রত্ন কুলের কূলবতী হইয়া অবতীর্ণা হন। যে কুলে যে বংশে তিনি আগমন করেন, সে কুল সে বংশ ধরায় ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যায়।

দেবী জগত্তারিণী যত গুণে বিভূষিতা ছিলেন, তন্মধ্যে দয়া মায়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্র পূজ্যা বরণীয়া করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি যখন যেস্থানে থাকিতেন, সেই স্থানের বহু দরিদ্র ব্যক্তি, বহু পরিজন তাঁহার দয়া মায়ার আশ্রয়-তরুতলে দাঁড়াইয়া অনেক সময় শান্তি-সুখ অনুভব করিত—

আপনাদিগের প্রাণের দুর্ব্বিসহ জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইত। কি শ্বশুরকুলের কি পিতৃকুলের, বহু অনাথ—আশ্রয়হীন দরিদ্র ব্যক্তিকে যথাশক্তি সাহায্য দান করিয়া, অথবা অবস্থা অনুসারে সুমিষ্ট বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিয়া, তাহার প্রাণের বেদনা নিবৃত্তি করিবার জন্য তিনি স্বতঃই যত্নবতী ছিলেন।

গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে, তিনি সাধ্বী হিন্দুরমণীর ন্যায় অতি যত্ন ও সমাদরের সহিত তাহাদিগের পরিতোষ বিধানের জন্য আগ্রহান্বিতা হইতেন। পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিগণের প্রতি সদাই দয়াবতী স্নেহময়ী জননীর মত তিনি আচার ব্যবহার করিতেন। হিন্দু-গৃহের পবিত্রতা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, তজ্জন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সদাই আকৃষ্ট রহিত। তাঁহার দয়া স্নেহের প্রবাহ সদাই উন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বদিকে প্রবাহিত ছিল। তাঁহার ন্যায় জননী, যথার্থই আশুতোষের জননী হইবার উপযুক্তা।

শ্রেষ্ঠা গর্ভধারিণীর গর্ভেই শ্রেষ্ঠ পুরুষের জন্ম হইয়া থাকে। সংসারের কর্ম্ম-পটুতায় আশুতোষের জননী পরম শক্তি-সম্পন্না রমণী ছিলেন। সংসারের কার্য্য-কলাপ সমাধা করিয়া তিনি যাহাতে পুত্রের শারিরিক ও মানসিক উন্নতি সংবর্দ্ধিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। পিতার ন্যায় জননীও পুত্র আশুতোষের অভ্যুদয়ের অন্যতম এক প্রধান হেতু। যাঁহারা আশুতোষের পারিবারিক অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

আশুতোষ—শৈশবে।

তিথি নক্ষত্র ও রাশি লগ্নাদি লইয়া হিন্দুর জীবনগতি ও পরিণতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত সকল সময়ে ঠিক সত্যরূপে নাও ঘটিতে পারে। সেটা বহুস্থলে নির্দ্ধারণের দোষ—জ্যোতিষ-শাস্ত্রের দোষ নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আজি কালি অনেকেই বুঝিয়াছেন, ও অনেকেই জানিয়া বুঝিয়া নিঃসন্দেহে মানিয়াও লইতেছেন। শুভ রাশি লগ্ন অনুসারে জন্মলাভ করিলে মানব-জীবনের গতি পরিণতি যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা বহুব্যক্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আশুতোষ নিশ্চয়ই অতি শুভ রাশি ও শুভ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের জীবনের পরিণতি ও সাফল্য দেখিয়া কে না সে কথা স্বীকার করিবে?

আশুতোষ যে কুলে জন্মিয়াছেন সত্যই সে কুল সে বংশ ধন্য হইয়াছে—যে দেশে জন্মিয়াছেন সে দেশ ধন্য হইয়াছে—যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের জন্মে সেই ব্রাহ্মণ-জাতি ভরদ্বাজ-বংশও ধন্য কৃতার্থ হইয়াছে। আশুতোষের উর্দ্ধতম পিতা মাতা আদি পূর্ব্ব পুরুষগণও নিশ্চয়ই এমন সু-সন্তানের জন্মে আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছেন। যদি পরিণামে আত্মীয় স্বজনের সহ সম্মিলন ব্যাপার সত্য হইত বা হয়, তবে কে না বলিবে—কে না মানিবে

—যে আশুতোষের ইহধাম ত্যাগে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ আপনাদিগকে মহাভাগ্যবান বলিয়া সাগ্রহ-নেত্রে—পরম উৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাকে আপন আবাসে আহ্বান করিতেছেন।

আশুতোষ স্বনামধন্য মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষের জন্ম নক্ষত্রও অতি মহৎ শুভদ। অতি শুভমুহূর্ত্তে আশুতোষ ভারত-ভূমিকে ধন্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

আশুতোষের জীবন-গতি দেখিয়া, তাঁহার জন্ম যে দৈবাভিমুখী,—তাহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। ভগবান মানবের জন্ম সম্বন্ধে—দুই সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এক দৈবঅভিমুখী অপর অসুর অভিমুখী।

"দ্বৌ ভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুরত্র বচ।'

হে পার্থ ইহলোকে প্রাণীগণের দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার ভাব আছে।

আবার বলিতেছেন :—

অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধিজ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতঃ।
দানং দমধশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংস সত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ লোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপল্যম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহে নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত॥

হে ভারত, ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, তত্ত্বজ্ঞানের উপায়ে

আস্থা, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ শান্তি, খলতাহীনতা সর্ব্বভূতে দয়া লোভ শূন্যতা, অহঙ্কাররাহিত্য, কুকর্ম্মপ্রবৃত্তিতে লজ্জা চাপল্যশূন্যতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হিংসা রাহিত্য, এবং আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া যে অভিমান তাহার অভাব, এইগুলি দৈবী সম্পদভিমুখেজাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।

আশুতোষ বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষ। তিনি এই সকল গুণেই বিভূষিত ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভালরূপে জানেন —যাহারা তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছেন—যাঁহারা সৌভাগ্য ফলে তাহার সাহচর্য্যলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে আশুতোষ দৈবী সম্পৎ-সম্পন্ন মহাপুরুষ রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ইংরাজী ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন তারিখে আশুতোষ শুভক্ষণে এই কলিকাতা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সূতিকা গৃহে তাঁহার অসাধারণ ভাব অবশ্যই তাঁহার জনক জননীর হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। মহাপুরুষের প্রতিভা প্রভা যে জন্ম হইতেই প্রকটিত হয়। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ভস্মে আচ্ছাদিত থাকিতে পারে না, অসাধারণ পুরুষর্ষভ আশুতোষের অত্যুজ্জল ভাব তেমনি অপ্রকটিত রহিল না। জন্মকালে আত্মীয় স্বজন যাহারা তাঁহার প্রভা দর্শন করিল, তাহাদেরই মনে একটা অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ উৎফুল্লতার ভাব আবির্ভূত হইল।

তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ভবিষ্যৎ-অভ্যুদয়ের কথা তখন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল।

আশুতোষ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি সম্পন্ন-মস্তিষ্ক ও বিশাল প্রশস্ত হৃদয় লইয়া ভূমিষ্ট হন। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যে এ সকল গুণ যেমন অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহার বীর আকারেও প্রথমাবধিই তাহা প্রকটিত হইয়াছিল। চরিত্রের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের দুইটা অতি প্রধান ও প্রবল গুণ। আশুতোষের দৈহিক আকারে তাহা যেন জন্মগত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আশুতোষ, জননী ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া যখন শৈশবে পদার্পণ করিলেন, তখন হইতেই এই দৃঢ়তা নির্ভীকতা ক্রমেই অধিকতর ভাবে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শৈশব-অবস্থায় ছোট ছোট কাজের মধ্যেও তাঁহার এই দুই শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত।

আশুতোষের নয় বৎসর বয়সে, ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ ভবানীপুরে আসিয়া বাস করেন। এই খানে আসিয়া আশুতোষ স্থানীয় চক্রবেড়ে বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরিত হইলেন। তাঁহার পাঠানুরাগ প্রথম হইতেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি প্রত্যহ নিয়মিত পাঠ এরূপ ভাবে শিক্ষা ও প্রস্তুত করিতেন যে তাহা দেখিয়া তাঁহার শিক্ষক বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতেন। পাঠ সম্বন্ধে আশুতোষের দক্ষতা ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তখন যে দেখিয়াছে সেই চমৎকৃত হইয়াছে। আশুতোষ যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন

পুরুষ (genius) ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই—বিচারবিতর্কের অবসরও কিছুমাত্র নাই। সাধারণ বিশ্বাস এই যে প্রতিভাশালী পুরুষ কখন বেশী পরিমাণে পরকীয় শক্তি-প্রসূত-সামগ্রী লইয়া নাড়া চাড়া বা আলোচনা অনুশীলন করিতে পারে না। আশুতোষ সম্বন্ধে এ নির্দ্দেশ একেবারেই প্রজুয্য হইতে পারে না। আশুতোষ যদিও নিজস্ব উদ্ভাবনী-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি গোড়া হইতে পরের জিনিসে যেখানে যাহা কিছু ভাল দেখিতেন বা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই আগ্রহে জড়াইয়া ধরিতেন। পরের ভাল জিনিস অধিগত করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না—এমনই সহজাত হৃদয় মস্তিষ্ক লইয়া তিনি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরের ভাল জিনিস নিজস্ব করিয়াও তাহাকে এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার প্রচুর পরিমাণেই ছিল। শৈশবে শিক্ষা কাল হইতেই তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্ন পাঠের সময়েও তিনি শিক্ষকগণের নিকট এই নূতনত্ব ও মৌলিক ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন। আশুতোষের পিতাও পুত্রের পাঠের উন্নতি উৎকর্ষণ জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তখনই তাহার ব্যবস্থা বিধান করিতেন। পুত্র যাহাতে মানুষের-মতন-মানুষ হয়, তৎপক্ষে পিতার তীব্র দৃষ্টি ছিল। কিছু দিনে বাঙ্গলা অধ্যয়ন সমাধা করিয়া তিনি ইংরাজী স্কুলে প্রেরিত হইলেন। অধ্যয়নের

প্রথম অবধি পুত্রের অধ্যয়নের প্রতি আশুতোষের পিতার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পুত্র যেমন বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের নিকট অধ্যয়ন অনুশীলন করিতেন, গৃহে পিতার নিকটও তাহার পাঠালোচনায় ত্রুটি হইত না। পিতা, গৃহে ও ভ্রমণকালে সন্তানকে সঙ্গে লইয়া নানাবিধ জ্ঞান ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। পিতা পুত্র এই সময়ে পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন।

ভ্রমণ কালে পিতা আশুতোষকে যে কেবল লেখা পড়ার কথাই শিখাইতেন এমন নহে; তিনি তৎকালে পুত্রকে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য কথা শিক্ষা দিতেন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ যে কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্রে বা ডাক্তারী কার্য্যে অভিজ্ঞ ছিলেন এমন নহে, তিনি পুত্রের ন্যায় নানা শাস্ত্রে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বহু বিষয়ের বহু কথাই পিতা, গল্প গুজবের ছলে পুত্রকে শিক্ষাদিতেন। ক্ষুদ্র শিশু যে অতিমানবে পরিণত হয়, তাহার মৌলিক কারণ কেবল তাহার নিজের ব্যক্তিগত শক্তি বা নিজস্ব প্রতিভার ফল নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঘটিত অনেক ব্যাপারই তাহার পরিস্ফুরণ পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। সে সকল অবস্থার মধ্যে পিতা মাতার প্রভাব বিশেষ প্রবল বলিয়া সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার করিতে হয়। জাতি জন্মগত ভাব (heridity) আধুনিক শারীর-বিজ্ঞান অনুসারে প্রকৃতি-গঠনের ও গুণ-বিকাশের এক প্রধান কারণ বলিয়া নীর্ণিত হইয়াছে। আশুতোষের পক্ষে সে বিধানের

প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বাঙ্গালীর সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, একথা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। আশুতোষের ন্যায় ছেলে, তেমনি শক্তিধর গুণবান পিতার পক্ষেই সম্ভব।

আশুতোষ জন্মাবধি দৈহিকশক্তি সুগঠনের অধিকারী হইয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান অনুসারে একটি তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে শারিরিক গঠন ও দৈহিক যন্ত্রাদির শক্তি বিকাশ অনুসারে প্রধানত মানবের মন, মানবেরচরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। হিন্দুর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একথা মানিতে চায় না। হিন্দুর পক্ষে আধ্যাত্মিক বিকাশ অনুসারে মানবের দেহ। আত্মার যেরূপ প্রকৃতি বা অভিব্যক্তি, জীবাত্মা তদনুসারে দেহ লাভ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান বলে—দেহ অনুসারে আত্মা, আর আমাদের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অনুসারে আত্মার বিকাশে দেহ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলে—'দৈহিক গঠন ও যান্ত্রিক সংখ্যা অনুসারে দেহাভ্যন্তরীণ জীবাত্মা প্রকটিত হইয়া থাকে,' আর আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলে—'না—তাহা নহে। যাহার যেমন আত্মা অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে আত্মা যেমন বিকশিত হইয়াছে, তাহার দেহ তদনুরূপ উপযুক্ত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রাচ্য পাশ্চাত্য এই উভয় মতের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উভয় তত্ত্বই পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা যথার্থ রূপে ঠিক না হইলেও, হিন্দু আমরা—আমাদের প্রাণে এই কথাটাই জাগে—এই কথাটাই

ভাল লাগে—আশুতোষ পূর্ব্ব জন্মে পূর্ব্ব জীবনে নিশ্চয়ই খুব বড় কর্ম্মী ছিলেন। তিনি ভগবানের লীলা-রাজ্যে একজন বড় খেলার সাথী নিশ্চয়ই ছিলেন। তাই উচ্চপ্রকৃতি উচ্চ জ্ঞান বিদ্যা ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি মনীষা অনুসারে তিনি দৈহিক বিকাশও লাভ করিয়াছিলেন।

আশুতোষের দেহ সবল সুদৃঢ়, হৃদয় প্রশস্ত ও মস্তক শ্রেষ্ঠ মানবের উপযোগী ও উপযুক্তই ছিল। শৈশব হইতেই দৃঢ় দেহ লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। শুধু দৃঢ় দেহই বা বলি কেন—দৃঢ় সবল মানসও কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান সঙ্গী ছিল। যাঁহারা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহারা জানেন আশুতোষের দৈহিক গঠন ও দৈহিক ভঙ্গি সম্বন্ধে তাহাদের সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই কেবল সে সাদৃশ্য ধরিতে পারা যায়। ফলে তাঁহাদেরই ন্যায় আশুতোষের দেহ সবল সুদৃঢ় ছিল। মস্তকের গঠনও শ্রেষ্ঠ মানবের উপযুক্ত ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জল ছিল তাঁহার প্রতিভা পূর্ণ প্রখর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনি যাহার প্রতি—যে জীবনের প্রতি বা কার্য্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতেন, মনে হইত যেন সেই জীবন বা কার্য্যের অতি গভীরতম প্রদেশে তাঁহার সেই অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গিয়া পঁহুছিয়াছে। আশুতোষের চক্ষে ও চক্ষের দৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভা ফুটিয়া পড়িত। তাঁহার নাসিকা ও কপাল দেখিলে স্বতঃই মনে হইত সত্যই তিনি শ্রেষ্ঠ

বিরাট পুরুষ। তাঁহার অধর ওষ্ঠ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের লীলাভূমি বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইত। কর্ণদ্বয় সুখ সম্পদের উপযোগী হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যব্যঞ্জক ছিল তাঁহার বিরাট বিশাল গোঁপ জোড়াটি। তাঁহার গোঁপের প্রাচুর্য্য—দেখিলে বোধ হইত পৌরুষ পুরুষকার স্বয়ং মূর্ত্তি ধরিয়া তদুপরি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। আশুতোষের এই গোঁপের প্রাচুর্য্য নবীন বয়সেই বিকশিত হইয়াছিল।

যেমন দৈহিক দৃঢ়তা ও অসাধারণ মানসিক শক্তি বৃত্তি লইয়া তিনি শৈশবে পদার্পণ করিলেন, তৎসঙ্গে অধ্যয়ন-ব্যাপারেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। সে সম্বন্ধে বড় বেশী কথা না বলিলে—বেশী নাড়া চাড়া না করিলেও চলে। কেননা সে সকল কথা এতই সাধারণ ও সর্ব্বজন-পরিচিত যে সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলা কেবল পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যে বিদ্যালয়ে যখন যে শিক্ষক আশুতোষকে নিজ ছাত্ররূপে লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই বিদ্যালয়ের সেই শিক্ষকই আপনাকে মহাভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়াছেন। আশুতোষের বুদ্ধিশক্তিতে তাঁহার শিক্ষকগণ যেমন বিমুগ্ধ ছিলেন, তাঁহার সৎগুণে সৎ চরিত্রতায় তাঁহারা ছাত্রের প্রতি তেমনি আকৃষ্ট ও স্নেহময় হইতেন। তাহার অত্যুজ্জল নিদর্শন তাঁহার মৃত্যুকালে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহোদয় উৎকলের একজন অতি

বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। আশুতোষ তাঁহার ছাত্র। আশুতোষের মৃত্যুতে যে তিনি কতই কাতর—কতই প্রাণে ব্যথা পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ক্রন্দনে ও দীর্ঘনিশ্বাসে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মধুসূদন বাবুর তাৎকালিক অবস্থা দর্শন করিয়া, তখন অনেকেই নিতান্ত আকুল হইয়াছিলেন—অনেকেই আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এমন হৃদয়ের আকর্ষণ আজি কালি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন মধুর স্নেহ-ভাবের দৃশ্য এখন নিতান্তই বিরল নয় কি? ছাত্রের প্রতি এতো স্নেহ—এমন অনুরাগ—অধুনা আশুতোষ নিজ গুণে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সকল জীবনের সকল চরিত্রভাবই এই-রূপ অপূর্ব্ব—এমনই মধুর—এমনই অনুকরণীয়। আশুতোষ ছাত্র-অবস্থায় নিজ ব্যবহারে সকল শিক্ষককেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। হিন্দু-শিষ্যের গুরুভক্তি যেমন প্রসিদ্ধ—গুরুর প্রতি যেমন সম্মান সমাদর প্রদর্শন আবশ্যক, আশুতোষ কোন স্থলে কোন অংশে তৎসম্বন্ধে ক্রটি করেন নাই। শিক্ষক, পড়াইয়া বুঝাইয়া যেমন সুখী হইতেন, ছাত্র পাঠের পরীক্ষা প্রকৃতরূপে প্রদান করিয়া, শিক্ষককে তেমনি সন্তুষ্ট করিতেন। ফলে ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শনে ছাত্র আশুতোষ যেমন শিক্ষককে পরিতুষ্ট রাখিতেন, অধ্যয়নের কৃতীত্ব দেখাইয়াও গুরুকে তেমনি সুখী করিয়া তুলিতেন। শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতি এমনই পরিতুষ্ট ছিলেন যে তাঁহারা সকলেই একমনে তাহার উন্নতি মঙ্গল ও

কৃতকার্য্যতা প্রার্থনা করিতেন। কখন কোন শিক্ষক যে আশুতোষের প্রতি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এমন কথা কখনও শুনিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুরদেশে হিন্দু ছাত্র শিক্ষককে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করে, ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের বিধান। যুগ-যুগান্তর হইতে এইরূপ বিধান—গুরু-ছাত্রের মধ্যে এই পূজ্য পূজক ভাব—প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন ঋষি-যুগে ছাত্র শিষ্যগণ, ভিক্ষা করিয়া, গোচারণাদি করিয়া—গুরুসেবা গুরুপালন করিত। শিক্ষক গুরুকে পিতার ন্যায় দেবতুল্য বোধ করিয়া তাঁহার সেবায় ও পূজায় জীবন উৎসঙ্গ করিত। গুরুশিক্ষকগণও ছাত্রকে পুত্রবোধে পালন ও শিক্ষা প্রদান করিতেন। ইহাই এ দেশের পরম পবিত্র প্রথা বলিয়া পরিচিত ও আদৃত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা ও ভাবগতির প্রভাবে সে পবিত্র প্রথা দিন দিন এদেশ হইতে তিরোহিত হইতেছে। এখন বিদ্যালয়ের—বিশেষতঃ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও ছাত্রদিগকে পূর্ব্বের মত আর স্নেহময় পিতার চক্ষে দেখেন না, সেরূপ আন্তরিকতার সহিত শিক্ষাদান করেন না। পক্ষান্তরে ছাত্রগণও আর ভক্তিমান পুত্রের ন্যায় শিক্ষককে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না-- তাঁহার প্রতি তেমন সম্মান সমাদর প্রদর্শন করে না —তাঁহার কথায় বা শিক্ষায় সেরূপ আস্থা স্থাপন করে না। এখন ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে যেন একটা বিকট ব্যবসাদারী-ভাব—যেন হেয় জঘন্য দোকানদারী ভক্তি দিন দিন ফুটিয়া উঠিয়াছে। কয় জন ছাত্র এখন শিক্ষাগুরুর আদেশ

শিরোধার্য্য করিয়া বহন করিতে পারে? কোথায় কোন শিক্ষাগুরু আর ছাত্রের পীড়া বা কোন দৈব দুর্ঘটনা অথবা দুরবস্থার জন্য চিন্তিত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন? কোন শিক্ষক আর পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে চিন্তান্বিত বদনে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যছাত্রের আরোগ্য মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকেন? কেন এমন হইল? একমাত্র ব্যবসাদারী ভাব আর অর্থের লোভ শিক্ষা ব্যবসায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই অনর্থ এই পবিত্র দেশে ঘটাইয়াছে। এ বিকট ভাবটা দিন দিন যেন বিশেষ বিক্রমের সহিত বাড়িতেছে। ইহা নিবারণের উপায় কি? উপায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ যিনি ছিলেন—উপায়কে যিনি সবলে ঘাড়ে ধরিয়া আনিতে পারিতেন—তাহাকে টানিয়া আনিয়া যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আবার পরম পবিত্র বিধান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন সে মহাপুরুষ আশুতোষ যে আর নাই। কে এ পতিত অভিশপ্ত দেশে আবার পবিত্র শিক্ষার পূত বীজ বপন করিয়া পুণ্যময় শিক্ষাক্ষেত্রে মৃতকল্প শিক্ষা-বিধানে পুনর্জ্জীবন প্রদান করিবে? কে আবার এই নীরস প্রাণহীন শুষ্ক শিক্ষাতরুকে এদেশে সঞ্জীবনী-সুধায় সঞ্জীবিত করিয়া স্বর্গীয় শোভাময় ফুল ফলে পরিশোভিত করিবে? আর যে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে মহারথী সব্যসাচী আশুতোষ নাই! শ্রেষ্ঠ ইংরাজী শিক্ষায়-শিক্ষিত, পরিতুষ্ট পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষাগুরু ও শিষ্যছাত্রের মধ্যে অধুনা যে বিকট ভাব দাঁড়াইয়াছে—আর দিন দিন যে তাহা বাড়িয়া যাইতেছে। এই বিষ-কাণ্ডের

মূলে কুঠারাঘাত করিতে ক্ষমবান পুরুষ-সিংহ ছিলেন যে আশুতোষ! সে ভার্গবতুল্য-বীর্য্যবান আধুনিক যুগের শিক্ষা-ক্ষেত্রের আচার্য্য বা অবতার আশুতোষ আর নাই—সে প্রচণ্ড তীক্ষ্ণধার যামদগ্ন্য-কুঠারও আর নাই!

আশুতোষ অধ্যয়ন-কালে যেরূপ শিক্ষাগুরুকে ভক্তি সম্মান করিতেন, তাহা সত্যই বর্ত্তমানে ছাত্রগণের পক্ষে অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপ। গুরুভক্তিতে যথার্থই তিনি বর্ত্তমান যুগের একলব্য। যাঁহারা তাঁহার একসময়ে শিক্ষাগুরু ছিলেন, সুযোগ সময় ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য দক্ষিণাদানে পশ্চাৎপদ বা কুণ্ঠিত হইতেন না। এখন বহুছাত্র, অধ্যয়ন সমাধা হইলেই, শিক্ষাগুরুর কথা বিস্মৃতির স্রোতে জন্মের মত ভাসাইয়া দেন। তাঁহাদের সহিত যে আর কোন পবিত্র দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বা থাকিতে পারে তাহা ভুলিয়া যান; আশুতোষ যে ধাতুতে গঠিত, সেইরূপ কঠোর ভক্তিমান লোক ছিলেন। শিক্ষাগুরুকে ভক্তি সম্মান করা তাঁহার জীবনের এক প্রধান পবিত্র কর্ত্তব্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি কথোপকথনে—কোন প্রসঙ্গে কোন শিক্ষাগুরুর কথা উপস্থিত হইলে, শেষ জীবনেও তিনি অতি সম্মানের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন—তাঁহাদের কথা কহিতেন।

অধ্যয়ন-ব্যাপারে আশুতোষের অধ্যবসায় অতুলনীয়। তিনি পাঠ্যরূপে যাহা একবার ধরিতেন, তাহা পূর্ণরূপে আয়ত্তী-কৃত না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। যাঁহারা জগতে মহৎ

হইয়া জন্মগ্রহণ করেন—যাঁহারা জগতের জন্য বড় কাজ করিতে আইসেন—অধ্যবসায় তাঁহাদের প্রকৃতিগত দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়। আশুতোষ বড় হইয়া জন্মিয়াছিলেন—জাতির জন্য—জাতির জন্য কেন—জগতের জন্যই বড় কাজ করিতে আসিয়াছিলেন। অধ্যবসায় যে তাঁহার প্রকৃতিগত সহজ গুণ হইয়া দাঁড়াইবেই। মহৎ লোক—শ্রেষ্ঠ পুরুষ—যিনি তিনি সত্য বলিয়া—শুভ বলিয়া—যাহা বুঝেন, তাহা একবার ধরিলে, আর কিছুতেই ছাড়েন না। আশুতোষ উচ্চশিক্ষার জন্য এদেশে যে কৃতীত্ব, যে কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা জগতে সকল সভ্য শিক্ষিত সমুন্নত সমাজের আদর্শরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত। যে কোন সভ্যদেশের শিক্ষিত লোক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য-বিদ্যা, প্রতীচ্য-জ্ঞানের সম্যক অনুশীলনে সমর্থ হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা বিধানের আয়োজন অনুষ্ঠান কি অল্প কৃতীত্বের কথা? আর সে কৃতীত্বের সমাধান কি সামান্য অধ্যবসায়ের ফল?

শৈশবে শিক্ষাকাল হইতেই আশুতোষ অধ্যবসায়-শক্তির প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যা-শিক্ষায়—শিক্ষা আলোচনায়—সর্ব্বদাই দৃঢ়-সঙ্কল্প ছিলেন। যে বিষয় যখনই আলোচনা অনুশীলন করিতেন, তাহাই সম্পূর্ণরূপে অধিগত আয়ত্ত না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেন না। অনেকে অধ্যবসায়কে 'এক গুঁয়েমি' বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক আশুতোষ অধ্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া 'এক গুঁয়ে ছেলে' ছিলেন না। তিনি

যাহা ধরিতেন, তাহা সিংহ-বিক্রমেই ধারণ করিতেন সত্য, কিন্তু পিতা মাতা বা অভিভাবকবর্গ কোন কার্য্য নিষেধ করিলে, শান্ত সুশীল বালকের ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া সমাদরে সসম্মানে তাহা গ্রহণ করিতেন। একবার ধরিয়াও যদি কোন বিষয় ভুল বলিয়া বুঝিতেন তবে তখনই তাহা ছাড়িয়া দিতেন। তাঁহার অধ্যবসায় ছিল বলিয়া একগুঁয়েমী—যাহাকে ইংরাজীতে foolhardiness বলে—তাহা ছিল না। বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ মানবের সৎগুণরূপে যে ভাবের বা যতটুকু অধ্যবসায় প্রয়োজন তাহাই যথেষ্ট পরিমাণে আশুতোষে বিদ্যমান ছিল।

শৈশবে অধ্যয়ন-কাল হইতেই আশুতোষ গণিতশাস্ত্রে সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। গণিতের জটিল প্রশ্ন লইয়া অনুশীলন আলোচনা করিতে তিনি স্বভাবতই বড় ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা হইতেই অঙ্ক-বিষয়ে তাঁহার এতো কৃতীত্ব—এতো খ্যাতি প্রতিপত্তি।

তন্ময়ত্ব অধ্যবসায়ের নামান্তর। তন্ময়ত্ব সাধনারই ভাবান্তর ; যে সাধক হইয়া জন্মগ্রহণ করে—যত বড় কাজ সাধন করিতে মানব-জন্ম লইয়া জগতে আসে,—সে যাহা ধরে, একমাত্র তাহাই লইয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। সেই একই সাধনা তাহার জীবনের ধর্ম্ম—জীবনের কর্ম্ম—জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। সে সেই সাধনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যায়। ইষ্ট-মন্ত্ররূপে সেই মহামন্ত্র বরণ করিয়া লইয়া, মহাপুরুষ মহাযোগীর ন্যায় নীরবে সদাই সেই মন্ত্র-সাধনা করিতে আত্মনিয়োগ

করে। মহাযোগী আপনাকে ভুলিয়া যান—আপনার দেহ মন আত্মীয় স্বজন সকলই ভুলিয়া যান—সেই সময়ে জীবন জগতের সকল ব্যাপার বিস্মৃতির অতল-সলিল-তলে নিমজ্জিত করিয়া ফেলেন। সেই মূলমন্ত্রের সহিত আপনাকে মিশাইয়া মহাসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার পক্ষে তখন আপনার ও সাধ্য বা সাধনার মধ্যে কোন পার্থক্য বা ব্যবধান থাকে না। আশুতোষ যখন জটিল গণিত-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, তখন তিনি সত্যই আত্মহারা হইতেন - জগৎ যেন তৎকালে তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইত। এমন কি তখন তিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন—আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। অঙ্কশাস্ত্রে আশুতোষের ন্যায় সাধক পুরুষ এদেশে তো নাই—পাশ্চাত্য-জগতেও অধুনা বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে যাহা যথার্থরূপে ভালবাসে, তাহাকে সে সত্যই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়রূপেই আলিঙ্গন করিয়া থাকে। আশুতোষ গণিতকে সত্যই প্রাণের বড় প্রিয়সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। গণিতের আলোচনা অনুশীলন তাঁহার পক্ষে প্রাণের এক মহা-পূজা—জীবনের এক মহাব্রত-সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে ইহা যথার্থই যোগসাধনায় পরিণত হইয়াছিল।

আশুতোষ গণিত অনুশীলন করিতেন—গণিত-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাই বলিয়া তিনি অন্য বিষয়ে উপেক্ষা করিতেন না। গণিত ব্যতীত সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল

প্রভৃতি অন্য অন্য বিষয়েও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। অনেক প্রতিভাশালী এমন ছাত্র দেখা যায়, যাহাদের এক বিষয়ে বিশেষ দখল থাকিলে, অন্য বিষয়ে বড় জ্ঞান থাকে না। যে গণিতে বড়, সে হয়তো সাহিত্যে নিতান্ত দীন। আশুতোষ তেমন ছিলেন না। গণিত তাঁহার প্রিয় সাধনা ছিল সত্য, তাই বলিয়া তিনি অপর বিষয়ে ভুলিতেন না—বা তাহাদের প্রতি ঔদাস্য করিতেন না। যাহাকে যথার্থ 'চৌকোশ' অর্থাৎ 'চারি চৌপাটে সমান' বলে আশুতোষ সেই স্কয়ার পুরুষ ছিলেন। তাই অধ্যয়ন-ব্যাপারে তাঁহার এতই সাধনা-সাফল্য—এতই কৃতীত্ব-কৌশল।

আশুতোষ বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে তখনকার বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা প্রদান করিলেন। পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

তখন ভবানীপুরে 'সাউথ সুবরবনা' বিদ্যালয়ের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি এস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আশুতোষ বাঙ্গলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই বিদ্যালয়ে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। এখানে তিনি এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে 'সাউথ সুবরবণের' শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত প্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী। শিবনাথ যে বাঙ্গালীর মধ্যে একজন কিরূপ বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন, তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালীর সকলেই জানেন। পাশ্চাত্য দর্শন বা সাহিত্যাদিতে তদ্ব্যতীত সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত, বর্ত্তমান বঙ্গে অল্প লোকই ছিল।

তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইলে, তৎসম্বন্ধে পৃথক পুস্তক লিখিতে হয়। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তির প্রকৃষ্ট জীবনী যে আজিও বাঙ্গলায় বাহির হয় নাই, ইহা দেশের পক্ষে একটা বিষম অভিশাপ বিশেষ। দোষের মধ্যে শিবনাথ যৌবনের চাপল্যে পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই যা মহা-ভ্রম; নতুবা তাঁহার মত পণ্ডিত—বিদ্যাবুদ্ধিতে তেমন সুদক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গলায় বড়ই বিরল।

আশুতোষকে পাইয়া শিবনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। যেমন্ গুরু তেমনি শিষ্য! বৃহস্পতির শিষ্য স্বয়ং ইন্দ্র! শুভক্ষণে মণি কাঞ্চন সংযোগ হইল!

ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়া আশুতোষ সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ সফলতা দেখাইতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শিক্ষকগণ যেমন পরিতুষ্ট হইতেন, তাঁহার পিতামাতাদি অভিভাবকগণও তেমনি প্রীতি লাভ করিতেন। তৎকালে তাঁহার অধ্যয়ন-ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা ও সাফল্য দেখিয়া সকল-কেই চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল। কি সাহিত্য, কি গণিত, কি বিজ্ঞান সকল বিষয়েই আশুতোষ যেন পূর্ব্ব হইতেই কৃতবিদ্য হইয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইত—এমনই তাঁহার কৃতীত্ব দক্ষতা ছিল। আশুতোষের মানসিক বৃত্তি সকলই অদ্ভূত ছিল। মনোবিজ্ঞানের (Psychology) এক সাধারণ বা বিশেষ বিধান এই যে একই মানবে সচরাচর সকল বৃত্তি সমান

ভাবে পূর্ণাঙ্গে বিকশিত হয় না—হইতে পারে না। ইহা প্রকৃতির এক স্বাভাবিক নিয়ম। কোন মানবে কল্পনা বৃত্তি (imagination) কোন মানবে বুদ্ধি (Reason) কোন মানবে স্মৃতি (memory) অধিক। যে মনে স্মৃতি-শক্তি অধিক সে মনে হয়তো কল্পনা-শক্তির প্রভাব অতি অল্প। আবার যে মানসে কল্পনাশক্তি প্রবল, সে মনে গবেষণার সামর্থ্য খুবই কম। মানসিক শক্তি-বৃত্তি-ব্যাপারে এইরূপ নানাজনে নানারূপ প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ মানবে কিন্তু এই মানসিক বিধান-ব্যাপারে বিশেষ ব্যত্যয় বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আশুতোষ যেন মানসিক বিধানে বৈপরত্য দেখাইয়া জীবন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। মানসিক সকল বৃত্তিই যেন তাঁহাতে পূর্ণাঙ্গে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কি স্মৃতিশক্তি, কি কল্পনাবৃত্তি, কি গভীর গবেষণা সকল উচ্চ মানসিক বৃত্তি শক্তিতেই তিনি সম্পূর্ণ পরিমণ্ডিত ছিলেন। কি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে কি কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যকালে—সর্ব্বত্রই তিনি মানসিক বৃত্তির পূর্ণাভিব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা উনিভারসিটির কার্য্যে, তিনি যেমন বিচার ও সামঞ্জস্য সাধন ব্যাপারে গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নূতন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট কল্পনা-কৌশলের কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন।

আশুতোষ সাউথ সুবরবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ অপর কোনই প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলনা। তিনি সকল বিষয়েই সুদক্ষ

ছিলেন। তিনি সকল পরীক্ষাতেই সকল ছাত্র অপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। তাহার কারণ শ্রম অধ্যবসায়ের সহিত বুদ্ধি প্রতিভার একমাত্র একান্ত সহযোগ।

আশুতোষ প্রথমাবধিই শ্রমশীল পুরুষ ছিলেন। তিনি শ্রম ও কর্ম্মকে মানব-জীবনে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-কবিবর লঙফেলো যে কর্ম্ম-গাথা গাহিয়াছেন :—

"Act act in the living present" এই বচনের সারবত্তা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। কর্ম্ম ও শ্রম-প্রসঙ্গে তিনি এক সময়ে যে অত্যুৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দার্শনিক-তত্ত্বের এক অতি সার উপাদেয় তত্ত্ব বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য। একবার এক চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন কর্ম্মটা মানব-জীবনের একটা বিকট অভিশাভ। দার্শনিক হার্বার্টের কথার নজীর ধরিয়া তিনি বলেন যে—দার্শনিক হারবার্ট যে বলিয়াছেন—"work is an evil but it is necessary to avoid greater evil অর্থাৎ কর্ম্মটাই মন্দ, তবে অধিকতর মন্দ জিনিষটা দূর করিবার জন্য ইহার দরকার। আশুতোষ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন— কর্ম্মই সাধনা। সাধনাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। কর্ম্মই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। আশুতোষ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই দৃঢ়রূপে নিজেও ধরিয়া থাকিতেন—পরকেও ধরিয়া থাকিতে বলিতেন। কর্ম্মকে তিনি মানব-জীবনের এক

প্রধান সম্পদ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। আত্মীয় বন্ধুবর্গকেও তিনি কর্ম্মী হইবার জন্য—কর্ম্মক্ষেত্রে লৌহমানবের ন্যায় দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া দর্পী সাধক হইবার জন্য—উপদেশ দিতেন। তিনি কর্ম্মযোগী ছিলেন। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবল কর্ম্মের অনুরোধে কর্ম্ম করিবার জন্য, কর্ম্ম করিতেন। শুনিয়াছি তিনি নাকি সদাই বলিতেন—ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল কর্ম্মের জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, তদপেক্ষা আনন্দের জিনিস—পুণ্যের সামগ্রী জগতে আর কিছুই নাই—মানব জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। এই তো কর্ম্মযোগ—এই তো নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর দৃঢ় আদর্শ-দণ্ড।

কর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটা কথা আশুতোষের শুনিয়াছি। জানি না কথাটা কতদূর সত্য। তবে ভবানীপুরের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখেই কথাটা শুনিয়াছি। আশুতোষ পেন্‌সন লইয়া, জজীয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, জাতীয় শিক্ষার উৎকর্ষ উন্নতি সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া, অসীম উৎসাহেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে উদ্যোগী হইলেন। তখন তাঁহার কোন কোন 'ধর্ম্মপ্রিয়' বা ধ্যানপ্রিয় অন্তরঙ্গ আত্মীয় বলিয়াছিলেন —'আর কেন?' আশুতোষ দৃঢ় দর্পিত কণ্ঠে তাঁহাদিগকে কহিলেন 'আমি শুইয়া পড়িয়া হরিনাম করিতে তো পারিব না।' আশুতোষ এমনই দৃঢ়তার সহিত কথাটা কহিলেন যে তাঁহাদের হৃদয়ের জীবন্ত স্থরে কথাটা আঘাত করিল। তাঁহারা তাহা নত শিরে মানিয়া লইলেন। তর্ক যুক্তি প্রয়োগ যে নিতান্তই

নিষ্ফল বা নিস্প্রয়োজন তাহা সহজেই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন।

শুনিয়াছি আর এক স্থলে আশুতোষ গীতার কর্ম্মযোগের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছিলেন—'আজ কাল আমরা মুখে মুখে কথায় কথায় কৃষ্ণ-পূজা করি—গীতার বচন আওড়াইয়া গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বুলি বলি—কিন্তু কার্য্যকালে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মতত্ত্বের সারমর্ম্ম একেবারেই ভুলিয়া যাই। গীতায় শ্রীভগবান্ কর্ম্মযোগের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি॥

কেহই কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না, এবং কেবল মাত্র সন্ন্যাসেই অর্থাৎ কর্ম্ম-ত্যাগেই সিদ্ধি পাইতে পারে না।

আরও বলিয়াছেন ;—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপিজাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না ; প্রকৃতিজ (সত্বাদি) গুণ সকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।

সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তোমের শ্রীমুখ-নিসৃত কর্ম্ম সম্বন্ধে এই নিগূঢ় তত্ত্ব আশুতোষ পূর্ণাঙ্গে বুঝিয়াছিলেন। কেবল যে শুধুই বুঝিয়া-ছিলেন তাহা নহে, বুঝিয়া তাহাকে মহামন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন—এবং সেই মহামন্ত্র সাধনায় আত্মাহুতি প্রদান করিয়া মানব-জীবনকে ধন্য ও মানবজন্মকে সফল কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল হইতেই তিনি কর্ম্মবীর কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মের গতিবিধি দেখিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে কর্ম্মের খাতিরে তিনি কর্ম্ম করিতেন—ফলের আকাঙ্ক্ষা আদৌ রাখিতেন না। তিনি গোড়াগুড়ি বেশ বুঝিয়াছিলেন—নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত কেই বা তাহা না বুঝিতে পারে—যে এই পতিত দেশে গণিত বিজ্ঞানাদির অনুশীলনে কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ সুফলের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে কথা ভালরূপে বুঝিয়াও তিনি গণিত-শাস্ত্রকে যোগ-সাধনের ন্যায় সাধনা করিতেন। ইহা নিষ্কাম-কর্ম্মের—কর্ম্মযোগের ভাব ভিন্ন আর কি বলিব?

উৎকট পরিশ্রম না করিয়া কেবল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দৃঢ় মনোযোগের (Attention—Concentration) বলে তিনি গণিতে অসাধারণ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্বয়ং ডাক্তার ছিলেন। পুত্রের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। আশুতোষকে কখন অধিক রাত্রি জাগিয়া অধ্যয়ন করিতে অনুমোদন করিতেন না। আশুতোষ নিজেও এমনই বুদ্ধিমান ছিলেন যে কোন বিষয় আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহাকে অধিক রাত্রি জাগরণাদি বা কোনরূপ উৎকট বা অনিয়মিত পরিশ্রম করিতে হইত না। সকল বিষয়ই তিনি

সহজে সামন্তে পরিশ্রমে অধিগত করিয়া লইতেন। তাঁহার বুদ্ধি এমনই তীক্ষ্ণ ছিল, যে অতি কঠিন বিষয়ও একবার পড়িয়া বা সামান্য মাত্র আলোচনা করিয়াই তিনি তাহা অধিগত করিয়া লইতেন।

জগতে যত শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম দ্বারা সমাজকে সমুন্নত করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝা যায় সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা তাঁহাদের জীবনের মাধ্যমিক কেন্দ্র স্বরূপ। মহাপুরুষ আশুতোষে জীবনের শৈশবাবধি সে বিধানের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শুনা যায় আশুতোষের পিতা পুত্রের শিক্ষার জন্য যেমন যত্নবান ছিলেন, তাঁহার চরিত্র-গঠনের জন্যও তাঁহার তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আশুতোষ যখন ছাত্র-রূপে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখন ছাত্র-জীবনে-নৈতিক অবনতির কাল এদেশে খুব বিকটই ছিল। যদিও তৎপূর্ব্বে ছাত্রগণের চরিত্রে নৈতিক অবনতি আরও প্রবল ছিল, তথাপি আশুতোষের সময়েও সে অবনতির প্রভাব প্রবলই ছিল। বহু ভাল ভাল ছাত্র কদাচারের কবলে পড়িয়া সুপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল ও আপনাদিগকে নিতান্ত শোচনীয় দুর্দ্দশার অন্ধ কুপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। অনেক প্রতিভাশালী ছাত্র মদ বেশ্যার সংসর্গে ও সংস্পর্শে আসিয়া কি দৈহিক, কি মানসিক, কি সামাজিক, কি আর্থিক সর্ব্ববিধ বিপত্তি বিপদে জড়াইয়া বড় উচ্চ আশা উন্নতির জীবনকে বিনাশ করিয়া ফেলিত। এখনও আশুতোষের সমসাময়িক কয়েকটি ছাত্রের

অধোপতনের কাহিনী, বহু লোকের মানসপটে উজ্জ্বলচিত্রে চিত্রিত রহিয়াছে। এ সকল নৈতিক অবনতির কথা পিতা গঙ্গাপ্রসাদের মনে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক ছিল। তাই তিনি সর্ব্বদাই পুত্রের চরিত্রের প্রতি সজাগ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। যদিও আশুতোষ প্রথমাবধিই অতি চরিত্রবান ছিলেন, যদিও তাঁহার সচ্চরিত্রতার জন্য কোনরূপ সন্দেহ চিন্তার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিলনা, তথাপি গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের চরিত্র-গঠনের জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। তখন বহু সহধ্যায়ী ছাত্র নৈতিকচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তখন যে সকল পিতা বা অভিভাবকবর্গ সন্তানের সচ্চরিত্রতার জন্য ব্যগ্র হইতেন, তাঁহারা সাধারণতঃ যে সে ছেলের সহিত আপন ছেলেকে বড় একটা মিশিতে দিতেন না। আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের বিদ্যা অপেক্ষা সচ্চরিত্রতার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তখন সময়ের অবস্থা বুঝিয়া তিনি যে সে ছেলের সহিত আশুতোষকে মিশিতে দিতেন না। আশুতোষ নিজেও যে সে ছাত্রের সহিত মিলা মিশা করিতেন না। বিশেষতঃ যে সকল ছেলের চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক-কালিমার সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাহাদের কোনরূপ সংশ্রবে তিনি কখন পুত্রকে যাইতে দিতেন না যদিও তাহাদিকে ঘৃণা বা উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন না। কাহাকে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করা যে নিতান্তই

তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাঁহার মহৎ চরিত্রের পক্ষে নিতান্তই বিপরীত ব্যাপার। একটা অতি বিখ্যাত কথা নীতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। কথাটি এই যে 'পাপকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না।' আশুতোষ এ কথার সারবত্তা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে স্বীয় জীবন-দৃষ্টান্তে ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা দুষ্টচরিত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল, তিনি তাহাদের সহিত যদিও মিশিতেন না; কিন্তু কখনই তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন না বা অবহেলাও করিতেন না। সমবয়স্ক সহাধ্যায়ী ছাত্রগণের প্রতি সততই সমবেদনা প্রদর্শন করিতেন। তাহাদের বিপদে বা দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণের সহানুভূতি সততই উচ্ছসিত হইয়া উঠিত। তিনি বাল্যকাল হইতেই দয়ালু ও দীনজনের প্রতি করুণা প্রদর্শনে উৎসুক ছিলেন। দয়া মায়া তাঁহার কোমল হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ছিল। দীন দরিদ্র দেখিলে, তাঁহার করুণার ধারা স্বতঃই উথলিয়া উঠিত। কিরূপে তাহার দুঃখ বিমোচন করিবেন, এজন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। দয়া আশুতোষের মহান চরিত্রের স্বাভাবিক গুণ। দীনহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে তাঁহার করুণ-কর কখনই কুঞ্চিত বা কুণ্ঠিত হইত না।

ঘৃণা বা উপেক্ষা অবহেলা তাঁহার প্রকৃতির পক্ষে নিতান্তই বিরুদ্ধ। কি গৃহের কি বাহিরের সকল জীবের প্রতি তাঁহার

করুণ-নেত্র সদাই উন্মীলিত রহিত। ছাত্র-অবস্থায় পথপার্শ্বস্থ বহু অন্ধ আতুর জন তাঁহার নীরব দানের সাহায্য পাইয়া কৃতার্থ হইত।

আশুতোষের সমসময়ে ছাত্রগণের পক্ষে বা তরুণ বয়স্ক তরল-মতি যুবকগণের পক্ষে যত প্রকার পাপ দুর্নীতির ক্ষেত্র এদেশে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—যাহাতে দেশের নৈতিক চরিত্র অতীব শোচনীয়রূপে অধোপতিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে রঙ্গালয় (Theatre) একটা অতি ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া সকলেই জানিত। এই পাপক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসিয়া যে কত যুবকের অধোপতন সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার কোন আবশ্যক নাই। ললিতকলা বা আর্টের (Art) দোহাই দিয়া কত ভাল ভাল লোক যে এই কলঙ্ক-কলুষিত পাপস্থলীর সংসর্গে আসিয়া জন্মেরমত উৎসন্ন-পথে নিপতিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই পাপক্ষেত্রের বিষম অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া এ দেশের বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রঙ্গালয়ের বিপক্ষে বহুপ্রকার আন্দোলন আলোচনা করিয়াছেন। যদিও তাহাতে বিশেষ কোন ফল ফলে নাই, তথাপি তখন হইতেই বহু সচ্চরিত্র মতিমান যুবকের জ্ঞানচক্ষু তৎসম্বন্ধে ফুটিয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল যে থিয়েটার যেরূপভাবে এদেশে পরিচালিত হয়, তাহাতে ইহা দ্বারা দেশের বিশেষ অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট বড় বেশী হয় না। যদিও নাট্যকলার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপায় উপাদান, তথাপি রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান

অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে নাট্যকলার উৎকর্ষের পরিবর্ত্তে তাহা দ্বারা অধিক পরিমাণে অপকর্ষ অপকার সংসাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এদেশীয় রঙ্গালয়ে যেরূপ নাটক অভিনয় হয়—সে সকল অভিনয়ে যেরূপ হাবভাব-বিকাশ গতি ভঙ্গি প্রদর্শিত হয়, তাহাতে সূক্ষ্মদর্শী নীতিপ্রিয় দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই থিয়েটারের অনিষ্টকারিতা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। আশুতোষের অধ্যয়নের সময় হইতে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের এই অবস্থা ঘটিয়া আসিতেছে। আশুতোষ তাহা জানিতেন—বুঝিতেন। তাই জানিয়া বুঝিয়াই সুনীতির লীলা-নিকেতন-স্বরূপ তাঁহার সুমহান পুত-চরিত্র তাঁহাকে কখন রঙ্গালয়ের ছায়া মাড়াইতেও অনুমোদন করে নাই। তিনি মিছাকথার ফাঁকা দোহাই দিয়া কখন কোনরূপ পাপকার্য্য পাপনীতি বা পাপক্ষেত্রের পরিপোষণ করিতে পারিতেন না। মনে এক—মুখে আর ভাব সেই বীর্য্যবান ঋষিতুল্য তেজস্বী চরিত্রবান মহাপুরুষ কখনও জীবনের কোন বিভ্রান্ত মুহূর্ত্তেও প্রদর্শন করেন নাই। আশুতোষ, ফাঁকা মুখে মিথ্যা আর্টের দোহাই দিয়া কখনও থিয়েটারে পদার্পণ করেন নাই—রঙ্গালয়ে প্রশ্রয় পোষকতা প্রদান করেন নাই।

চরিত্র সম্বন্ধে মহাপুরুষ আদর্শপুরুষ আশুতোষ ভারত-গগনের ভাস্বর-ভাস্কর। মদ, বেশ্যা, থিয়েটার' খেমটা তয়ফা প্রভৃতি পাপ উপাদানের পাপ কথা-প্রসঙ্গও বোধহয় তাঁহার পবিত্র কর্ণে স্থান পায় নাই। এমনই পুত চরিত্র মহাত্মা মহাপুরুষ আশুতোষ

ছিলেন। ছাত্রজীবনে কোন ছাত্র কোনরূপ পাপ প্রসঙ্গের পাপ কথা উপস্থিত করিলে, আশুতোষ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেন। দুর্জ্জয় কাম লোভ প্রভৃতি মারগণ যেন ভয়ে ভীত হইয়া, সতত তাঁহার সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া রহিত; এমন যে আদর্শ মহাপুরুষ, যাঁহার স্মরণে পুণ্য সঞ্চার হয়, মননে মননকারীর চিত্ত চরিত্র পবিত্র হয়, তিনিই তো নরসমাজে যথার্থ জীবন্ত আদর্শ পুরুষ। তিনি ছাত্র-অবস্থায় আদর্শ ছাত্র ছিলেন। এখনকার ছাত্রগণ তাঁহার চারু-চরিত্রের অনুকরণ—তাঁহার পূত পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে—নিশ্চয়ই ধন্য কৃতার্থ হইবে। তিনি বঙ্গীয় ছাত্রগণের জন্য বিদ্যাপীঠে যে আদর্শ আলেখ্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য ছাত্রগণের পক্ষে নিত্য-পূজার বিধান ব্যবস্থা করা একান্তই কর্ত্তব্য। তাহাতে ছাত্রগণও ধন্য হইবে, পতিতদেশ মহাপুরুষের পূজাফলে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে।

আশুতোষ, উৎসবে উৎসাহ আনন্দ প্রকাশ করিতেন কিন্তু ইতর আমোদ প্রমোদে তাঁহার আদৌ আসক্তি ছিল না। যাঁহারা উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা, উচ্চ কর্ম্ম লইয়া জীবন বহন করেন তাঁহাদের প্রকৃতি কখনই হেয় জঘন্য আমোদে রত হয় না। উচ্চ বিষয়ের উচ্চ চিন্তা লইয়া কাল কর্ত্তন আশুতোষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ছিল। আশুতোষ কখন সামান্য সাধারণ কার্য্য-ব্যাপারে প্রকৃত আনন্দ পাইতেন না। পঠদ্দশায় গণিত শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন সমাধানে যে গভীর গবেষণার অনুশীলন হইত নিভৃতে বসিয়া ধ্যানপরায়ণ যোগীজনের ন্যায় আশুতোষ

তাহাতেই পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। তদ্ভিন্ন অন্য আমোদে আশুতোষ কখন আসক্ত বা উৎসাহিত হইতেন না।

জ্ঞান-অনুশীলনের জন্য আশুতোষের পীপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আশুতোষ ছাত্র-অবস্থায় সেই জ্ঞান পীপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য নানারূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল গ্রন্থ মধ্যে গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি তাঁহার নিকট নিতান্ত প্রিয় সামগ্রী ছিল। আশুতোষ অত্যন্ত জটিল অতি কঠিন গণিতাঙ্ক সমাধান করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা যেন যথার্থ যোগীজনেরই যোগ্য উপভোগ্য। এই জ্ঞান-পীপাসাই তাঁহাকে মহা অধ্যবসায়শীল ও একাগ্র করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি জটিল প্রশ্ন সমাধান কালে এমনই তন্ময় আত্মহারা হইতেন যে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। কেবল অধ্যয়ন ব্যাপারে তিনি কখন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন।

জ্ঞানের পশ্চাৎ তিনি তড়িতের ন্যায় ছুটিতে উৎসুক ছিলেন। তাই বলিয়া তিনি নিয়ম-বিধান বিহীন উশৃঙ্খল পুরুষ ছিলেন না। তাঁহার জীবনের সকল বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য বা ব্যাপার—এমন কি দৈনন্দিন ছোট খাট কর্ম্মও নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা সংযত ও নিয়মিত ছিল। সংযম মিতাচারের যাহা প্রকৃষ্ট তত্ত্ব তাহা সকল সময়ে সকল অবস্থায়, সর্ব্ব কর্ম্মেই আশুতোষে পরিলক্ষিত হইত। সংযম মিতাচার (golden mean) সকল সভ্য সমুন্নত দেশে সংপূজিত। ভগবান স্বয়ং সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগং ভবতি দুঃখহা॥

যিনি নিয়মিত আহার বিহার করেন, কর্ম্ম সকলে নিয়মিত-রূপে চেষ্টা করেন, নিয়মিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখ নিবারক হইয়া থাকে। এই ভগবৎ-বাক্যের সারবত্তা আশুতোষের জীবনে সকল ব্যাপারে সর্ব্বকার্য্যে পরিলক্ষিত হইত।

আশুতোষের পিতা, পুত্রকে কেবল বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা সাধিত হইল বলিয়া আদৌ মনে করিতেন না। কিসে আশুতোষ শিক্ষা-ব্যাপারে বিশেষ কৃতকার্য্য হইবেন, উৎকৃষ্ট সাফল্য লাভ করিবেন, তজ্জন্য গৃহশিক্ষার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঘরে শিক্ষা দিবার জন্য ভাল ভাল লোক বাছিয়া বাছিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ব্যয়-ভূষণের দিকে তাঁহার আদৌ কোনরূপ কার্পণ্য ছিল না। যে মধুসূদন দাস মহাশয় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের একজন অসাধারণ দীপ্তিশালী অসাধারণ পুরুষ, তিনিও আশুতোষের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। এইরূপে তৎকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের শ্রেষ্ঠ ছাত্র মিলিয়াছিল। মধুসূদন বাবু যেমন জ্ঞানী, তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত জ্ঞান-পীপাসু বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ছাত্র আশুতোষের প্রকৃতিও শিক্ষক মধুসূদনের সমধাতুতে গঠিত। সুতরাং সম্বন্ধ সম্মিলন বিশেষ সুখের সুযোগরূপেই সমুপস্থিত হইয়াছিল। মধু-

সূদন বাবু আশুতোষকে শিক্ষাদানে বাস্তবিকই বড় আনন্দ অনুভব করিতেন।

শিক্ষকগণ আশুতোষকে যাহা একবার বলিয়া বা বুঝাইয়া দিতেন, আশুতোষকে তাহা আর দ্বিতীয়বার বলিতে বা বুঝাইতে হইত না—এমনই ছিল আশুতোষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধারণক্ষম স্মৃতিশক্তি।

আশুতোষ অল্পকালেই বিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন। তিনি ১৮৭৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা তত ভাল নয়। তিনি রুগ্ন দেহ ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া ঐ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। অনেক ছাত্রের পক্ষে এমন সময়ে এমন অবস্থায় পরীক্ষা দান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই বোধ হইত। অনেকে হয়তো এমন সময়ে এমন অবস্থায় পরীক্ষা দিতেই পারিত না—দিলেও অতি চিন্তাভয় ও কষ্টের সহিত পরীক্ষা দিত। কিন্তু আশুতোষের অসাধারণ প্রতিভা, শারিরীক অবস্থা বা অস্বাস্থ্যের কথা কিছু-মাত্র গ্রাহ্য না করিয়া অকুতোভয়ে আশুতোষকে পরীক্ষায় প্রেরণ করিল। তখনকার পরীক্ষা যে কিরূপ কঠিন ছিল, তাহা তখনকার যাঁহারা ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া কৃত-বিদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই সকল ভুক্তভোগীগণই জানেন। সেদিনে পরীক্ষকগণ—প্রশ্ন-নির্ব্বাচকগণ যেন পরীক্ষার্থী ছাত্র-গণের সহিত লড়াই করিবার জন্য—তাহাদের শক্তি বুঝিয়া পড়িয়া লইবার জন্য—পরীক্ষার সমরপ্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতেন।

অতি কঠোর নির্দ্দয়ভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিতেন—আবার অতি দৃঢ় কঠোরভাবে পরীক্ষার্থী ছাত্রের উত্তরে 'নম্বর' নির্ণয় করিতেন। সে যেন সত্যই এক অগ্নি-পরীক্ষার ব্যাপার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ব্যাপারে এইরূপ কঠোর প্রবাহ-গতি মতিমান আশুতোষই নিবারণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে জনৈক আশুতোষ-প্রসঙ্গ-লেখক পরীক্ষক এইরূপ বলিয়াছেন—'বহু দিনের কথা, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তখন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পার্শিবাগানে ডাক্তার এম, এম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, স্বর্গীয় নৃসিংহ বিদ্যারত্ন মহাশয় ও আমি এল এ পরীক্ষার প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যাই। আমরা তিন জনে প্রশ্ন নির্ব্বাচক ছিলাম। আমি নূতন ব্রতী, তাই প্রশ্নে একটু বিদ্যা দেখাইতে গিয়াছিলাম, শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—এ রকম প্রশ্ন আমরা করিয়া দিলেও আশু মঞ্জুর করিবে না। সে কতবার বলিয়াছে—"ছাত্র হইয়া ছাত্রের পরীক্ষা করিতে হয়"। বাস্তবিক ছাত্রেরশক্তি হৃদয়েরভাব বুঝিবার সামর্থ্যই আশুতোষকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাপীঠে এতটা সংবর্দ্ধিত করিবার এক অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি ছাত্র-জীবনের অবস্থা ও সমস্যা নিজে সৎ ও উপযুক্ত ছাত্র হইয়াই সম্যক্ রূপে সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছাত্রজীবনের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও অনুপম সহানুভূতি তাঁহার প্রতি ছাত্র-হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল।

তৎকালে পরীক্ষার কঠোরতার জন্য কত ছাত্র যে অকৃতকার্য্য

ব্যর্থ মনোরথ হইয়া, হতাশ জীবনের দুর্ব্বিসহ ভার বহন করিয়াছে তাহা অনেকই অবগত আছেন। যাহাকে সাধারণ কথায় বলে 'ধনে প্রাণে মারা যাওয়া'। বাস্তবিক তখন উনিভারসিটির পরীক্ষা-সঙ্কটে পড়িয়া, তৎকালে বহু ছাত্র ধনে প্রাণে মারা গিয়াছে। কোনরকমে অতি কষ্টে যদি কোন ছাত্র এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিত, তবে কলেজ-ক্লাসের ভীষণ কারা-কক্ষের দ্বারে আসিতে তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইত—হৃদয় থর থর কাঁপিয়া উঠিত। এদেশে এখন সাধারণতঃ বিদ্যার জন্য—জ্ঞানের জন্য--বিদ্যা শিক্ষা করে না। অর্থের জন্য—সম্মানের জন্য—খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। আবার অনেক নর-খাদক পিতামাতা ছেলেকে কোন রকমে বি এ, পাশ করাইয়া, বিয়েতে বৈবাহিকের বক্ষ-বিদারণ করিয়া, কিরূপে যে হতভাগ্যের প্রাণের রক্ত শোষণ করিবে এই ভাবিয়া ছেলের বিদ্যার ব্যয় নীচ ব্যবসাদারী হিসাবে বহন করে। আজি কালি এদেশে বিদ্যার এই গতি প্রকৃতি দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক জ্ঞান বিদ্যার অনু-রাগের ফলে এখন আর কেহ লেখা পড়া করে না। যাহাতে প্রাণের অনুরাগ না থাকে, তাহার সিদ্ধি সফলতা স্বতঃই সুদূর পরাহত। এই সকল অবস্থার কথা ভাবিলে মনে হয়, যদি পূর্ব্বের মত পরীক্ষা-ব্যাপারে বিশেষ কঠিন কাণ্ড থাকিত তবে তাহার দ্বার একেবারেই নিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত। পরীক্ষা ব্যাপারে তখন শিক্ষা-পথের এক প্রবল কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সে কণ্টক এক আশুতোষের চেষ্টায় অপসারিত হইয়াছিল। তিনিই, পরীক্ষককে ছাত্র হইয়া ছাত্রের পরীক্ষা লইতে, শিখাইয়াছিলেন। এই যে আজি কালি এদেশে শিক্ষিতের এত সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাই, তাহার একটা প্রধান কারণ, পরীক্ষা-ব্যাপারে আশুতোষের 'কড়া, গরম বিধান' উঠাইয়া 'নরম বিধানের' প্রবর্ত্তন। এ জন্যও আশুতোষকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এজন্য অনেক বড় বড় লোক তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—প্রচণ্ড প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন। আশুতোষ নির্ভীক অসাধারণ তেজস্বী পুরুষসিংহ ছিলেন। তাঁহার তেজস্বিতার সম্মুখে—স্বাধীন-ভাবের অগ্রভাগে—প্রতিপক্ষের কোন বাধা-আপত্তি ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিত না—এতই স্বাধীনতার দৃঢ় দর্পী শক্তি তাঁহার ছিল। স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রীর মত ব্যক্তিকেও মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। শাস্ত্রী শিবনাথ যে সে লোক ছিলেন না। তিনিও বাঙ্গালীর মধ্যে একজন অতি শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধি তেজস্বীতায় তিনি অতীতযুগের বাঙ্গালী-সমাজের একজন অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন। তিনি হিন্দু-সমাজ—হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'ব্রাহ্ম' হইয়াছিলেন। তাই তিনি হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। শিবনাথ যাহাই করুন মহা পণ্ডিত ও মহা চিন্তাশীল বলিয়া তাঁহার গুণ কোন ভারতবাসী না জানিত— ? তিনি নিজে একজন দৃঢ়চেতা কর্ম্মবীর ছিলেন; যাহা সত্য বলিয়া তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি নির্দ্ধারণ

করিত, তিনি দেহ প্রাণ পণ করিয়াও সে কার্য্য সাধনে কখনই কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হইতেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের তাৎকালিক ইতিহাসে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও তেজস্বিতার কথা জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিবে। আদিব্রাহ্ম সমাজ হইতে কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ যখন ভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার মৌলিক ভিত্তিতে পণ্ডিত প্রবর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রভাব বিশেষ রূপেই পরিলক্ষিত হয়। আবার যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন মূর্ত্তিতে খাড়া হইয়া কলিকাতার বক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তখন তাঁহারও মূলে শিবনাথের প্রভাবই, সমগ্র বঙ্গকে অসাধারণ কৃতীত্বে বিস্মিত করিয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ যে এক সময়ে সমগ্র বঙ্গের—শুধু বঙ্গেরও নয় সমগ্র ভারতের—পথপ্রদর্শক নেতারূপে সমাদৃত সম্মানিত হইয়াছিল, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ শক্তি প্রভাব তাহার এক শ্রেষ্ঠতম কারণ বলিয়া সকলকেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এই তেজস্বী পণ্ডিত পুরুষশ্রেষ্ঠ শিবনাথ স্বয়ং আশুতোষের স্বাধীন-ভাব সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে অনেক স্থলে অনেক কথাই কহিতেন। এক সময় কয়জন পণ্ডিতের সমক্ষে শিবনাথ বলিয়াছিলেন—"মরণের পরপারে যাইয়া যদি আমাদের চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করে—যে কি দেখিয়া আসিলে? তখন বলিব 'একজন কর্ম্মবীর দেখিয়া আসিয়াছি। অধীন

জাতিতেও একজন স্বাধীন-স্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছি।’ আশুতোষ সত্যই বাঙ্গালীর ভীষ্মদেব। স্বাধীনচেতা দৃঢ়চেতা আশুতোষ যাহাই একবার ধরিতেন, তাহাই সমাধা না করিয়া, তাহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। পুরুষত্বের—পুরুষ-কারের এই তো প্রবল লক্ষণ।

আশুতোষ হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছিলেন—ধর্ম্মে প্রাণে আশুতোষ পরম আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-লক্ষণের মধ্যে অদৃষ্ট-বাদ একটা প্রধান সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু হইলেই যেন অদৃষ্ট-বাদে বিশ্বাস করিতেই হইবে। ‘অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে’ এই কথাটা যেন হিন্দুর বড় প্রাণের সামগ্রী। অবশ্য একথার মূলে যে কোন যুক্তি নাই—এমন কথা আমরা বলি না। এই কাথার যদি কোনই কারণ—কোনই যুক্তি না থাকে তবে আমি ‘আমি’ হইলাম কেন—তুমিই বা ‘তুমি’ হইলে কেন? অদৃষ্টের ফল বলিয়া কিছু না মানিলে এ কথার কি আর কোন সদুত্তর হইতে পারে? এক জন অন্ধ খঞ্জ হইয়া অতি নিরন্ন দরিদ্রের ঘরে কেন জন্মায়—আর একজন সোনার চামচা মুখে ধরিয়া সুস্থ সবল দেহে কেন ধনী মানী বড়লোকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে? কেন কেহ রাজা হয়—কেহ প্রজা হয়? কেন কেহ দান করিতে জন্মায়—কেহ ভিক্ষা করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে? সংসারে এ বৈষম্য কেন? বিধাতার রাজ্যে এ বিষম বিধান কেন? এ কথার উত্তরে অদৃষ্ট ভিন্ন

আর কি বলিব? বাস্তবিক 'অদৃষ্ট' জিনিসটাকে না মানিব কেন? অদৃষ্ট তো হিন্দুর পক্ষে—হিন্দুর পক্ষেই বা কেন—যে জীবন-সমস্যার মূলে কিছু যুক্তি কারণ খুঁজিতে চায়—তাহারই পক্ষে মানিবার সামগ্রী। নতুবা বাস্তবিক মানব সমাজের—জীব-জগতের ঘোর সমস্যা সমাধন কিছুতেই করা যায় না। কেন এ বৈষম্য? এ কথার উত্তর একমাত্র অদৃষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নাই—কিছুই হইতে পারে না। বাস্তবিক অদৃষ্ট কর্ম্ম হইতে পৃথক পদার্থ নয়। পূর্ব্বজন্মের যাহা কর্ম্ম তাহাই এ জন্মের অদৃষ্ট রূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। নাস্তিক শূন্যবাদী বৌদ্ধগণও কর্ম্মফলের কথা—কর্ম্মের বিধানের কথা (Law of karma) মানিয়া থাকে। আশুতোষ যুক্তিতে একথা অস্বীকার করিতেন না—কিন্তু কার্য্যকালে তিনি প্রবল পুরুষকারে বিশ্বাসী ছিলেন। নিজ জীবনেও এমন পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা বোধ করি বাঙ্গালীর মধ্যে অল্প লোকই দেখাইতে পারিয়াছে। এক দেখিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে এই পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা প্রাবল্য—আর দেখিয়াছি এই আশুতোষে। শুনিয়াছি জগতের প্রধান কর্ম্মবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কর্ম্মবীর হইয়াও অদৃষ্টবাদী ছিলেন। তিনিও অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, হিন্দুর হৃদয় হিন্দুর প্রাণ লইয়া; আশুতোষ অদৃষ্টে বিশ্বাস করিবেন না কেন—অদৃষ্ট-বাদ না মানিবেন কেন? আশুতোষ অদৃষ্ট-বাদ প্রাণে

প্রাণে মানুন আর নাই মানুন—অদৃষ্টে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—আর যে ভাবেই মানুন—অদৃষ্ট কখন তাঁহাকে, আলস্য আনন্দেরঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। বোধ করি ভগবান যদি অদৃষ্টকে প্রচণ্ড মূর্ত্তিমান দৈত্য সাজাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাঠাইতেন তবুও সে পুরুষসিংহ আশুতোষের প্রবল পুরুষকারের সম্মুখে ক্ষণকালের জন্যও তিষ্ঠিতে পারিত না।

কর্ম্মবীর আশুতোষ পঠদ্দশা হইতেই প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 'সাউথ সুবরবনে' পড়িবার সময় ছাত্র-জীবনে যেমন অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনি অধ্যবসায় উৎসাহ একাগ্রতা প্রভৃতি সকল কর্ম্মগুণেও বিভূষিত হইয়াছিলেন। ক্লাসে কোন ছাত্রই কি বুদ্ধি কি মানসিক প্রতিভায়, কি শারিরীক শ্রমে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। অধ্যয়ন অবস্থায় তিনি আহারে বিহারে এমন কি কথাবর্ত্তায় অতীব সংযত পুরুষ ছিলেন। এখনকার কোন প্রাচীন গন্য মান্য ব্যক্তির মুখেও শুনিয়াছি—আশুতোষ সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মিশিতেন না। তাঁহার সহজাত প্রকৃতিও তাঁহাকে সাধারণ ছাত্রগণের সহিত মিশিতে দিত না—তাঁহার পিতা গঙ্গা-প্রসাদও পুত্রকে সকল যায়গায়, সকলের কাছে যাওয়া আসা করিতে দিতেন না।

হিন্দুশাস্ত্রে চারি প্রকার আশ্রমের বিধান নিরূপিত

হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-জাতির পক্ষে এ বিধান কিছুদিন পূর্ব্বে এক নিতান্তই অলঙ্ঘনীয় ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম উচ্চবর্ণের পক্ষে জীবনের অতীব পালনীয় কার্য্য-বিধান ছিল। পাঠ্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য বিশেষ প্রয়োজনীয় পবিত্র ব্রত বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে অবধারিত হইয়াছিল। তখন বিদ্যাক্ষেত্রে উচ্চ-শিক্ষা ব্যাপারে, কি গভীর গবেষণায় কি কার্য্যক্ষেত্রে কল্পনা-সম্পদে হিন্দু যে সভ্য-জগতে এতো সম্মান লাভ করিয়াছিল, প্রথম জীবনে ছাত্র-অবস্থায়, পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত, তাহার এক প্রধান প্রকৃষ্ট ও মৌলিক উপাদান-হেতু। যতই কঠোর সে পবিত্র ব্রত হউক না কেন, গুরু-আশ্রমে শিক্ষা-নিকেতনে পদার্পণ করিয়াই, কোমল প্রাণ তরুণমতি ছাত্রকে অবনত মস্তকে সর্ব্বতোভাবে কায় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, সে পবিত্র ব্রত পালন করিতে হইত। তখন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বনকারী ছাত্রকে অধ্যয়নে যেমন প্রগাঢ় পরিশ্রম করিতে হইত, গুরু-সেবায় তেমনি সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করিতে হইত। ছাত্রগণকে গুরুর আশ্রমে রহিয়া গো-সেবা গো-চারণ করিতে হইত, নিকটবর্ত্তী লোকালয় হইতে ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আশ্রমিক ব্যয় ভূষনাদি নির্ব্বাহ করিতে হইত।

তখন অল্পবয়স্ক তরলমতি ছাত্রগণের পক্ষে এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য

ব্রত নিতান্তই কঠোর দুর্ব্বিসহ ছিল। এমন কি ছাত্রকে দৈহিক বিলাস-লালসাদি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে হইত। ললিত কলার (fine art) নাম করিয়া যাহাতে মানসিক চাঞ্চল্য-উত্তেজনা উদ্ভুত হয়, বা সংযত চিত্ত, ধীর স্থির প্রাণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এমন কোন দৈহিক বা মানসিক ব্যাপারে একেবারেই শিষ্য সংসৃষ্ট হইতে পারিত না—ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের এমনই কঠোর বিধান ছিল। এই কঠোর ব্রত নিয়মাদি অতি কঠোর ভাবে সাধন সমাধান করিয়া ছাত্রকে মানুষ হইতে হইত।

প্রকৃত মানুষ কে—যথার্থ মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি—আর কিসেই বা সে মনুষ্যত্ব পূর্ণরূপে প্রকটিত অভিব্যক্ত হয়, তাহা জানিতে বুঝিতে হইলে, বিশেষরূপে চিন্তা আলোচনা করিতে হয়।

কর্ম্মের অতীত হওয়াই—কর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থানই—সর্ব্ব কর্ম্মের সকল সাধনার চরম উদ্দেশ্য। এই অবস্থারই হিন্দুর পক্ষে নাম মোক্ষ—নির্ব্বাণ। এই অবস্থাতেই মানব-জন্মের মনুষ্য-জীবনের সর্ব্ব সাধনা মহাসিদ্ধি লাভ হয়। তাহাতেই মানব-জন্ম ধন্য কৃতার্থ হইয়া থাকে। যে পরমানন্দ জীবনের জীবের পরম উপেয়, তাহা একমাত্র এই অবস্থাতেই অধিগত হইয়া থাকে। হিন্দুর দার্শনিক ভাষায় এই দশার নাম স্বরূপে অবস্থান। ইহাই আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন। এই অবস্থাতেই জীবের আত্মার প্রতি রতি হয়—তখনই জীব আত্মজ্ঞ হইয়া কর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে সমুত্থিত হইয়া

পরমাত্মায় সম্মিলিত হইয়া থাকে। এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"যস্ত্বাত্মা রতিরেব স্যাদাত্মা তৃপ্তশ্চ মানব।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্য ন বিদ্যতে॥

আত্মায় যাহার রতি, যে মানব আত্মায় তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, যে আত্মায় পরিতুষ্ট হইয়াছে তাহার আর কার্য্য থাকে না।

অর্থাৎ আত্মজ্ঞ, আত্মতুষ্ট যে যোগী কেবল তাহার সাধন: চরম সিদ্ধি লাভে সমর্থ। এই শ্রেষ্ঠ স্তরে উপনীত হইবার পক্ষে আদিম ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত দ্বারা জীবন সুসংযত ও নৈতিক-চরিত্র সুগঠিত হইলে মানব সাধক বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহার কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্ম—তাহার সাধনাই যথার্থ সাধনা। এই গূঢ় তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম ভুলিয়া আমরা উন্নতি উৎকর্ষের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। আমাদের জাতীয় পতনের একটা প্রধান কারণ—ছাত্র-জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য যে কত অধিক, তাহার আবশ্যকতা যে কত গুরুতর, এই মহামঙ্গল-মন্ত্র ভুলিয়াই আমরা আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছি। একটা কথা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে—'মাথা হইতে মাছের পচা ধরে (fish rots from the head) সমাজের যাহারা মাথা তাহারা যদি দৃঢ় চরিত্রবান না হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা নিজেরও কোন উপকার হয় না—জগতের কোন বড় কাজ হইতে পারে না।

মানবের যত শক্তি আছে—যত প্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ থাকিতে পারে, তন্মধ্যে চরিত্রের বল চরিত্রের গুণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ। যাঁহারা জগতে আসিয়া মানব-সমাজের কল্যাণ বা উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন সে সকলই চরিত্রের গুণে চরিত্রের বলেই সংসাধিত হইয়াছে।

চরিত্রকে সর্ব্বাগ্রে সুগঠিত করিতে হয়। চরিত্র গঠনের সূত্রপাত হয় পঠদ্দশায়—ছাত্রজীবনে। ছাত্র-অবস্থায় অধ্যয়নে যেমন পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রতার জন্য যত্নবান থাকিতে হয়, সেইরূপ দৈনিক নিয়মে ছোট কাজেও চরিত্র-গঠনের প্রতি সর্ব্বদাই সতর্ক ও যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। চরিত্র গঠিত না হইলে কোন লোক প্রকৃত বড় হইতে পারে না—কোন বড় কাজও তাহার দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। এ কথাটা কর্ম্মী সাধকের সর্ব্বদা প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া রাখা কর্ত্তব্য। জগতের জন্য—মনুষ্য-সমাজের জন্য—শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম—শুভ কর্ম্ম কখনই চরিত্র-হীন ব্যক্তির দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না; ইহা অতি ধ্রুব সত্য। জগতের যে যেখানে কোন বড় কাজ, শুভ কাজ সাধন করিয়া কীর্ত্তিমান হইয়াছে, নিশ্চয়ই অতি চরিত্রবান ব্যক্তি। আশুতোষ পঠদ্দশা হইতেই চরিত্রবান মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কোনও কলঙ্ক-কালিমা স্পর্শ করিতে পারে নাই। যৌবন-কাল হইতেই তিনি কলঙ্কহীন শশধরের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন। চরিত্রবান হইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সচ্চরিত্রতা তাঁহার সহজাত স্বাভাবিক ধর্ম্ম। চরিত্রকে, সংশোধন সুরক্ষিত

করিবার জন্য আশুতোষকে কখন বেগ পাইতে হয় নাই—কখন যত্নবান হইতে হয় নাই। তজ্জন্য তাঁহার পিতামাতাকেও কখন সতর্ক হইতে হয় নাই। অধ্যয়নকালে ছাত্রজীবনে তিনি যথার্থই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিযাছিলেন। অধ্যয়নই তাঁহার জপ, তপ, অধ্যয়নই তাঁহার ব্রত সাধনা ছিল। বাস্তবিকই তখন তিনি হাস্য পরিহাসেও বড় রত হইতেন না—বেশী গল্প গুজবে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইতেন না—অধিক আহার বিহারে নিরত ছিলেন না—গান বাজনা বিলাস ব্যসনে কখন প্রবৃত্ত হইতেন না। এমন কি তখন তিনি অধিক আহার বা অধিক নিদ্রাও উপভোগ করিতেন না। এমনই কঠোর ছিল তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত। এইরূপ ব্রত অপর সাধারণ তরুণবয়স্ক ছাত্রের পক্ষে নিশ্চয়ই নিতান্ত কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু আশুতোষের পক্ষে উহাই জীবনের অনুষ্ঠেয় পবিত্র সাধনায় পরিণত হইয়াছিল।—যদিও তাঁহাকে এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য কখনও যত্ন বা সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় নাই। সকল পবিত্র অনুষ্ঠানই যেন আপনারাই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিত। এরূপ পবিত্র সংযম-ব্রত আধুনিক ছাত্রগণের পক্ষে না হইলেও, কিছুকাল পূর্ব্বে, অন্ততঃ আশুতোষের ছাত্রজীবনের সমসময়ে অতি কঠোর আচরণ (asceticism) বলিয়া—পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের পক্ষে এক ঘৃণিত ব্যাপার বলিয়া—উপেক্ষিত হইত। এই সংযম-সাধনার জন্য—নিতান্ত কঠোর ব্রত হইলেও—উহার জন্য আশুতোষের প্রকৃতি কখন সজাগ যত্ন আগ্রহ অবলম্বন না

করিলেও, পশ্চাৎপদ বা কুণ্ঠিত ছিল না। যথার্থই চরিত্র সংশোধন সংস্কার বা সমুন্নতির জন্য আশুতোষকে কখনই সংগ্রাম করিতে হয় নাই—কখনই না—ছাত্রজীবনেও না—কর্ম্মজীবনেও না।

আশুতোষ কর্ম্মযোগী ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে চরিত্রের জন্য—চরিত্র সংশোধন সংগঠনের জন্য—কখন যত্ন করিতেও হয় নাই—আগ্রহান্বিতও হইতে হয় নাই। যদিও তাঁহার সহজাত স্বভাব, তাঁহাকে সর্ব্বদাই পাপ তাপ হইতে বহু দূরে, বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিত, তথাপি আশুতোষ জীবনের সর্ব্ব স্থানেই—সর্ব্বমুহূর্ত্তেই কর্ম্মে এমনই নিমজ্জিত রহিতেন যে পাপাদির প্রলোভন কখনই তাঁহার নিকটেও যাইতে পারিত না।

কর্ম্মের জন্য যাহারা কর্ম্ম করে তাহারাই মহাপুরুষ। মহাপুরুষরা ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করেন। আশুতোষ অধ্যয়ন-অবস্থা হইতেই এই কর্ম্মযোগী মহাপুরুষ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া আশুতোষ পাঠে প্রবৃত্ত হন নাই। কেননা অধ্যয়ন হইতেই তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। অধ্যয়নে যে কি সুখ—কি আনন্দ—যে প্রকৃত পাঠক—যে পাঠের জন্য পাঠ করে—কেবল সেই অনুভব করিতে পারে। যাহাতে জ্ঞান-কৌতূহল চরিতার্থ হয়, তাহারই নাম যথার্থ পাঠ। জানিবার জন্য—বুঝিবার জন্য মানব-জীবন—সেই জন্যই জগতে মানবের জীবন-ধারণ। মানব যত কিছু কার্য্য করে—যাহা কিছু সাধনা করে সে সকলেরই চরম উদ্দেশ্য—এক জ্ঞানলাভ

—জানিয়া বুঝিয়া লওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়—আর কিছুই হইতে পারে না। যে মানব এমন মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া—এমন মানব-জন্ম লাভ করিয়া, জানিতে বুঝিতে না চেষ্টা করিল—জানিবার বুঝিবার জন্য যাহার প্রাণে না ঔৎসুক্য জন্মিল—সে মানব-দেহে পশু বা প্রস্তর বিশেষ। এই জানা বুঝার নামই জ্ঞান। সামান্য জ্ঞান হইতে—জ্ঞানের বিকাশ হইতে—চরম জ্ঞান—জ্ঞানের পূর্ণ অভিব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়—তাহাতেই মানব জীবনের সার্থকতা সফলতা সাধিত হইয়া থাকে। আমি কেন এখানে—আমার এই জীবন জন্ম কেন—কেবল তখনই মানব এই অতি গুঢ় জিজ্ঞাসার সমাধান করিতে পারে। কেবল তখনই এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়—আর কেবল তখনই মানব, জীবনের গুঢ় রহস্য-তত্ত্ব বুঝিয়া লইতে সমর্থ হয়। অতি গুঢ় জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বরূপ তত্ত্ব আয়ত্তীকরণের নামই তত্ত্বজ্ঞান। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান উহারই নামান্তর। জ্ঞান-যোগও ঐ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ভাবান্তর।

তত্ত্বজ্ঞানের—অধ্যত্ম-বিজ্ঞানের—অথবা জ্ঞানযোগের এই যে বিশিষ্ট বিকাশ—অধ্যয়ন পুস্তকপাঠও উহার এক মৌলিক উপাদান কারণ। পুস্তক পাঠ জীবনের একটা অতি মহৎ ও পরম পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া সভ্যশিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে কেবল এই কারণে। যে তত্ত্বজ্ঞান লাভে মানবজন্ম ধন্য হয়—সফল হয়, পুস্তক-পাঠ তাহার এক আদিম স্তর।

আর এক দিক দিয়া দেখিলে পুস্তক পাঠের আর এক গুরুত্ব মহত্ব—সাফল্য সমুন্নতি বেশ সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। সৎসঙ্গ—সাধুসঙ্গ বা মহৎ সঙ্গ—সৎ পুস্তক পাঠের এক মহাফল। যে সকল গ্রন্থ উন্নতভাব, উচ্চ চিন্তা, গভীর গবেষণায় অলঙ্কৃত, তাহাদের অধ্যয়ন অনুশীলন আর সাধুসঙ্গ মহাজনের সাহচর্য্য প্রায় একই কথা। মহাপুরুষের সৎ শুভ সংসর্গে কি ফললাভ হইয়া থাকে? তাঁহাদের সঙ্গ পাইলে, সৎ উপদেশ লাভে জীবন জন্ম যথার্থই ধন্য হইয়া থাকে। শিব-অবতার স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

'ক্ষণরপি সজ্জন সঙ্গতি রেখা'।
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা॥

এক মুহূর্ত্তকালও যদি সজ্জনের সঙ্গলাভ ঘটে, তবে উহা দুস্তর-ভবসাগরে নৌকা হইয়া জীবের উদ্ধারের হেতু হইয়া থাকে। জ্ঞানী সাধু ও মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থ সমূহ জ্ঞান বিজ্ঞান ভাব ভক্তি প্রভৃতি মহৎ তত্ত্বের আধার—আকর-স্বরূপ। সেই সকল পুস্তক পাঠ, আর তাঁহাদের সঙ্গ-সাহচর্য্য লাভ তো একই কথা। গ্রন্থ-অধ্যয়ন প্রকৃত পক্ষে সাধুসঙ্গ হইতে বড় বিশেষ পৃথক ব্যাপার নয়।

যাহারা জ্ঞানলাভের জন্য—মহতের সাহচর্য্য উদ্দেশ্যে পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে তাহাদের পুস্তক পাঠই, সার্থক পাঠ। আশুতোষ এইরূপ উচ্চ পবিত্র উদ্দেশ্য ধরিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য—যাহাতে মহৎ জনের

সাহচর্য্য লাভ ঘটে—সেই জন্য পুস্তক পাঠ করিতেন। তিনি যে সময় অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে অর্থ লাভ ধন উপার্জ্জন এদেশে অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিন্দু তখন প্রথম পথভ্রষ্ট হইয়া, শিক্ষার যে শ্রেষ্ঠ চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ—শিক্ষার সেই গুঢ় মর্ম্ম কথা ভুলিয়া ধন সম্পদ লাভের জন্য—ভোগ উপভোগের জন্য ইংরাজী-বিদ্যা অধ্যয়নে অনুশীলনে রত হয়। তখন হইতে এদেশে অর্থ লালসায়, পিতা ও অভিভাবকবর্গ ছেলেকে শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কালের এই প্রবলগতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আশুতোষ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষায় রত হন। তিনি সত্যই—শিক্ষার জন্য—জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। নহিলে বিদ্যাপীঠে—শিক্ষাক্ষেত্রে কখনই তিনি এতো কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ—কার্য্যে কৃতীত্ব প্রদর্শন—অনুরাগের ফল। অনুরাগ হইতে তন্ময়ত্ব সমুদ্ভূত হয়। তন্ময়ত্বই সাধনা—তন্ময়ত্বই যোগ। সরস্বতীরসাধনা বড়ই কঠোর সাধনা—মহাসাধনা। সরস্বতীর সাধনার নামই প্রকৃত জ্ঞানযোগের সাধনা। জ্ঞান-জ্যোতি-রূপিণী দেবী সরস্বতী কেবল আত্মহারা তন্ময় সাধককেই পরম সিদ্ধি প্রদান করেন। বীণাপাণির করুণা প্রসাদ লাভ করিতে হইলে সাধনায় তন্ময়ত্ব প্রয়োজন। অনুরাগ তন্ময়ত্বের প্রসূতি। শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই আশুতোষ বিদ্যায় পরম অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষা তাঁহার জীবনের মূল উত্তেজনা—চরম উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যা তাঁহার জীবনের পক্ষে

কখনই উপায়রূপে পরিগণিত হয় নাই—উহা চিরদিনই তাঁহার জীবনের উপেয়—চরম উদ্দেশ্যরূপে গণ্য হইয়াছিল। আশুতোষ চিরদিনই পড়িতেন শিখিবার জন্য—অন্য কারণে অপর উদ্দেশ্যে নহে। আশুতোষই তো সরস্বতীর যথার্থ সেবক। বিদ্যায় আত্মহারা—জ্ঞান-সাধনায় তন্ময় আশুতোষ জ্ঞানযোগী যথার্থই সরস্বতীর সেবা করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছিলেন—স্বদেশকে স্বজাতিকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন।

আশুতোষ কখন ধন সম্পদের জন্য বিদ্যায় অবহেলা করেন নাই। তাই তিনি 'সরস্বতী' উপাধির সার্থকতা সাধনে সত্যই সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বিদ্বজ্জন-সমাজ সরস্বতী উপাধিতে বিভূষিত কবিয়াছিলেন। তিনিই তাহার উপযুক্ত অধিকারী হইয়াছিলেন। আজি কালি এদেশে—শুধু এদেশে কেন—শিক্ষা সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত পাশ্চাত্য জগতেও উপাধি-ব্যাপারে কিরূপ ব্যবসা-সঙ্কট ঘটিয়াছে, তাহা কে না জানে? কত মূর্খ আপনা-আপনি নিষ্কৃত উপাধির মালা পরিয়া হাটে বাজারে বিদ্যার বড়াই করিয়া বেড়াইতেছে! সে সকল হাস্য-সঙ্কুল দৃশ্য দেখিয়া লজ্জা ঘৃণায় কাহার না নাসিকা কুঞ্চিত হয়? কত মূর্খ আমেরিকা হইতে নীচ ব্যবসাদারী 'উপাধি' খরিদ করিয়া আনিতেছে—আপনাদিগকে রকমওয়ারী উপাধি গহণায় সাজাইয়া লোক সমাজের চক্ষে ধুলি প্রদান করিতেছে। এই উপাধি-সঙ্কটের যুগে ঝুটা সাচ্চা বাছাই করিয়া বুঝিয়া লওয়া বড়ই বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝুটা উপাধির সাজে সজ্জিত

হইয়া বহু দাঁড়কাক মিথ্যা ময়ুর-পুচ্ছধারী শিখী সাজিয়া আপনাকে ও সমাজকে প্রতারিত করিবার চেষ্টায় ঘুরিতেছে। আশুতোষের ন্যায় বিদ্বানের দৃষ্টান্ত—আশুতোষের ন্যায় উপাধি সজ্জা বিদ্যার গৌরবকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিয়াছিল।

বিদ্যায় অনুরাগ আশুতোষের সহজাত প্রকৃতিরূপে পরিণত হইয়াছিল। তাই আশুতোষ যে বিষয় অধ্যয়ন করিতেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন। বিদ্যায় অনুরাগ যে আশুতোষকে তন্ময় সাধক করিয়াছিল। এক অনুরাগ, তৎসঙ্গে অধ্যবসায় সর্ব্বোপরি অসাধারণ প্রতিভা আশুতোষকে ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃতবিদ্য পুরুষে পরিণত করিয়াছিল। এই সকল অদ্ভুত গুণ অপূর্ব্ব শক্তির ফলে আশুতোষ সর্ব্বত্রই মহা বিদ্বানরূপে সম্মানিত সংপূজিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া, কলেজের শিক্ষা-পরীক্ষায় সর্ব্বক্ষেত্রেই আশুতোষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

নিয়ম-শৃঙ্খলার বশবর্ত্তিতা, আশুতোষের জীবনের আর এক শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। মানব-সমাজে যত প্রধান পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে—যাঁহারাই কর্ম্মক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতীত্ব লাভ করিয়াছেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁহাদের জীবন-সাধনার এক মহামন্ত্র। এই সময়ে এই কার্য্য করিব, এইরূপ নিয়ম বিধান অবধারিত করিয়াই তাঁহারা সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। একবার সেই বিচার বিবেচনা স্থির করিয়া কার্য্য-সম্পাদনের জন্য যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া লন, তাহাকে আর কখন পরিত্যাগ করেন না—অথবা

অতিক্রম করিয়া চলেন না—যতক্ষণ না কার্য্যের শেষ সীমায় গমন করেন। যতক্ষণ কার্য্য-ফলে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারেন, ততক্ষণ সেই একমাত্র কার্য্যকেই মহাসাধনরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। কর্ম্মের বিধিবদ্ধ-নিয়ম-প্রণালী প্রকৃত পক্ষে কর্ম্ম-যোগেরই একটা অঙ্গ বিশেষ। মহৎকর্ম্মের সাধনা—সেই সাধনায় সিদ্ধি-ফললাভ প্রধানত নিয়ম-পালনের উপর নির্ভর করে। কোন কোন কর্ম্মী হয়তো হঠাৎ উত্তেজনার বশে আবেগভরে কোন মহৎ-কর্ম্মের গুরুভার স্কন্ধে ধারণ করে; হয়তো বা তাহাতে কখন কখনও সাফল্য লাভ করিয়া সমাজে নিজ কৃতীত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগও লাভ করিয়া থাকে। ঐরূপ কর্ম্ম সাধনা কিন্তু প্রকৃত সাধক কর্ম্মীর কর্ম্মফল নহে। সমাজের বা সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনের জন্য যেন প্রকৃতি দেবী স্বয়ং কোন কর্ম্মীকে কখন ঘাড়ে ধরিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করাইয়া লন। ঐরূপ কার্য্য কোন কোন সময়ে হয়তো অতি মহৎকর্ম্ম বলিয়াও বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিবেচক মনস্বীগণ ঐরূপ কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন না। বাস্তবিক পক্ষে ঐরূপ কর্ম্ম মহৎ কর্ম্ম রূপে মানবের পক্ষে গণ্য হইতে পারে না। হঠাৎ ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা জাতিগত উচ্ছাস-উত্তেজনার ফলে, অনেক সমাজে এমন অনেক মহৎ কার্য্যও অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে অনেক স্থলে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মহৎ কর্ম্ম মহাপুরুষের মহাসাধনার সিদ্ধি-ফল বলিয়া কখনই গৃহীত

হইতে পারে না। ভগবান স্বয়ং যেন কোন গুঢ় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য—সমাজের সংসারের কোন নিগুঢ় কল্যাণ সাধনের জন্য ঐ কার্য্য করাইয়া লন। মানব যেন নিজ অজ্ঞাতসারে কোন অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে উহা সম্পাদন করিয়া ফেলে। কেন করে—কোথা হইতে কিরূপে হইল—তাহা যেন সে জানিতে বুঝিতে পারে না। মহাকার্য্যের সেই মহাফল দেখিয়া মুগ্ধ মানব কেবল বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া থাকে। এ কি হইল—কেন হইল! এই ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠে। ধর্ম্ম-জগতে সময়ে সময়ে এই-রূপ অপূর্ব্ব অদ্ভুত কর্ম্ম-কাণ্ডের সংঘটন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এক এক যুগে এক এক ধর্ম্ম-ভাবের তরঙ্গ-তুফান উচ্ছসিত হইয়া দেশ মহাদেশ পর্য্যন্ত আমূল আলোড়িত করিয়া তুলে। তাহার ফলে কত অপধর্ম্ম—কত প্রকার কদাচার—বিলুপ্ত হইয়া নবধর্ম্মের বিকাশ অভ্যুদয় ঘটে। হয়তো সে যুগে কোন মহাপুরুষ ধরায় অবতীর্ণ হইয়া মহাজ্যোতিষ্কের ন্যায় অজ্ঞান-আঁধার ভ্রান্ত-সংস্কার-জড়িত পাপ তাপ বিদূরিত করিয়া অন্তর্ধান করেন। তখন আঁধার-আচ্ছন্ন পাপ-তাপ-পরিক্লিষ্ট নর-সমাজ আবার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া হাস্যময়ী হইয়া উঠে, মানব-সমাজের দুঃখ-দৈন্য যেন চিরতরে ঘুচিয়া যায়। যখনই মানব-সমাজ মহাপাপের ভরে থর থর কাঁপিতে থাকে—অধর্ম্ম অত্যাচারের উৎপীড়নে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনই পাপ তাপকে অধর্ম্ম অত্যাচারকে বিদূরিত করিবার জন্য পবিত্র নবধর্ম্মের আবির্ভাব অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকে। অবশ্য

কোন কোন অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ তখন আসিয়া সেই ধর্ম্ম-যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন। তিনি ভগবানের অবতার রূপে নর-সমাজে সংপূজিত হইয়া থাকেন। কেবল ধর্ম্ম-জগতে কেন—রাজনৈতিক জগতেও এরূপ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক মহা-সংস্কার সংসাধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা এমন শ্রেষ্ঠ কার্য্য করের—এমন শ্রেষ্ঠ সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল বিধান করেন, তাঁহারা কখনই সাধারণ মানব নহেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই অতিমানব—মহাপুরুষ। মহাপুরুষগণ কোন নিয়ম বিধানের বশবর্ত্তী নহেন—তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রণালীও বিধিবদ্ধ-নিয়ম মানিয়া চলে না। তাঁহাদের কথা সতন্ত্র। বাস্তবিক অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম যাহা, তাহার ফল মানব-বুদ্ধির মানব-বিধানের অতীত—সাধারণ মানব বিধানের অতীত। কোন মানব বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের কার্য্য ফলে ঘটে নাই। একথা সমাজ-তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন ও বুঝিয়া থাকেন। এ কথা কখনই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিয়ম বিধান যে মহাফলের প্রসূতি—শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাধনের জন্য মানবের পক্ষে উহা যে অতীব প্রয়োজনীয়—তাহা কে অস্বীকার করিবে?

নিয়মের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী পন্থা অতিক্রম করিয়া কোন মানব কখন শ্রেষ্ঠ সাধনায় শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। যে মনুষ্য যখনই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে—শ্রেষ্ঠ-কার্য্য সমাধা করিয়াছে, সেই নিয়ম-বিধানকে মস্তকে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আশুতোষ, চিরদিনই নিয়ম-বিধানের বশবর্ত্তী ছিলেন। সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে তিনি নিয়মকে মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। কি ছাত্র-জীবনে, কি কার্য্য-কালে তিনি কখনই নিয়মকে অবহেলা অতিক্রম করিতেন না। নিয়মের ব্যত্যয় ব্যভিচারকে তিনি উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া মনে করিতেন। সংযম শ্রেষ্ঠ পুরুষ মাত্রেরই জীবনের মূলমন্ত্র। সংযম নিয়ম-বিধানেরই একটা বিশেষ ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে পুরুষ নিয়ম বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া, জীবন পরিচালনায় সমর্থ, সংযম তাহার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়া উঠে। যে মানব নিয়মের বশবর্ত্তী, সেই যথার্থ সংযমকে আয়ত্ত করিতে পারে; কায়, মন, বাক্য প্রভৃতি সকল বিষয় সংযম একমাত্র নিয়মের বিধান বলে বিশিষ্টরূপে অধিগত হইয়া থাকে। নিয়মকে মানিয়া চলিয়াই আশুতোষ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সংযত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে কখন অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলা পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ।

বাল্যকাল হইতেই আশুতোষের জীবন সুসংযত ও নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন। পঠদ্দশায় যখন তিনি চক্রবেড়ে বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন, তখন হইতেই তিনি প্রতিদিন নিয়ম অনুসারে দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। আশুতোষ চিরদিন নিদ্রা-জয়ী ছিলেন। মহাপুরুষগণের এক প্রধান লক্ষণ এই যে তাঁহারা কখন আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা প্রভৃতি তামসিক বৃত্তির অধীন হন

না। ঐ সকল দোষ কখনই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাল্যকালে পাঠের অবস্থা হইতেই আশুতোষ ঐ সকল দোষ বিবর্জ্জিত শক্তিমান পুরুষ ছিলেন।

হিন্দু শাস্ত্রে সাধারণতঃ তিন প্রকার ভাব বা শক্তির (force) বিষয় কথিত হইয়াছে। ঐ তিন প্রকার শক্তির নাম—সত্ত্ব, রজঃ ও তম। জগৎ এমন কি স্বর্গলোক দেবলোক পর্য্যন্ত ঐ ত্রিবিধ শক্তির অধীনে পরিচালিত হইয়া থাকে। গীতা বলিয়াছেন :—

"স্বত্ব রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম ॥

হে মহাবাহো, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহেস্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে।

যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কেবল তাঁহারাই সত্ত্ব গুণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। তেজীয়ান ধর্ম্মজ্ঞ সৎকর্ম্মশীল মধ্যম পুরুষগণ স্বত্ব ও রজোগুণ মিশ্রিত ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর সর্ব্ব নিম্ন স্তরের মানব তমোগুণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদির বশবর্ত্তী হইয়া অতি নীচ পাশব-জীবন পরিচালনা করিয়া থাকে।

যাঁহারা বিশুদ্ধ সাত্বিক-ভাবাপন্ন মহাত্মা পুরুষ তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করেন। তাঁহারা প্রায়ই কর্ম্মের

অতীত হইয়া থাকেন। সংসারে বা জগতের কোন সাধারণ কর্ম্ম তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদা আত্মানন্দে বিভোর হইয়া কর্ম্মাতীত অবস্থায় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। গীতা সে সম্বন্ধে বলিতেছেন।ঃ—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদত্মাতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ শুস্যকার্য্য ন বিদ্যতে।

আত্মাতে যাঁহার রতি, আত্মাতেই যাঁহার তৃপ্তি, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট তাঁহার আর কোনই করণীয় কর্ম্ম থাকে না।

ইহারাই যথার্থ সাত্ত্বিক পুরুষ—কর্ম্মাতীত মহাপুরুষ। ইহাদের ঠিক নিম্নেই দ্বিতীয় স্তরের পুরুষবর্গের স্থান। ইহারা রজঃ মিশ্রিত সত্ত্বগুণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রে সৎ শুভকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। জগতের উন্নতি উৎকর্ষণ—সমাজের কল্যাণ বিশুদ্ধি সাধন ইহাদের পুণ্যময় জীবনের পরম পবিত্রব্রত হইয়া থাকে। আর যাহারা সর্ব্ব নিম্ন স্তরের অধম মানব, তাহারা কেবল জঘন্য আহার বিহারের জন্যই জীবন-ভার বহন করিয়া থাকে।

আশুতোষ দ্বিতীয় স্তরের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। মানব-সমাজে সত্যই তিনি মহাপুরুষ-রূপে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মী ছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মযোগী হইয়া নিষ্কাম ভাবে—কেবল ভগবানের উদ্দেশে—সমাজের কল্যাণ কামনায় কর্ম্ম অনুশীলন ও কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন। সমাজের কল্যাণার্থে কর্ম্মের জন্য তিনি আপনার যাহা অভিপ্রেত—আপনার যাহা সুখপ্রদ সে সকলই

ত্যাগ করিয়াছিলেন। শিক্ষাপীঠে পদে পদে তাঁহার সে ত্যাগশীলতার নিদর্শন-নিশান পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি জগতের উন্নতির জন্য, শিক্ষার উন্নতিকল্পে কত আত্মত্যাগ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ বহু স্থলেই কে না দেখিয়াছে? আশুতোষের চরিত্র ও কর্ম্ম-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি সত্ব ও রজগুণ মিশ্রিত কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মের প্রথা—কর্ম্মের সাধনা সত্যই কর্ম্মযোগে পরিণত হইয়াছিল।

————

তৃতীয় অধ্যায়।

আশুতোষ যেমন নীতিবান চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন, তেমনি সাধু ও ধার্ম্মিক ছিলেন। নৈতিক-জ্ঞান ধর্ম্ম-জ্ঞান তাঁহার বাল্যকাল হইতেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বাল্যকালে তিনি এমনি নীতিবান চরিত্রবান ছিলেন যে কখন কোন অসৎ চরিত্র সহপাঠীর সহিত মিশিতেন না। তাঁহাকে, কেহ কখন অসৎ প্রসঙ্গ লইয়া আমোদ করিতে বা কথা কহিতেও শুনে নাই। তাঁহার সময়ে পাশ্চাত্য-শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে এদেশে শিক্ষিতগণের মধ্যে একটা ধর্ম্মহীন শুষ্ক যুক্তিবাদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই নীরস যুক্তিবাদ—Rationalism—শিক্ষিতগণের একমাত্র উপাস্য-দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল: এজগৎ কেন? এ জগতের মালিকই বা কেন? মানব-সমাজ কতকগুলা ভ্রমের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। জগৎ একটা বিষম যন্ত্রণার স্থান। জীবন দুঃখের একটা বিকট ধারা ব্যতীত আর কিছুই নয়। জগতের মালিক কেহ আছে কি না, যুক্তি তর্কে বিচার বিবেচনায় তাহা কিছুই নির্দ্দিষ্টরূপে ঠিক করা যায় না। যদি কেহ থাকে তবে সে মালিক ভাল কি মন্দ—দয়ালু কি নিষ্ঠুর—কিছুই ঠিক হয় না। যুক্তিবাদের (Rationalism) এই সব কথা গুল তখন এদেশে শিক্ষিতগণের মধ্যে

খুব প্রবল হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত আরও কয়টা—পাশ্চাত্য দার্শনিক ভাব—দার্শনিক মতও মস্তকোন্নত করিয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) আর একটা ভাব। ইহকাল —ইহজগৎ ছাড়া আর কোন তত্ত্ব মানুষের বুঝিবার শক্তি নাই। পরজীবন—পরলোক সম্বন্ধে মানব নিতান্তই অন্ধ। কেবল বাহ্য-ব্যাপার (Numena) সম্বন্ধে মানুষের যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিবার সামর্থ্য আছে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব—আধ্যাত্মিক-ব্যাপার (numena) সম্বন্ধে সে কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে না—জানিবার বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই—থাকিতে পারে না। আর একটা মত—সে মতের প্রত্যক্ষ-বাদ (Positivism) আর নর-সেবা-ধর্ম্ম (Religeon of humanity) অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সাদরে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ যাহা দেখা যায়—বুঝা যায়, তাহাই গ্রাহ্য। প্রত্যক্ষ ধরিয়া জীবন পরিচালনা করাই বুদ্ধিমান মানবের পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য-পন্থা। সমাজে থাকিয়া—সমাজবদ্ধ হইয়া রহিয়া প্রাণপণে পরস্পরের সেবা করা—যত্ন শুশ্রূষা করাই নরজীবনের সার্থকতা—উহাই মানব-জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠেয় পরমধর্ম্ম। এ সকল ছাড়া হিতবাদ বা সুখবাদ (Utilitaareanism) এ দেশীয় শিক্ষিতগণের এক প্রবল মত হইয়াছিল। এটা ঠিক হেয় ভোগবাদ (Hedonism) না হইলেও ঠিক ধর্ম্মভাব-সঙ্গত নয়। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই মত আর পাশ্চাত্য এপিকিওর মত 'Eat drink and be merry—

অর্থাৎ 'খাও নেশা করো, মজা মারো' এই নিকৃষ্ট ভোগ-বাদের জঘন্য পুতিগন্ধ সুখবাদে না থাকিলেও, উহা সুক্ষ্ম ধর্ম্মসঙ্গত ভাব নয় বলিয়া সাধু সমাজে অবজ্ঞাত হইবার যোগ্য। ঐ মত তখন শিক্ষিত প্রতীচ্যে প্রাবল্য লাভ করিয়া, বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজেও প্রবল হইয়াছিল। এই সকল বাদ—সকল মত—সকল ভাবই শিক্ষিত সভ্য পাশ্চাত্য-নাস্তিকতার নীরস শুষ্ক প্রতিধ্বনি। এক ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইয়া, তখনকার বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই সকল বিকট মতের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। বহু শিক্ষিত হিন্দু-যুবক, আপন পবিত্র ধর্ম্ম ভুলিয়া—বাহিরে না হউক অন্তরে অন্তরে ঐ সকল নাস্তিক-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। চিন্তাশীল সুশিক্ষিত আশুতোষের উপর কিন্তু ঐ সকল বিকট-বাদের বিকট-ভাব কখনই প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই। তিনি চিরদিনই অতি পবিত্র হিন্দুজীবন বহন করিয়াছিলেন—চিরদিনই হিন্দু-ধর্ম্মের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের জ্ঞান ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি আভ্যন্তরীন ব্যাপারে তিনি যেমন অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, তেমনি দান যজ্ঞাদি কাণ্ডেও আস্থা দেখাইতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম্ম-ব্যাপারে তাঁহার দৃঢ় হৃদয়ে কখনই বিপ্লব বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে নাই। বংশগত ভাব এবং ব্যক্তিগত স্বভাব ও জ্ঞান উভয় উপাদানই তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। জিরাট বলাগড়ের মুখোপাধ্যায় বংশ চিরদিনই হিন্দু-ধর্ম্মের অনুরাগী ও তাহার একান্ত পৃষ্ঠ-

পোষক বলিয়া বিখ্যাত। আশুতোষের পিতামাতাও আচারে ব্যবহারে বিশ্বাসে বিশেষ আস্থাবান ও আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। এই বংশগত ভাব আশুতোষে বিশিষ্টরূপেই সংক্রামিত হইয়াছিল। তিনি শৈশবে স্বীয় গৃহের আচার ব্যবহারে—নিজ বংশের অনুষ্ঠানে ক্রিয়াকলাপে—যেরূপ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা অনুরাগ দেখিয়াছিলেন চিরজীবনই তাহার শ্রেষ্ঠতঃ পবিত্রতা নিজ হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল প্রবাহ তাঁহাকে সেই পরম পবিত্র-ক্ষেত্র হইতে বিশেষ বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার কলিকাতার ভবনে দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কলাপে এই দৃষ্টান্ত অতি উত্তমরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ধ্যান ধারণা পূজা উপাসনা প্রভৃতি তাঁহার নিত্য অনুষ্ঠান ও কার্য্য কলাপেও সেই পবিত্র হিন্দুভাব প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইত। তিনি যথার্থই বুঝিয়াছিলেন হিন্দুধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম—অতি শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে সকল সাধনা-স্তরেরই স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যিনি যেমন অধিকারী সাধক, তাঁহার পক্ষে তেমনি বিধান ব্যবস্থা জগতের মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অন্ধ জড়-উপাসক হইতে জ্ঞানী ভক্ত—ধ্যান-সমাধি-সম্পন্ন মহাযোগী মহাপুরুষ পর্য্যন্ত একমাত্র এই সনাতন ধর্ম্মের কল্পতরু-তলে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন। অধিকার অনুসারে উন্নতি-উৎকর্ষ লাভ করিয়া, মোক্ষ নির্ব্বাণ লাভের পরম পন্থা প্রকৃষ্ট লক্ষণ একমাত্র এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আশুতোষের পূর্ব্বে এবং

কতক পরিমাণে সমকালেও অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র কতকগুলা ভ্রম ও কুসংস্কারের লীলাক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ তখন পাশ্চাত্য-শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে এ দেশীয় শিক্ষিতগণের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাই বদ্ধ-মূল হইয়াছিল। তখন দেশ হইতে শাস্ত্র-চর্চ্চা একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে—হিন্দু-ধর্ম্মে যে এমন সকল দুর্ল্লভ অমূল্য রত্নাদি বিরাজিত রহিয়াছে তাহা তখনকার তথাকথিত এদেশীয় শিক্ষিত-সমাজ আদৌ বুঝিতে পারে নাই—বুঝিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া কখন মনেও করে নাই। প্রতীচ্য-শিক্ষা মদিরার মোহে মত্ত মুগ্ধ হইয়া সেই জড়-বিজ্ঞানকেই, তত্ত্ব সমূহের শীর্ষ-দেশ বলিয়া বিনাবাক্যে বিনাযুক্তিতে গ্রহণ করিয়াছিল। এদেশের সামাজিক-ইতিহাস আলোচনা করিলে সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে মুসলমান নবাবগণের আমলে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। রাজকীয় শিক্ষাদীক্ষা ও রাজকীয় ধর্ম্ম সকল দেশে সকল জাতির উপরেই আধিপত্য-প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। মুসলমান এদেশের রাজা হইলে, ইসলামের আচার ব্যবহার, শিক্ষা ধর্ম্ম স্বতঃই প্রচণ্ড পরাক্রমে দেশীয় ধর্ম্ম দেশীয় রীতি নীতিকে আক্রমণ করিল। তাহার অনিবার্য্য ফলে হিন্দুসমাজের ধর্ম্মভাব, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার বিজাতীয় ভাবে আক্রান্ত হইয়া উঠিল। তবে মুসলমান রাজকীয়-শক্তি এদেশীয় শিক্ষায় বিশেষরূপে হস্তক্ষেপ করে নাই। মুসলমান বাদশাহ ও নবাব

গণ বিলাস সম্ভোগ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিল। দেশের শিক্ষা সুনীতির কথা বুঝিবার বা দেখিবার অবকাশ তাহাদের আদৌ ছিল না। তাই তৎকালে এদেশের শিক্ষা ও ধর্ম্মের আশ্রয়স্থল চতুষ্পাঠী সমূহে মুসলমান-প্রভাব বিশেষরূপে প্রকটিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তথাপি বাহিরে কার্য্যক্ষেত্রে মুসলমান প্রভাব যতটা হিন্দুসমাজে প্রধান্য পাইয়াছিল, তাহাতেই ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তৎপরে উরোপীয়ানগণ আসিয়া যখন এদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন হইতে দেশীয়-ধর্ম্ম ও নৈতিক-ভাব কিছু আঘাত প্রাপ্ত হইল। সর্ব্বোপরি যখন ইংরাজ-কোম্পানি বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া সুবে বাঙ্গলার অধিপতি হইল ও তাহাদের দেশীয়-শিক্ষার বিকট বীজ আনিয়া দুই হাতে এদেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রে ছড়াইতে আরম্ভ করিল, তখনই তাহা সতেজে বিকশিত হইয়া এদেশের ধর্ম্ম নীতি, ও সমাজকে গ্রাস করিবার জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল। সেই শিক্ষা-বীজ যখন বিশাল বিটপীতে পরিণত হইল, তখনই বহু শিক্ষিত যুবক দলে দলে যাইয়া, তাহার আশ্রয়তলে আনন্দ ও উৎসাহভরে দাঁড়াইতে লাগিল। বহু শিক্ষিত যুবক দেশীয়ধর্ম্ম, জাতীয়ভাব, সামাজিক রীতি নীতি ছাড়িয়া পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু প্রতীচ্য-শিক্ষার প্রভাব কখনই বীর্য্যবান আশুতোষের জীবনে প্রকটিত হইতে পারে নাই। ইহার প্রধান এক কারণ—পিতামাতার প্রতি শৈশব

হইতে তাঁহার প্রাণের অনুরাগ ও ভক্তিভাব। আর তাঁহার প্রতি পিতামাতার হৃদয়ভরা আন্তরিক স্নেহ-ভাব। এই উভয় ভাবের সহযোগ নিবন্ধন আশুতোষ শৈশব-কাল হইতেই কুলগত বংশগত হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পিতামাতার প্রতিপ্রাণের অনুরাগ ভক্তি, পুত্রকে ভিন্ন ধর্ম্মে অন্যপথে পরিচালিত না করিবার পক্ষে এক প্রধান হেতু। পুত্র যে বংশগত ধর্ম্মে ভক্তিমান হয়, কুলগত আচারে নিষ্ঠাবান হইয়া উঠে, পিতামাতার প্রতি হৃদয়ের একান্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা তাহার অন্যতম এক প্রধান হেতু বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ইহাই আমার পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্ম—পিতামাতার ধর্ম্ম—এই কথাটা ভক্তিমান পুত্রের প্রাণে সদাই জাগরূক থাকে; ইহাই আমার কুলের আচার—পিতা মাতার অনুষ্ঠিত নীতি ব্যবহার, একথা শ্রদ্ধাবান মানব, জীবনে কখন ভুলিতে পারে না। এই পিতৃমাতৃভক্তি, সুপুত্রকে কখন পরকীয় ধর্ম্ম, পরকীয় আচার ব্যবহারের প্রতি প্রাণের আকর্ষণ আনিতে দেয় না। আমাদের মনে হয় যত লোক পরধর্ম্ম, পরকীয় আচার গ্রহণ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের প্রাণে যেন পিতামাতার প্রতি একান্ত ভক্তি ভাবের কিছু না কিছু অভাব ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য এমন অনেক পিতৃ-মাতৃভক্ত তেজস্বী পুরুষ আছেন যাঁহারা বিচার বিবেচনার প্রেরণায়—বিবেক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের ধর্ম্ম, অপরের আচার গ্রহণ করেন; কিন্তু গণনার হিসাবে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প—

বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। যদি আমাদের দেশে আমাদের সমাজে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ, স্বজাতীয়—আচার অনুষ্ঠান ত্যাগের দৃষ্টান্ত ধরিয়া একথাটী আলোচনা করা যায়, তবে উহার সত্যতা সারবত্বা যে সহজেই উপলব্ধি হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের স্থান নাই।

পিতামাতার প্রতি প্রাণের ভক্তি, হৃদয়ের শ্রদ্ধা শৈশব অবস্থাতেই আশুতোষের জীবনে বিকশিত হইয়াছিল। ঐ ভক্তি শ্রদ্ধা উত্তরজীবনে বিশেষরূপে সংপুষ্ট সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই মাতৃ ভক্তির বলে—তিনি ভারতের ভাগ্য বিধাতা বড়লাটের বিলাত-গমন-প্রস্তাব অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

(অধ্যয়ন)

আশুতোষ বঙ্গ-বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা-শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। সেখানে শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ইংরাজী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন একটা কথা উঠিল, তাহাকে কিরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে? কথাটি বিশেষ সমস্যার কথা। কেননা যে জীবন জগতের একটা খুব মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে নিয়োজিত হইবে—যে ভারতের উচ্চ-শিক্ষার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিবে ও শ্রেষ্ঠাংশে তাহার বিধান-কর্ত্তা হইবে —তাহার নিজের শিক্ষা দীক্ষা কিরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত ও সংসাধিত হইবে, তাহা নিশ্চয়ই একটা বিশেষ রহস্য-সঙ্কুল প্রহেলিকার কথা বৈকি। যিনি জগতের সকল ব্যাপারের বিধান-কর্ত্তা, এমন পুরুষের শিক্ষাদীক্ষার পন্থা-প্রণালী কেবল তাঁহারই নিকট পরিজ্ঞাত—তাঁহারই মুষ্টি-মধ্যস্থ ক্ষমতাধীন। আশুতোষের পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ একজন তৎসময়ের বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে সে লোক নহেন। সেকালের বি, এ। তদুপরি মেডিকেল কলেজ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ উপাধি এম, বি, উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে কেবল কলিকাতার নয়—সমগ্র বাঙ্গালাদেশের

মধ্যে একজন খুব বড় ডাক্তার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তিও প্রচুর। তিনি কলিকাতার মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি, শিক্ষা সৎগুণের কেন্দ্রভূমি স্বরূপ ভবানীপুরে ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়া, চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অসাধারণ কৃতকার্য্যতা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি, চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সমূহ তৎকালে গঙ্গাপ্রসাদকে কেবল ভবানীপুরে নয়—কেবল কলিকাতায়ও নয়—পরন্তু সমগ্র বঙ্গদেশে—বিশেষ বিখ্যাত করিয়াছিল। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ একজন প্রধান পণ্ডিত ও মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন। কেবল চিকিৎসা-ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না। বিশ্বস্তসূত্রে আমরা জানিয়াছি তিনি কেবল নীরস শুষ্ক ডাক্তার ছিলেন না। তিনি একজন সুরসিক ও ভাবুক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একখানি কাব্য রামায়ণ গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ কর্ম্মক্ষেত্রে যেমন কৃতী ডাক্তার ছিলেন, তেমনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সমূহে তাহার প্রকৃষ্ট পবিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাপ্রসাদ বহু বিষয়েই একজন বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ পিতারই আশুতোষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুত্র হইয়া থাকে। ধর্ম্মসম্বন্ধেও গঙ্গাপ্রসাদ মহাজ্ঞানী ও ভক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি রামচরিত্রে ভক্তিবান রামায়ণ-পূজক ব্রহ্মদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাসুকৃতি সৌভাগ্যের

সুফলে তিনি আশুতোষের ন্যায় সুপুত্র লাভ করিয়াছিলেন। আশুতোষও পূর্ব্ব-জন্মের ভাগ্যফলে এমন মহৎ পিতা লাভ করিয়াছিলেন। এ মহৎ সংযোগ সম্মিলন অবশ্য ভগবৎ-বিধানের ফল বলিতে হইবে। ভগবান নিজ লীলা-কাণ্ডে বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্যই প্রয়োজন অনুসারে বিশিষ্ট পিতামাতার নিকট বিশিষ্ট সন্তান প্রেরণ করেন। তিনি নিজেও মহা তপস্বী তেজস্বী পিতার নিকট যুগ-ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। রামচন্দ্র দশরথের ন্যায় পিতার নিকটই আসিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ন্যায় পরম ধর্ম্মাত্মা পিতার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আশুতোষ শ্রেষ্ঠব্যক্তি—মহাপুরুষ নিশ্চয়ই। তাঁহার ন্যায় পুরুষসিংহ বর্ত্তমান বঙ্গে আর কোথায়? আশুতোষের ন্যায় তেজস্বী মনস্বী বর্ত্তমান বঙ্গে আর দ্বিতীয়টি দেখাইতে পার কি? গঙ্গাপ্রসাদই উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত পিতা। ভগবান যাঁহাদিগের দ্বারা মনুষ্য-সমাজের বিশেষকার্য্য সাধান করাইয়া লন, তাঁহাদিগকে এইরূপ শ্রেষ্ঠ পিতারই নিকট পাঠাইয়া থাকেন।

আশুতোষ যোগভ্রষ্ট পুরুষ ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে একজন মহাযোগী মহাপুরুষ ছিলেন। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন:—

"শুচীনাং শ্রীমতাংগৃহে যোগভ্রষ্টাভিজায়তে।"

পবিত্র শ্রীমানের গৃহে যোগভ্রষ্ট-যোগী জন্ম গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আশুতোষের জন্ম দৈব-অভিমুখী। যাঁহারা যোগভ্রষ্ট তাঁহারাই তো দৈব-অভিমুখে জন্মিয়া থাকেন।

যোগভ্রষ্ট-যোগী আশুতোষ এই জন্মে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ যেন উভয় যোগই সাধনা করিতে আসিয়াছিলেন।

যেমন ধর্ম্মধিকরণ-ক্ষেত্রে কর্ম্মযোগে, তেমনি বিদ্যাপীঠে শিক্ষা-ক্ষেত্রে জ্ঞানযোগের সাধনায় তিনি সিদ্ধি সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই তাঁহার এই যোগ-সাধনার সুকৌশল নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

আশুতোষ একাধারে কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগী ছিলেন। জ্ঞানের অবশ্য স্তরভেদ আছে। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠস্তর—চরমস্তর অবশ্য তত্ত্বজ্ঞান।—সেই পরম-জ্ঞান—চরম-বিজ্ঞান যাহা অধিগত হইলে আর জানিবার বুঝিবার কিছুই বাকি থাকে না।

"যজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যাসি পাণ্ডব।
যেন ভূতন্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥"

অর্থাৎ হে পাণ্ডব, যে জ্ঞান লাভ করিলে, তুমি আর এইরূপ মোহ পাইবে না এবং যে জ্ঞান দ্বারা ভূতগণকে আত্মাতে, অনন্তর আমাতে অশেষরূপে দর্শন করিতে পারিবে।

ইহাই অবশ্য গুঢ় তত্ত্বজ্ঞান—পরম-জ্ঞান বা চরম-বিজ্ঞান। এ জ্ঞান, যোগী-জনের পক্ষেই লভ্য উপভোগ্য। জ্ঞানের পূর্ণ পরি-পক্কতায় ঐ পরম জ্ঞানের অবস্থা অধিগত হইয়া থাকে। আশুতোষ সেই পরম জ্ঞান-ক্ষেত্রে যাইবারই সূক্ষ্ম পন্থা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি উচ্চশিক্ষা, শ্রেষ্ঠ বিস্তার,

পথনির্দ্দেশ করিয়া একপক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা সচ্ছন্দকর সম্প্রসারিত করিয়াছেন। একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

গঙ্গাপ্রসাদও যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ পিতা। মহাপুরুষ আশুতোষ কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-সাধনা করিতে তেমন পিতার নিকট আসিয়াছিলেন। পতিত অভিশপ্ত বঙ্গের তথা ভারতের —বিদ্যাক্ষেত্রে শিক্ষা-ব্যাপারে সংস্কার সমুন্নতি সাধন করিতে তিনি আসিয়াছিলেন। যে বিদ্যার বলে জাতীয়-জীবন প্রবুদ্ধ হইবে—যে শিক্ষার ফলে সুপ্তমৃত দেশ জাগিয়া উঠিবে—সেই বিদ্যা সেই শিক্ষার পন্থা নির্দ্ধারণে প্রসারণে—মহাপুরুষ আশুতোষ মহামূল্যবান জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন। আশুতোষ এই পতিত দেশের—অভিশপ্ত যুগের জাতীয়-জীবনের প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগুরু—শিক্ষানেতা। গঙ্গাপ্রসাদও সময়োপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আশুতোষের ন্যায় পুত্রকে তো গঙ্গাপ্রসাদের ন্যায় পিতার নিকটেই আসিতে হয়। ইহাই যে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বকর্ত্তা বিধাতার অলঙ্ঘনীয় অপূর্ব্ব বিধান। আশুতোষের ন্যায় পুরুষ-প্রবরের শিক্ষার ব্যবস্থা ভার ভগবান গঙ্গাপ্রসাদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন; নতুবা যিনি জাতি-উদ্ধারের মৌলিক বীজ বপন করিতে আসিবেন—তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা-বিধান আর কোন পিতা করিতে সক্ষম? তেমন ভাগ্যবান্—তেমন উপযুক্ত শিক্ষাদাতা গঙ্গাপ্রসাদ ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

পুত্রের জন্য তিনি যে শিক্ষার বিধান-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের কয়টি পিতায় পরিদৃষ্ট হয়? পুত্রের সৎ ও উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন পিতাই বা এমন উৎসুক এতো যত্নবান ছিলেন; ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ যেমন জ্ঞানী পণ্ডিত তেমনি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ধীর স্থির পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নিজ জীবনে যেমন শিক্ষার একটা মহামন্ত্র সাধনীয় ছিল, পুত্রকেও সেই মন্ত্র-বীজে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যাহাতে শিক্ষার সেই মহামন্ত্র সিদ্ধিলাভ করে, তৎপক্ষে সর্ব্বদাই মহাগুরুর ন্যায় পুত্রকে পর্য্যবেক্ষণ—পুত্রের শিক্ষা-ব্যাপারে সতত তত্ত্বাবধান করিতেন।

'ভাল করিয়া শেখা চাই,' এইটা যেমন গঙ্গাপ্রসাদের নিজ জীবনে শিক্ষার মহামন্ত্র ছিল, তেমনি শিক্ষা-সম্বন্ধে শিষ্য-সম পুত্রের প্রাণেও সেই মহামন্ত্রের মহৎ বীজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠিত বীজ বিকশিত হইয়া, যাহাতে ফল ফুলে পরিশোভিত মহামহীরুহে পরিণত হয় তৎপক্ষে পিতা পরম যত্নবান্ ছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত পুত্রের শিক্ষা ও চরিত্র-গঠন তাঁহার জীবনের জপ-মন্ত্র হইয়া গঙ্গাপ্রসাদের বিশাল হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। বাস্তবিক পুত্র কিসে শিক্ষায় ও চরিত্র-বলে সমাজে শ্রেষ্ঠপুরুষ রূপে পরিগণিত পরিপূজিত হইবে, তৎপক্ষে পিতা গঙ্গাপ্রসাদের ধ্যান জ্ঞান জপ তপ আদি সকল ভাব—সর্ব্ববিধ সাধনাই সর্ব্বতোভাবে প্রজোযিত হইয়াছিল। পুত্রের উন্নতি উৎকর্ষণ পক্ষে তিনি সর্ব্বদাই এত সতর্ক থাকিতেন, যে আহার

নিদ্রাতেও যেন পুত্রের শিক্ষা সমুন্নতির কথা না ভাবিয়া সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। 'ভাল করিয়া শেখা চাই' এ কথাটী সকল সময়ই পুত্রকে শিখাইবার জন্য উপদেশ দিতেন। পুত্রও একান্ত মনে—কায়মনোবাক্যে—পিতার সে মহামূল্যবান্ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ ও পোষণ করিয়া রাখিতেন।

'ভাল করিয়া শেখা' এই কথা কয়টার মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে নিগূঢ় অর্থ নিগূঢ় তত্ত্ব গ্রথিত রহিয়াছে। আজি কালি এদেশে শিক্ষার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে শিক্ষার এই মর্ম্মকথা সাধারণের পক্ষে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে। শিক্ষা এখন এদেশে প্রচুর পরিমাণে চলিয়াছে। নিম্নশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানা অঙ্গের নানা শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু কোন শিক্ষা উপযুক্তরূপে—প্রকৃত ফলপ্রদ ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে? নিম্ন শিক্ষা, মধ্য শিক্ষার কথা ছাড়িয়া, যদি কেবল উচ্চ শিক্ষার কথা আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাতেই আমরা কি সুফল দেখিতে পাই? যদি উচ্চ-শিক্ষার বিষয় বিশেষ রূপে বিবেচনা ও আলোচনা করা যায়, তবে সে সম্বন্ধে দেশের অবস্থা দেখিলে কে আশা উৎসাহে উৎফুল্ল হইতে পারে? বাস্তবিক উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য কি—আর লক্ষণই বা কি? এ কথাটা এখানে একটু আলোচনা করিলে, তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হৃদয় ও চরিত্র-গঠনই উচ্চ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ-উদ্দেশ্য। যাহাতে

মানুষ, মনুষের-মত-মানুষ হইতে পারে—যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হইতে পারে—তাহাই উচ্চশিক্ষার পরিণাম-ফল। হৃদয় মস্তিষ্ক লইয়াই মানুষ যথার্থ মানুষ। এই দুইএর শ্রেষ্ঠ গুণ উচ্চভাব যাহাতে প্রকৃষ্টরূপে অভিব্যক্ত বিকশিত হইতে পারে, তাহাই উচ্চশিক্ষার চরম পরিণতি। আর ঐ দুইটির—অর্থাৎ হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণ বা বৃত্তি আছে, তাহাদের সমঞ্জস-ভাবে অনুশীলন (Culture) শ্রেষ্ঠ-শিক্ষার প্রকৃষ্ট অঙ্গ বা লক্ষণ। মনোবিজ্ঞান উচ্চশিক্ষার তুলাদণ্ড। এই দণ্ড ধরিয়া শিক্ষার বিধান-পন্থা নির্দ্দেশ করিতে হয়। পাশ্চাত্য-মনোবিজ্ঞান (Psychology) মানব-মনের তিন ভাব বা বৃত্তি-শক্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বেদনা (feeling) বাসনা (Willing) ও জ্ঞান (Knowing) এই তিনটি মানব-মনের বৃত্তি। এই তিন বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত করাই উচ্চ শিক্ষার চরম পরিণতি। বেদনা বৃত্তি (feeling) অনুশীলন দ্বারা হৃদয়ের শ্রেষ্ঠভাব—দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি আদি উৎকৃষ্ট ভাব সমূহ—বিকশিত হইয়া থাকে। আর জ্ঞানশক্তি (Knowing) দ্বারা গবেষণা, কল্পনা, স্মৃতি আদিশক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। চিত্তরঞ্জনী-বৃত্তি (esthetic faculties) বেদনা ও জ্ঞান উভয় বৃত্তি-শক্তির অনুশীলন-সাপেক্ষ। প্রধানতঃ মানব-মনের পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেষ্ঠ বৃত্তি—বেদনা, বাসনা ও জ্ঞান (Feeling, willing and knowing) ধরিয়াই মনুষ্যত্বের অনুশীলন ও

পরিস্ফুরণের বিশেষ বিধান নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বেদনা বৃত্তি অনুশীলন দ্বারা যেমন দয়া শ্রদ্ধাদি গুণ বিকশিত হয়, জ্ঞান-বৃত্তি (Knowing) অনুশীলন দ্বারা যেমন চিন্তা, কল্পনাদি ভাব পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হয়, তেমনি বাসনা (willing) অনুশীলনে মানবের কর্ম্ম-শক্তি সুগঠিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে এইপর্য্যন্ত বলা যায় যে উক্ত ত্রিবিধ মানস-শক্তির যে সকল উচ্চ ভাব আছে, অনুশীলন দ্বারা তাহাদের প্রকৃষ্টরূপ অভিব্যক্তি-সাধনই উচ্চ শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ। আবার ঐ সকল মনোবৃত্তির অনুশীলন-ব্যাপারে সামঞ্জস্য বজায় রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা এক বৃত্তির বিশেষরূপে বা অধিক মাত্রায় অনুশীলনে অপর বৃত্তির অল্প অনুশীলন অথবা অনুশীলন-অপচয় ঘটিয়া থাকে। তাহাতে সেই বৃত্তি নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিতে পারে না। যে অনুশীলনে (culture) এমন ব্যভিচার অভাব ঘটে, তাহা কখনই উচ্চশিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি যদি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে মনোবিজ্ঞান-সম্মত এই সূক্ষ্ম বিধান অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই বিধানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থাতেই মানুষ যথার্থ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে। তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়া থাকে—মানুষ মানুষের-মত-মানুষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ

অনুশীলনই অবশ্য উচ্চশিক্ষার দুই প্রধান অঙ্গ। মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িতে হইলে, দুই শিক্ষার পথই প্রসারিত ও পরিমার্জ্জিত করা আবশ্যক। এই প্রকৃতির উচ্চশিক্ষা—আর যোগাঙ্গের সাধনা একই কথা। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি আর যোগী পুরুষ উভয়ই এক—পার্থক্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই। বাস্তবিক পক্ষে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যে জন, সেই পুরুষই একাধারে কর্ম্মযোগ—জ্ঞানযোগ—ভক্তিযোগেরও অধিকারলাভ করিয়া থাকেন। ইহাই গীতার চরম শিক্ষা।

এখন পাশ্চাত্য-জগতে অতিমানব (Superman) গঠনের প্রচেষ্টা অতি প্রবল ভাবে উঠিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় অতিমানব (Superman) যোগ-সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পুরুষেরই নামান্তর ভাবান্তক ব্যতীত আর কিছুই নয়—আর কিছুই হইতে পারে না। মানবের দুর্দ্দশা—অধোপতন দেখিয়া সভ্য শিক্ষিত বিজ্ঞান-বলদৃপ্ত-উরোপের হৃদয়-বেদনা উথলিয়া উঠিয়াছে। কিসে এ দুর্দ্দশা দূর করিয়া, কিসে মানবের উন্নতি উৎকর্ষ সাধন করিয়া—অধোপতিত মানবকে উর্দ্ধে উঠাইয়া অতিমানবে বা শ্রেষ্ঠ মানবে (Superman) পরিণত করিতে পারা যায়, সেই চেষ্টায় প্রতীচ্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্ধপ্রায় য়ুরোপ জানে না—বুঝে না যে কেবল জড়-বিজ্ঞানের সাধনায় মানবের বাহ্যঅঙ্গ জড়ভাব পরীশীলন বা পরিবর্দ্ধন করিতে পারিলে মানুষ যথার্থ মানুষ হয় না—তাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হইতে পারে না। মানুষকে মানুষ করিতে

হইলে—তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে হইলে বর্ত্তমান শিক্ষার পদ্ধতি-পন্থা একেবারে উল্টাইয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য পন্থায় তাহাকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া সে পন্থা-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় সে পন্থা প্রণালী বুঝিবার জন্য, গ্রহণের জন্য প্রতীচ্যকে—সে জড়-বিজ্ঞান-ব্যাপারে যত বড়ই হউক না কেন—প্রাচ্যের মুখপানে নিশ্চয়ই চাহিতে হইবে। যে প্রাচ্য—প্রাচ্যের শীর্ষমণি ভারত —যে শিক্ষা-উৎকর্ষণের ফলে একযুগে সমগ্র জগতে প্রতিভা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা দীক্ষাকে পুনরায় সজীব করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে!

কেবল জড়দেহ লইয়া মানব, মানব নহে। কেবল জড়-দেহের বিকাশে মনুষ্য মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। জড়-দেহের অতীত যে ভাব যে শক্তি—যাহার নাম আধ্যাত্মিক-শক্তি —আধ্যাত্ম-ভাব, তাহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদান। দেহ আত্মা এই দুই লইয়া—দুই ধরিয়াই মানুষ পূর্ণ-মানব। মানবের পূর্ণত্ব সাধন করিতে হইলে, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে হইলে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দুই ভাবেরই উন্নতি পুষ্টি সাধন আবশ্যক। তদ্ভিন্ন কিছুতেই পূর্ণ মানবের বিকাশ হইতে পারে না—মনুষ্যের পূর্ণ-মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় প্রকৃত শিক্ষার জন্য, সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার জন্য—বাহ্য দৈহিক অঙ্গাদির অনুশীলন অপেক্ষা আধ্যা-

ত্মিক-তত্ত্বের আলোচনাঅনুশীলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু সে আলোচনা অনুশীলন য়ুরোপেও এখন আর নাই—এদেশ হইতেও উঠিয়া গিয়াছে বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। আধ্যাত্মিক-চর্চ্চা আলোচনার স্থলে হেয় জড়বাদ আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শনাদি আধ্যাত্মিক অনুশীললের স্থান জঘন্য যুক্তিবাদ (Rationalisn) সবলে দখল করিয়াছে। এই কি শিক্ষা—ইহার নাম কি উচ্চ শিক্ষা ?

উচ্চ শিক্ষা—প্রকৃত শিক্ষা—যে শিক্ষার ফলে মানুষ যথার্থ মানুষের মত মানুষ হয়—যে শিক্ষার বলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়—তাহা আর শিক্ষা সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত য়ুরোপে নাই—ভারতেও নাই। উচ্চ শিক্ষার মধ্যে যে অতি পবিত্র ভাব, শিক্ষার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতকে এক সময় সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ স্তরে সমুত্থিত করিয়াছিল, তাহা আর এখন এদেশেও নাই—জগতের কোথাও নাই। নালান্দার সে উনিভারসিটি—সে অধ্যয়ন অধ্যাপনা ভারতে কোথায় এখন পরিদৃষ্ট হয় ? কাশীধামের হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় যতই উচ্চ আদর্শে—যেমনই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিমাপে প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন—অতীত ঋষি-যুগের শিক্ষা-প্রণালীর কথা, তুলনায় আলোচনা করিলে, কখনই লঘুতা ভিন্ন বোধ. হয় গুরুত্ব গৌরব লাভ করিতে পারে না। সেকালে শিক্ষায় যে মানুষ তৈয়ারি হইত—যাহার ফলে বেদ বেদান্ত উপনিষদ

ষড়্দর্শন, রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত আদি জগতের অমূল্য গ্রন্থ সমূহ প্রচারিত হইয়া, পাপ তাপ পরিতপ্ত জগৎকে ধন্য কৃতার্থ করিয়াছে—সে শিক্ষা দীক্ষা এখন কোথায়? তখন ভারতে যে শিক্ষা ছিল, তাহাতে মানুষের মস্তিষ্ক যেমন পূর্ণাঙ্গে গঠিত হইত, হৃদয়ও তেমনি সম্যক প্রকারে পরিস্ফুরিত হইত। উভয় বৃত্তির ভাব শক্তি সমঞ্জস ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পাইত। তখনকার শিক্ষায় বাস্তবিকই মানুষের মত মানুষ তৈয়ারি হইত। ঋষি-যুগের—বৌদ্ধ যুগের সহিত এ যুগের তুলনায় একটু আলোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়—আমরা কি ছিলাম আর কি হইয়াছি! বাস্তবিক এখন আমরা কেবলমাত্র সদাই মৃত্যুভয়ে ভীত অবসাদগ্রস্ত কতকগুলি গোলাম ভিন্ন আর কিছুই তো নই। আমাদের দিন এখন কিরূপে কাটিতেছে? অতি ভারগ্রস্ত জীবনের দুর্ব্বিসহ কণ্টকময় দিন যেন এক একটি করিয়া অতিকষ্টে আমরা সম্মুখ হইতে সরাইয়া, কোন রকমে কঠিন পীড়াগ্রস্ত পরমায়ুটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছি। জীবনে আর কোন উৎসাহ নাই—আশা নাই—আনন্দ নাই। যাহারা দেশের শিক্ষিত বলিয়া বুকফুলাইয়া বড়াই করিয়া বেড়ায়, তাহারা যদি একটা মুনসেফি ডেপুটিগিরি বা পসার-ওয়ালা উকিল কি ডাক্তার হইতে পারে, তবেই মানব-জন্ম—মানব-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে সফল সার্থক বলিয়া আপনি আপনাকে মহা ধন্যবাদ দিয়া থাকে। এতই নীচ আমরা—

এমনই সঙ্কীর্ণ আমাদের হৃদয়, যে জীবনে ততটুকু লাভ করিতে পারিলেই স্বর্গে আমাদের ঘণ্টা বাজিল বলিয়া আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্যবান্ বলিয়া কৃতকৃতার্থ হই। কবির কথায় কহিতে পারি নাকি—'গোলামের জাতি শিখেছি গোলামী?' গোলামীই হউক—ধূর্ত্ততা প্রতারণাই হউক কোনরকমে যদি পিতা-পিতামহ-প্রদত্ত প্রাণটাকে আরও কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারি—জীবনের পাট্টার মেয়াদটা যদি চিত্রগুপ্তের চক্ষে ধূলি দিয়া আরও কয়টা দিন বাড়াইয়া লইতে পারি, তবেই তো ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ মনে করি। এই তো এখন এদেশে জীবনের মূল্য! জীবনের এমন অধোপতন কেন হইল—জীবনের এমন মুল্যই বা কিসে দাঁড়াইল? এক শিক্ষার অভাব—কুশিক্ষার ফল। যে কুশিক্ষার ফলে আর দেশে মানুষের মত মানুষ তৈয়ার হইতেছে না—হইতে পারে না—সেই কুশিক্ষাই আমাদের এই সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

হয়তো কোথায় একটু মস্তিষ্কের কোন অংশ গঠিত হইতেছে কিন্তু তথায় হৃদয় নাই—কোথাও হয়তো কিঞ্চিৎ হৃদয়-ভাবের স্ফুরণ দেখি—কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তি তথায় আদৌ নাই। সত্যই আমরা শিয়াল কুকুরের জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছি! সুতরাং কেন সেই ভাবে বৈদেশিক কর্ত্তৃক বিবেচিত ব্যবহৃত না হইব?

শিক্ষার পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে হইবে। শিক্ষা-বিধানে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। বাস্তবিকই 'ভাল করিয়া শিখিতে

হইবে' ভাল করিয়া ছেলে মেয়েদিগকে শিখাইতে হইবে। সে শিক্ষার উপায় উপাদান কি? যিনি তাহা নির্দ্ধারণ করিতেন —যিনি নির্দ্ধারণ করিয়া মৃত দেশকে সজীব করিতেন— সুপ্ত জাতিকে জাগাইতেন—জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, দেশের মহাদুর্ভাগ্য অকালে করাল-কাল সেই আশুতোষকে হরিয়া লইল!

আশুতোষ পিতৃ আদেশ শিরে ধারণ করিয়া নিজে ভাল করিয়াই শিখিয়াছিলেন। যে শেখায় মানুষ যথার্থই মানুষের মত মানুষ হয়, সেই 'শেখাই' শিখিয়াছিলেন। তাই আশুতোষ এমন পতিত জাতির মধ্যেও মানুষের মত মানুষ হইয়াছিলেন। যে মহামন্ত্রের পথে আপনাকে শিখাইয়াছিলেন —সেই পথে জাতিকেও শিখাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আশুতোষ মহাপুরুষ। আশুতোষের সকলই মহান। আশুতোষের প্রাণও মহান—বিরাট আশুতোষের শিক্ষাও বিরাট। আশুতোষ যাহা শিখিতেন, তাহা ভাল করিয়াই শিখিতেন। শিক্ষার এই ভাব—এই বিধান তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি শিক্ষা করিতেন—যেন শিক্ষার বিধান ব্যবস্থা করিতেই পতিত বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আশুতোষের পিতা পুত্রকে ভাল করিয়া শিখিতে বলিয়াছিলেন। ইহা যেন বিধির একটা অলঙ্ঘনীয় বিধান। এ কথাটা

যেন পিতা পুত্রকে বলিবেনই করাইবেনই, ইহা পূর্ব্ব হইতে বিধাতা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা যেন 'অধিকন্তু'—কথাটা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজনই ছিল না। আশুতোষকে 'ভাল করিয়া' শিক্ষার কথা বলা বাহুল্য কথা—উপদেশের আধিক্য নয় কি? আশুতোষ যে কেবল শিখিবার জন্যই মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি কেবল শিখিবার জন্য, শিখাইবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাকে তো ভাল করিয়াই শিখিতে হইবে। 'ভাল করিয়া শেখাই' যে তাঁহার প্রকৃতিগত ভাব—প্রাকৃতিক-ধর্ম্ম।

গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষা যতদূর উঠিতে পারে উঠাইতে পারে, আশুতোষ ততদূর পর্য্যন্ত খুব ভালভাবেই নিজেও উঠিয়াছিলেন—জাতিকেও উঠাইবার জন্য প্রাণপণে যত্নবান হইয়াছিলেন।

পাঠশালের পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ ষ্টুডেণ্টসিপ পর্য্যন্ত যত শিক্ষার যতটা বর্ত্তমান কালে এদেশে প্রচলিত আছে আশুতোষ সে সকলই সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়াছিলেন।

ভাল করিয়া শিখিবেন বলিয়াই যে বিধাতা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাল্য-জীবনের ক্রিয়ায় কথায় আরও ভালরূপে বুঝা যায়। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের শিক্ষার জন্য গোড়াগুড়ি নিতান্ত ব্যাকুল ছিলেন। বালক পুত্রকে পিতা গঙ্গাপ্রসাদ বঙ্গ-বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। পুত্র প্রথম দিনেই পাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—ও একটা যাত্রার 'আখ্ড়া'। কথাটা শিশু আশুতোষের মুখে বাহির করাইয়া

বিধাতা পাঠশালার অবস্থা সম্বন্ধে অভিভাবকদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন।

পাঠের জন্য—ভাল করিয়া শিখিবার জন্য—শিশুপুত্র আশুতোষ স্বয়ং যেমন ব্যগ্র, আশুতোষের পিতা যেন তদপেক্ষাও যত্নবান আগ্রহান্বিত। পুত্রের মুখে কথা শুনিয়া, ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের প্রাণ চমকিত হইল। তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। উপায় কি—পাঠশালায় যাত্রা আখড়ার বিশৃঙ্খলা গোলযোগ নিবারণের উপায় কি? উহা নিবারণ করিয়া শান্তি ও সুবিধান প্রবর্ত্তন করিতে না পারিলে পুত্রের অধ্যয়নে বিশেষ বাধাবিঘ্ন ঘটিবে। ভাবিয়া গঙ্গাপ্রসাদ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। নিজেই ছুটিয়া পাঠশালে উপস্থিত হইলেন। যেখানে পাঠশালা বসিত, সে বাড়ীটি নিতান্ত ছোট নয়। গঙ্গাপ্রসাদ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তখন হইতে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রগণ বসিয়া পড়াশুনা করিবে।

আশুতোষ এই ব্যবস্থায় পরিতুষ্ট হইলেন। ইহাতে যাত্রা আখড়ার গোলমাল বিদূরিত হইল। গোলমাল যে অধ্যয়ন-ব্রত ছাত্রের পক্ষে কি অনিষ্টকর কতদূর কষ্টকর, তাহা সৎছাত্র মাত্রেই জীবনের কোন দিন উপলব্ধি করিতে অবশ্যই সমর্থ হইয়াছে। আশুতোষের ন্যায় বিদ্যাব্রত অধ্যয়ন-নিরত-ছাত্র যে গোলমালের বিড়ম্বনা সহজেই উপলব্ধি করিবে, ইহা অতি স্বতসিদ্ধ কথা। গোলমাল, এদেশে বিদ্যালয়ের একটা প্রথা রূপে কিছুদিন পূর্ব্বে আশুতোষের সময়েও এদেশে প্রচলিত ছিল—এখনও আছে।

ইহার একটা কারণ হিন্দুছাত্র আর পূর্ব্বের মত শিক্ষককে গুরু ভাবে ভক্তি করে না। শিক্ষা-গুরুগণেরও আর ছাত্রগণের প্রতি সদাশয়তাও নাই—সহানুভূতিও নাই। নতুবা শিক্ষকের উপস্থিতিতেও বর্ত্তমানে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে কিরূপে গোলমাল করিতে সাহসী হইতে পারে? শিক্ষাগুরুর প্রতি শিষ্যছাত্রের যদি তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা অকৃত্রিম অনুরাগ সম্মান থাকিত, তবে তাঁহার বিদ্যমানে কখনই তাহারা রুদ্রমূর্ত্তিতে গোলমাল বা ভঙ্গিসহ হাঁসি তামাসা করিতে পারিত না। আমরা যথার্থই পঠদ্দশায় বিদ্যালয়ে এমন সকল বিষয়ে দৃশ্য দেখিয়াছি—বিশেষতঃ সংস্কৃত বাঙ্গলার অধ্যাপক ক্লাসে পড়াইতে আসিলেই, সে দৃশ্যের বিকট ভাব আরও প্রকটিত হইয়া উঠিত। গুরু শিষ্য মধ্যে এরূপ ভাব জাতীয়-জীবনের ঘোর অধোপতনের একটা বিশেষ লক্ষণ। যত প্রকার দুর্নীতি মানব-জীবনে ঘটিতে পারে, তাহার প্রথম স্ফুরণ ছাত্র-অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক আমারা যে নিতান্তই পতিত হইয়াছি, তাহার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ—ছাত্র অবস্থায় আমাদের মধ্যে নানাবিধ দুর্নীতির উদ্ভব ও বিকাশ। সেই সকল দুর্নীতির মধ্যে গুরুভক্তির অভাব—গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা অসম্মান প্রদর্শন—আরও একটা প্রবল কদাচাররূপে এদেশে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছাত্র-জীবনে বিশেষতঃ হিন্দুর দেশে এমন ব্যাপার একটা নিতান্ত ঘৃণা লজ্জার কথা—বিড়ম্বনার বিষয় নয় কি? সৎপাত্রে ভক্তি—গুরুজনে শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন, প্রাণের একটা অতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ—জীবনের

প্রধান গুণ। এই সম্পদ সৎগুণ যে জীবনে নাই, সে জীবন শ্রেষ্ঠ আদর্শের গুঢ়মর্ম্ম কখনই অন্তরাত্মায় অবধারণ করিতে পারে না। সে কখন নিজে বড় হইতেও পারে না—বড় কাজও কিছু করিতে পারে না। ভক্তি শ্রদ্ধাহীন-জীবন অতি শুষ্ক—অতি নীরস। মরুভূমির ন্যায় সে জীবনের অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে পুণ্যময় শুভফলপ্রদ বিটপী বিকশিত হইতে পারে না।

বিদ্যালয়ে শিক্ষামন্দিরে যে গোলমাল বা কোনরূপ দুর্নীতি দুর্ব্যবহারের উত্তেজনা-উচ্ছাস ঘটে, গুরু শিষ্যের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব তাহার প্রধানকারণ। আশুতোষ সুনীতি-পরায়ণ সৎ সুশীল ছাত্র বলিয়া চিরদিনই বিখ্যাত। তিনি কখনই গুরু শিক্ষকের প্রতি অসৎ ব্যবহার করেন নাই। সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের কার্য্য কলাপে সতত সম্মান প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পঠদ্দশায় ক্লাসে যাইয়া নিজেও কখন গোলমাল করেন নাই; অপর ছাত্ররা যে কেহ ক্লাসে কোনরূপ গোলযোগ করে তাহাও তিনি ভালবাসিতেন না। তিনি যে শৈশবকাল হইতেই পরম পবিত্র ভাবে অধ্যয়ন ব্রতধারী হইয়াছিলেন। অধ্যয়নকে জীবনের অতি সৎ পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন—সেই ভাবেই তাহার সাধনা করিতেন। যিনি সেই পবিত্র অধ্যয়নের মর্ম্ম-তত্ত্ব জীবনে প্রেরণ করিতেন, তাঁহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। অতি শৈশব হইতেই তাঁহার প্রাণে

শিক্ষাগুরুর প্রতি এই পবিত্র ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

যখন বাঙ্গালা পাঠশালে পড়িতেন, তখন হইতেই তিনি সংযত সুশীল ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। গুরুর প্রতি ভক্তি—অধ্যয়নের প্রতি প্রাণের আকর্ষণ অনুরাগ তাঁহাকে কখনই উচ্ছৃঙ্খল বা চঞ্চল হইতে অনুমোদন করে নাই। তিনি সদাই মহা-মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। পুস্তক পাঠ—বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন তাঁহার পক্ষে যোগ-সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই তিনি নিজে যেমন গোলমাল ভালবাসিতেন না—অপর ছাত্রকেও গোল করিতে দেখিলে তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহাতে ব্যাকুল বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাই শৈশবে পাঠশালা হইতে আসিয়া অকপটে পিতাকে কহিয়াছিলেন—পাঠশালা একটা যাত্রার আখড়া।

শিক্ষা অবস্থায়—অধ্যয়ন কালের যে সৎগুণ—তাহা আশুতোষের পৈতৃক বলিয়াই মনে হয়। আশুতোষ একান্তচিত্তে, একাগ্রপ্রাণে শৈশব-কাল হইতেই পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন। পিতৃদিক, মাতৃদিক, উভয়দিক হইতেই আশুতোষ পাঠের প্রতি আগ্রহ অনুরাগের প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আশুতোষের মাতৃকুল অতি বিশুদ্ধ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার মাতুল ছিলেন পরম পণ্ডিত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি নিজে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল।

তজ্জন্য তিনি কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যাপনা কার্য্যে কৃতীত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতৃবংশের বিদ্যানুরাগ, শিক্ষায় সাফল্য আশুতোষে পূর্ণরূপে সংক্রামিত হইয়াছিল। পিতৃকুলও তাহাঁর বিদ্যানুরাগী-বংশ বলিয়া বঙ্গে বিখ্যাত।

আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ যখন অধ্যয়নের জন্য প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন, তখন এখানে কার স্বাস্থ্যের অবস্থা, অধিবাসের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। অত্যন্ত লবণাক্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পাড়াগাঁএর লোক তখন এখানে থাকিতে সাহস করিত না—এমন কি আসিতেও ভয় পাইত। চারিদিকে পচা নর্দ্দমার পূতিগন্ধ, ময়লা-আবর্জ্জনা-পূর্ণ গলি রাস্তা দেখিয়া নবাগত পল্লীবাসী স্বতঃই শিহরিয়া উঠিত। যে সব বড় বড় রাস্তা এখন বিশাল বাহু ধারণ করিয়া নগরীর বক্ষে তড়িতের আলোক-মালায় সুসজ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, তখন তাহাদের স্থলে পচা নরদমা দুই পার্শ্বে ধারণ করিয়া গলি ঘুচিময় সঙ্কীর্ণ পথ পথিকের প্রাণে ভীষণ বিভীষিকার উদ্রেক করিত। এখন যেমন দ্বিপ্রহর রজনীতে ছোট ছেলে হাঁসিতে হাঁসিতে আলোক-শুভ্র-রাজপথে যাতায়াত করিতে পারে, তখন সন্ধ্যা হইলে কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইতে পাড়াগেঁয়ে লোক ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িত। সন্ধ্যার পর সকল রাস্তার ধারেই ফেরুপাল দল জুটিয়া চীৎকারে আকাশ মাটী কাঁপাইয়া তুলিত। যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এখন শোভাসম্পদের আধার, সৌন্দর্য্য-সম্ভারের

আগার হইয়া উচ্চ গগণ তল চুম্বন করিতেছে, তখন তাহাদের স্থানে ছিল কতকগুলা জীর্ণ শীর্ণ ইষ্টকের স্তুপ মাত্র। যদিও, ইষ্টবেঙ্গলকোম্পানির ও নীলকুঠিয়ালদিগের কারবার কারখানায় ও বৈদেশিক সওদাগরদিগের কারবারে এই নগরী স্থানে স্থানে দিবাভাগে গুলজার ছিল, কিন্তু রাত্রি কালে ইহার বিষন্ন মলিন অবস্থা দেখিলে, এখন আর তাহাকে এই প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাব-শালী নগরীর অস্ফুট অবস্থা বলিয়া আদৌ কল্পনায় ধারণাও করা যায় না। তখনকার দুই একটি প্রাচীন লোক কিছু পুর্ব্বপর্য্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল দেহ লইয়া জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সাহেব কোম্পানির শাসনাধীন হইলেও, কলিকাতার অনেক স্থান যে চোর ডাকাতের অড্ডা-বিশিষ্ট জঙ্গল বা ভগ্ন বাড়ীতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। তখন যে সকল লোক পল্লীগ্রাম হইতে কোন কার্য্য-উপলক্ষে কলিকাতায় আসিতেন, তাঁহারা সুস্থ দেহ সবল প্রাণ লইয়া নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করিলে, তাহার আত্মীয় স্বজন দল ও গ্রামবাসীগণ পরম আনন্দ অনুভব করিত। কলিকাতা ফিরিয়া ঘরে আসা—আর মরা মানুষ ফিরিয়া আসা প্রায় তখন একই কথা ছিল।

ইষ্ট বেঙ্গল বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল লাইন হইবার পুর্ব্বে প্রায়ই অনেকে জলপথে বড় বড় নৌকা-যোগে কলিকাতায় গমনাগমন করিত। গঙ্গায় জলপথে বিষম বোম্বেটে জল-দস্যুর ভয় ছিল। প্রাণ হাতে করিয়া লোক যমপুরী কলিকাতায় আসিবার জন্য

নৌকায় আরোহন করিত। ইষ্টদেবতার নাম শেষ-জপ করিতে করিতে যাত্রা করিত। অনেক লোক কলিকাতায় আসিয়া লোনা জলের প্রকোপে—লোনার জন্য উদরের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িত। কেবল উদরের পীড়া নয়, অন্যরূপ আরও অনেক পীড়ায় তখন কলিকাতায় আসিয়া লোকে বিশেষ রোগ ভোগ করিত।

আশুতোষের পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতার এইরূপ অবস্থায় এখানে আসিলেন। কেবল এক শিক্ষায় অনুরাগ তাঁহাকে এই শিক্ষাকেন্দ্রে আনয়ন করিল। ভাল করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিবেন বলিয়াই সকল বিপদ সঙ্কট উপেক্ষা করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

ভদ্রলোকদিগের অবস্থান পক্ষে তখন কলিকাতা আরও এক সঙ্কট-সঙ্কুল স্থান ছিল। তখন এখানে পাচক ব্রাহ্মণ বড় মিলিত না। অনেককেই নিজে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতে হইত। সেইরূপে আহার সমাধা করিয়া বিদ্যালয়ে বা কার্য্যস্থানে যাইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই রন্ধন-সঙ্কটের হাত এড়াইতে পারেন নাই। তিনিও নিজ হস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন; তৎপরে অধ্যয়নের জন্য বিদ্যালয়ে গমন করিতেন।

যাঁহারা অদম্য অধ্যয়নশীল, মহাকর্ম্মী পুরুষ, তাঁহাদের সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্ন কোন সঙ্কটই তিষ্ঠিতে পারে না।

বিদ্যানুরাগী ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় অধ্যয়নে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। মেডিক্যাল কলেজ তখনও হিন্দুর পক্ষে এক বিষম স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। নিতান্ত বিজ্ঞান-অনুরাগী ছাত্র ভিন্ন কেহই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মেডিক্যাল লাইনে যাইত না। গঙ্গাপ্রসাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা—বিজ্ঞান-পীপাসা, তাঁহাকে কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। স্বীয় প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফলে, চিকিৎসা-বিভাগে তখনকার কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইলেন। কলিকাতার অস্বাস্থ্য বা তদানীন্তন অবস্থা কিছুতেই তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ের গতি রোধ করিতে পারে নাই। তিনি তখনকার এম বি পরীক্ষায় উত্তমরূপেই উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। তখনকার এম বি পরীক্ষা মেডিক্যাল লাইনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা বলিয়া গণ্য ছিল। যাহারা বিশেষ কৃতীত্ব দেখাইতে পারিত তাহারাই এম ডি হইত। এল এম এস উপাধি তখনকার মেডিক্যাল লাইনের প্রায় সকল ছাত্রের চরম আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। যাহারা খুব ভাল ছেলে তাহারাই এম বি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইতে পারিত।

গঙ্গাপ্রসাদ,—মেডিক্যাল লাইনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইলেন বটে, কিন্তু কি করিবেন তাহাই এখন সমস্যার কথা হইল। চাকুরি—পরাধীনতা তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতির পক্ষে নিতান্তই বিকট বিরুদ্ধ ব্যাপার। পুত্র আশুতোষ যেমন স্বাধীন-চেতা ছিলেন, উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত পিতা গঙ্গাপ্রসাদও তেমনি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। পরাধীনতা—পরের অধীনে গোলামগিরি করিতে তাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব কখনই অনুমোদন করিল না। যে ভরদ্বাজ-বংশে তাঁহার জন্ম, সে বংশ চিরদিনই তেজস্বী বলিয়া বঙ্গে বরেণ্য ও বিখ্যাত। আদিশূর কন্যাকুব্জ হইতে যজ্ঞবিধি-সুসংস্কারের জন্য যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গে আনয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীহর্ষ একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই শ্রীহর্ষ সুবিখ্যাত কাব্য নৈষধ-চরিত প্রণেতা কি না তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ও মতভেদ আছে।

সে যাহাই হউক শ্রীহর্ষ যে একজন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহের অবসর নাই। বঙ্গের মুখোপাধ্যায়-বংশ এই পণ্ডিত প্রবর ব্রাহ্মণকুলতিলক শ্রীহর্ষ হইতেই সমুদ্ভুত।

বঙ্গের মুখোপাধ্যায়-বংশ অতি তেজস্বী বংশ। ধনে মানেও এই বংশ বঙ্গের বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বংশ। এই বংশের শ্রেষ্ঠকুলে গঙ্গাপ্রসাদ জন্ম গ্রহণ করেন। বংশানুযায়ী কুলোচিত তেজস্বিতা নিশ্চয়ই তাঁহার স্বভাব-সঙ্গত ধর্ম্ম।

গঙ্গাপ্রসাদ তখন চাকুরী করিলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে অথবা কোন বড় রাজসরকারে অতি শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে পারিতেন।

তখন ম্যাডিকাল লাইন, অন্য সকল বিভাগের ন্যায় ভরপুর ছিল না। তখন উমেদারীর এতো প্রাদুর্ভাব হয় নাই। উমেদারেরও এমন ছড়াছড়ি ঘটে নাই। তখন যে, যে বিভাগে কিছুমাত্র কৃতীত্ব লাভ করিতে বা কৃতকার্য্য হইতে পারিত, তাহার চাকুরির জন্য বড় ভাবিতে হইত না—বিশেষ বেগও পাইতে হইত না।

গঙ্গাপ্রসাদ ইচ্ছা করিলে তখন চিকিৎসা-বিভাগে খুব বড় কাজই করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার তেজস্বী-প্রকৃতি স্বাধীন-হৃদয় চাকুরী লইয়া পরের দাসত্ব করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিল না। বিশেষতঃ কর্ত্তাদের অধীনে চাকুরী করিতে হইলে, অনেক সময় যে স্বহস্তে বিবেক বুদ্ধিকে বলিদান দিতে হয়, তাহা তিনি আত্মীয় স্বজনগণের চাকুরীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় ভালই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সে চেষ্টায় বিরত হইলেন। চাকুরীর দিকে আর আদৌ দৃষ্টিপাত করিলেন না।

এখন কোথায় বসিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইবেন, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ভবানী-পুরে ব্যবসা করাই স্থির করিলেন। এখানে ডিসপেনসারি খুলিয়া বসিলেন। এখানে তাঁহার অসাধারণ কৃতকার্য্যতা কৃতীত্বের কথা কে না জানে? গঙ্গাপ্রসাদ নিজ গুণে অল্পদিনেই বিশেষ পসার প্রতিপত্তি-বিশিষ্ট ডাক্তার বলিয়া ভবানীপুর অঞ্চলে পরিচিত প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার গঙ্গা-প্রসাদকে না জানে কে? কি ভবানীপুর—কি কলিকাতা—কি

সমগ্র বাঙ্গলায় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ সর্ব্বত্রই সর্ব্বজন বিদিত। ডাক্তারী শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-প্রণেতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের নাম যশ বঙ্গের সুদূর পল্লীতেও প্রচারিত।

গঙ্গাপ্রসাদ সুপণ্ডিত সুকবি ছিলেন। তাঁহার বিরচিত রামায়ণে তাঁহার কবিত্বের ও তাঁহার প্রণীত ডাক্তারী গ্রন্থে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিছত্রেই পাওয়া যায়। যদিও গঙ্গাপ্রসাদের 'রামায়ণ' আজিও সাধারণে প্রচারিত হয় নাই, তথাপি যাঁহারা তাহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন।

আশুতোষ, কি মাতৃকুল কি পিতৃকুল উভয় কুলের উভয় দিক হইতেই, বংশগত বাহুশক্তি ও বিদ্যানুরাগ লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। বংশগত-বিধান (Law of heridity) এ পক্ষে আশুতোষের বিশেষ অনুকুল ছিল।

গঙ্গাপ্রসাদ ছাত্রাবস্থায় সপরিবারে বৌবাজারের মলঙ্গা লেনে বাস করিতেন। তিনি যখন মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষের জন্ম হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন ভোরের সময় মহাপুরুষ আশুতোষ বঙ্গদেশ বাঙ্গালী-সমাজকে ধন্য করিয়া ভূমিষ্ট হন।

অতি শৈশবে আশুতোষ রোগ ভোগ করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে অধ্যয়ন অবস্থায়ও তিনি রোগের হাত এড়াইতে পারেন নাই। যখন অতি শিশু অবস্থায় আশুতোষ রুগ্ন ও দুর্ব্বল দেহ লইয়া যন্ত্রণায় অধীর হইতেন, তখন স্নেহময়ী জননীর

শুশ্রূষায় তিনি শান্তিলাভ করিতেন। জননীর স্নেহ যত্নেই আশুতোষ শিশু অবস্থায় রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

আশুতোষের শিশু জীবনে একটি অতি বিপদজনক ঘটনার কথা কথিত হইয়াছে। তিনি শিশুকালে পিতার ডাক্তারী কার্য্যের অভিনয় করিতে ভাল বাসিতেন। পিতার ব্যবসায়ের জন্য নানাবর্ণের ঔষধি নানারূপ শিশি বোতলে ভরিয়া খেলিতেন। আশুতোষ একদিন বাসার নিকটস্থ পুকুরের এক বাঁধা ঘাটে বসিয়া অনুকরণ ছলে নানা শিশিতে পুকুরের জল ভরিতেছিলেন ; হঠাৎ অসাবধানতাবশতঃ পুকুরের জলে পড়িয়া গেলেন। অদূরে ভৃত্য ছিল। সে তাহা দেখিতে পায় ও দৌড়াইয়া আসিয়া আশুতোষকে জল হইতে উঠাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করে। সৌভাগ্য বশতঃ ভৃত্য নিকটে উপস্থিত ছিল। নতুবা কি সর্ব্বনাশই ঘটিত। কিন্তু আশুতোষের ন্যায় মহাপুরুষের জীবন এমন সময়—এমন অবস্থায় বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহা হইলে ভগবানের এক মহৎ বিধান যে ব্যর্থ হইয়া যায় !

আশুতোষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতার উন্নতিও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতি অল্পদিনেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। চিকিৎসাকার্য্যে তাঁহার নামযশ কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চল—এমন কি কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রভাম্বিত হইয়া উঠিল। অতি কঠিন কঠিন দুরারোগ্য রোগ সকল তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসার গুণে

আশু আরোগ্য হইতে লাগিল। যশের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের প্রচুর অর্থ সমাগম হইতে লাগিল। যেমন নাম—তেমনি অর্থ উভয় দিকেই গঙ্গাপ্রসাদ সত্বরই বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভে সমর্থ হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার যেমন নাম যশ বর্দ্ধিত হইল, তেমনি অর্থ আয়ও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। সেই আয়ের অর্থ হইতে তিনি রসারোডস্থিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণে সমর্থ হইলেন। আশুতোষ কৃতী হইয়া এই বৃহৎ ভবনের আরও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আশুতোষ ভোরের সময় শয্যা হইতে উঠিতেন। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থান তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস ছিল। বিশেষ কোন কারণ বা বাধা ভিন্ন, তিনি নিদ্রা হইতে উঠিতে কখন বেলা করিতেন না। তম-গুণ বা তম-ভাব কখনই তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা এ সকল তমোগুণের বিশেষ লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ আশুতোষে কেহ কখন প্রকটিত হইতে দেখে নাই। যখন তিনি কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মী ছিলেন তখনও কেহ দেখে নাই, আবার যখন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখনও কেহ দেখিতে পায় নাই। কর্ম্ম অর্থে এখানে তাঁহার জজীয়তী বা ওকালতি কর্ম্মকেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। নতুবা মহাকর্ম্মী—কর্ম্মযোগী আশুতোষকে কর্ম্মহীন কে বলিতে পারে—কেই বা তাঁহার কর্ম্মহীন অবস্থা কখন দেখিতে পাইয়াছে?

অনেক লোক আছে কেবল কর্ম্মের জন্য, পরিশ্রম অধ্যবসায়ের জন্য বড় হইয়া থাকে। আশুতোষ অসাধারণ কর্ম্ম-শক্তির সহিত অমানুষিক প্রতিভার সম্মিলন সহযোগ বশতই এতো বড় হইয়াছিলেন।

কর্ম্ম-শক্তি প্রবল পুরুষকার সাপেক্ষ—আর প্রতিভা অদৃষ্ট সাপেক্ষ। কর্ম্ম-শক্তি সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া থাকে। প্রতিভা সহজাত-ভাবে সূতিকা গৃহেই প্রকটিত হইয়া থাকে। আশুতোষ যেমন কর্ম্মী, তেমনি ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। অত বড় কর্ম্মী, জ্ঞানী, মান্যবান ধনবান অর্থাৎ 'ধনে মানে কুলে শীলে যিনি তৎকালের বঙ্গ-সমাজের একজন বিশিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তি ছিলেন—সেই পিতার পুত্ররূপে তিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য মহাসৌভাগ্যেরই ফল। আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অত বড় কৃতীত্ব প্রদর্শন, উহা আশুতোষের দৃঢ় পুরুষকারের লক্ষণ। সৌভাগ্য পুরুষকারের এমন সম্মিলন-সুযোগ সংসারে, বিশেষত এখনকার বাঙ্গালী-সমাজে অতি অল্প লোকের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে। কেহ হয়তো ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহার পিতৃমাতৃ কুল মুর্খতার আকর। আবার কেহ হয়তো পণ্ডিতের গৃহে জন্মলাভ করে, কিন্তু তাহার উভয়কুলই দরিদ্রতার নিকেতন। ধন, মান, কুল, শীল, পাণ্ডিত্য পবিত্রতা সর্ব্ব সৌভাগ্য-সম্পদ-সমন্বিত সংসারে জন্মগ্রহণ, আশুতোষের ন্যায় অতি অল্প পুরুষের পক্ষেই এখনকার বাঙ্গালী সমাজে ঘটিয়া থাকে।

আশুতোষ যেমন অসাধারণ প্রতিভাবলে ভাগ্যবান ছিলেন, তেমনি কর্ম্মে দক্ষতায় দৃঢ়তায় তিনি অসাধারণ মহাকর্ম্মীরূপে অসাধারণ আদর্শ-পুরুষ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আশুতোষ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। বাল্যকালে, অধ্যয়ন-অবস্থায় তিনি পিতার সহিত বেড়াইতে যাইতেন। তখন বেড়াইতে বেড়াইতে মহাপণ্ডিত অভিজ্ঞ পিতা তাঁহাকে জগতের কত কথা, কত গূঢ় তত্ত্ব উপদেশ দিতেন।

একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ, পুত্রকে বাজারের কেনা খাবারের অপকারিতা সম্বন্ধে পুত্রকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে পিতা পুত্র উভয়ে এক খাবারওয়ালা দোকানীর দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন খাবার ওয়ালা এক অতি নীচ জঘন্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। সে পূর্ব্ব-দিনের বাসী পচা কচুরী—যাহা পূর্ব্বদিনে বিক্রয় হয় নাই—সেই সকল কচুরিগুলা লইয়া গুড়া করিতেছিল ও গুড়া কচুরি নূতন ময়দার সহিত মিশাইয়া নূতন কচুরি প্রস্তুত করিতেছিল।

পিতা পুত্রকে তাহা দেখাইয়া বাজারের খাবারের অনিষ্ট-কারিতা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া পুত্রকে প্রদর্শন করিলেন। পুত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়া, তখন হইতে বাজারের কেনা খাবার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইলেন। তদবধি তিনি নিজে বিশেষরূপ না জানিয়া শুনিয়া বাজারের খাবার ব্যবহার করিতেন না।

আজি কালি কয় জন পিতা পুত্রকে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাধারণ খাদ্যের অপকারিতা বুঝাইয়া সতর্ক করেন? এখন বাজারের খাদ্যে যে বিষ-দোষ ঘটিয়াছে, তাহা কোন পিতামাতা এখন চখে আঙ্গুল দিয়া পুত্রকে বুঝাইয়া দেন?

ছোট ছেলের হাতে জল খাবারের পয়সা দিয়া এখন অনেক পিতা, ছেলের দায় হইতে উদ্ধার লাভ করেন। এখন বাজারের খাবার সম্বন্ধে যে কতটা সতর্কতা প্রয়োজন, তাহা অনেকেই জানেন ও বুঝেন। জানিয়া বুঝিয়াও অনেকে আলস্য ঔদাস্য বশতঃ জানিতে বুঝিতে চান না।

এখন বাজারে ব্যবসাদারীর যে কি উপদ্রব ঘটিয়াছে তাহা কে না জানে? ভেজাল ঘি, ভেজাল ময়দা—ভেজাল গুড় চিনি—সকল খাদ্যেই ভেজাল। লোকে এখন অর্থের জন্য না করিতে পারে এমন কাজই নাই। পূর্ব্বে অনেকটা ধর্ম্মের ভয়ে—সমাজের ভয়ে—লোকাচারের ভয়ে—সকল ব্যবসায়ে—বিশেষত খাবারের ব্যবসায়ে—ব্যবসাদার বিশেষ সতর্ক ছিল। পাছে খাবারের দোষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে, এই ভয়ে বহু ময়রা খাবার-ওয়ালা অতি সাবধানে খাবার তৈয়ারি করিত—সাবধানে খাবারের উপাদান সংগ্রহ করিত। এখন আর সে দিন নাই। এখন দেশে ভীষণ জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত। তদুপরি দুরাচার-গণের সৌখিনতা ব্যসন বিলাস আছে। সুতরাং পয়সা রোজগার করিতে বহু লোক এখন আর হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করে না। ইহা যুগধর্ম্মের একটা ঘোর বিপত্তি-সঙ্কট।

যত কিছু ভেজাল-প্রতারণা এই জীবন-সঙ্কটের যুগে ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে এই খাবারে ভেজাল-বিভ্রাট অতি বিষম শোচনীয় ব্যাপার। এই বিকট-ব্যাপারের হাত এড়াইবার জন্য সকলেরই বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। পিতার পক্ষে তো নিশ্চয়ই। আদর্শ পিতা গঙ্গাপ্রসাদের অনুকরণ নিতান্তই বিধেয়।

গঙ্গাপ্রসাদের সময় হইতে—বৈদেশিক ম্লেচ্ছ-প্রভাবের কাল হইতেই—দেশের এই ঘোর দুর্দ্দশা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে; হিন্দু আমরা আচার ব্যবহারে আহারে বিহারে কতই পবিত্র সংযত ছিলাম। কিন্তু আমরা এখন আর সে হিন্দু নাই—আমাদের সে হিন্দু আচার ব্যবহারও আর নাই। আমরা এখন আচারে ভ্রষ্ট—ব্যবহারে পতিত। খাদ্যে ভেঁজালে—খাদ্যের অপবিত্রতায় আমাদের আর বড় দৃষ্টি নাই। তাহাতে যে দেশের কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহা বুঝিবার যেন শক্তিও নাই—মতিগতিও নাই।

গঙ্গাপ্রসাদের ন্যায় হিন্দু-ডাক্তার যদি আজি আমাদের সমাজে থাকিতেন, বোধ হয় তাহা হইলে সমাজে এতটা খাদ্য-সঙ্কট ঘটিতে পারিত না।

গঙ্গাপ্রসাদ নিজে একজন বড় ডাক্তার ছিলেন। ভেজাল খাদ্যের—অপকৃষ্ট-ভোজনের অপকারিতা তিনি ভালরূপই জানিতেন বুঝিতেন। তিনি পুত্রকে সতর্ক করিয়াছিলেন। এখন বাজারের খাদ্যে যেরূপ ভেজাল-বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, তাঁহার মত মতিমান তেজস্বী ডাক্তার

আমাদের সমাজে এখন থাকিলে, এ সম্বন্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন উত্থাপন করিয়া এ বিষম বিষময় স্রোতকে নিশ্চয়ই নিবারণ করিতেন। এখন কয়জন ডাক্তার দেশের এ দুরাচার দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকেন? পরের কথা তো বহু দূরের কথা—আপনাদের ঘরের মধ্যে যে ভেজাল খাদ্যের প্রবল দৌরাত্ম্য ঘটিতেছে, বোধ হয় সে দিকেও তাঁহাদের অনেকের দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি দিবার সময়ও নাই। এমনি দেশের দুর্দ্দশা—অধোপতন এখন ঘটিয়াছে!

আশুতোষের দেহও ছিল বিরাট-পুরুষের দেহের ন্যায় অতি বিশাল। তাঁহার আহারও ছিল খুব বেশী। তাই অনেক সময় অনেককে আহারের অল্পতার জন্য আনন্দ-উপহাস করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহার বাড়ীতে যখন ভুরিভোজনের ব্যবস্থা হইত, তখন নিজে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বচক্ষে সকলের ভোজনে তত্ত্বাবধান করিতেন। তখন কাহাকে অল্প আহার করিতে দেখিলে, তিনি তখনই বলিতেন —এ কি খাওয়া? এমন খাইয়া বাঁচিবে কয়দিন?

আশুতোষ নিজে দেহোপযোগী আহার করিতেন। তিনি প্রচুর আহারই করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বেশ খাইতে পারিতেন। তাই বলিয়া আশুতোষ কখনও অসংযত ভাবে অপবিত্র খাদ্য ভোজন করিতেন না।

তিনি সমাজের জন্য—সামাজিকতার খাতিরে পরের বাড়ীতে আহার করিতেন। গরীব আত্মীয় অন্তরঙ্গের ঘরে ভোজন

করিতে তাঁহার কখন কুণ্ঠা ছিল না। কিন্তু অশুচি অপবিত্র ভাব কোথাও মনে জাগিলে, আশুতোষ প্রকৃত হিন্দুর ন্যায়—বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারীর মত—সেখানে ভোজন-ব্যাপার একেবারেই পরিত্যাগ করিতেন। এই জন্য কোন সাহেবী মজলিসে তাঁহাকে কেহ কখন ভোজন করিতে দেখে নাই—শুনেও নাই।

আশুতোষ বাল্যকাল হইতেই ধৈর্য্যবান বীর্য্যবান সংযত পুরুষ ছিলেন। পিতার সেই উপদেশ-বাণী চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে গ্রথিত ছিল। তিনি বিশেষ না জানিয়া—না বুঝিয়া বাজারের খাবার নিজে ব্যবহার করিতেন না—পরকেও ব্যবহার করিতে দিতেন না।

শুনিয়াছি তিনি সন্দেশ খাইতে ভাল বাসিতেন। তাই বলিয়া যে সে ময়রা-দোকানের সন্দেশ তিনি ব্যবহার করিতেন না। বিখ্যাত সন্দেশওয়ালা বৌবাজারের ভীমনাগের দোকানই তাঁহার সন্দেশ যোগাইত। বহুকাল হইতে এই দোকান বিশুদ্ধতা ও প্রস্তুত-প্রকরণের জন্য অতি বিখ্যাত।

আশুতোষের শিক্ষায় অসাধারণ প্রতিভা অতি শৈশবেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যখন চক্রবেড়ে বাঙ্গালা-বিদ্যালয়ে পড়িতেন, তখন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষায় অসাধারণ অনুরাগ ও সামর্থ্য সকলকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিল। তখনই তিনি পাঁচ বৎসরের পাঠ দুই বৎসরের মধ্যে সমাধান করিয়াছিলেন। এখানে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

তৎপরে কি ভাবে তাঁহার শিক্ষার বিধান নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাই চিন্তাশীল পিতার পক্ষে যে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

আশুতোষ বঙ্গ-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। মাতৃ-ভাষায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ এই বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিকশিত হইয়াছিল। এই অনুরাগই পরিশেষে বিশেষরূপে সংপুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় বঙ্গভাষা প্রচলনের পক্ষে এতো উৎসুক ও উৎসাহিত করিয়াছিল। যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন উহা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহা আজিও অনেকের স্মৃতিপথে জাগরুক রহিয়াছে। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

তখনকার ইংরাজী-বিদ্যালয়ের অবস্থা নানা কারণে নিতান্ত হীন হইয়াছিল। বিশেষতঃ নৈতিক-ব্যাপারে বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। একে তো শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ একটা বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য লক্ষীভূত ছিল না। ছাত্রকে যে মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—তাহাকে হৃদয়বান চরিত্রবান বা প্রকৃত জ্ঞানবান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—এ উচ্চ উদ্দেশ্য কর্ত্তৃপক্ষেরও ছিল না—বেতন-ভোগী শিক্ষকগণেরও ছিল না। কতকগুলি কেরাণী তৈয়ার করা—অধিকন্তু কিছু পরিমাণে ডেপুটি মুনসেফ, উকিল ডাক্তার বর্ষে বর্ষে কোন রকমে প্রসব করা উনিভারসিটি প্রভৃতির উদ্দেশ্য হইয়াছিল।

এ দেশীয় শিক্ষা-সমুন্নতির হিতৈষী মেকলে সাহেব এক

সময় বলিয়াছিলেন যে 'উচ্চ শিক্ষার বিধান দ্বারা দেশীয় দিগকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে তাহারা নিজেরাই যেন দেশ-শাসনের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে। শিক্ষায় সেই সিদ্ধি-সুফল ফলাইতে পারিলেই ইংরাজ শাসনের সার্থকতা সাধিত হইবে।

এইরূপ অনেক কথা অনেক বৈদেশিক মহাত্মা শিক্ষা-বৈঠকে বসিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু সে সকল ফাঁকা মুখের কথা ফাঁকা মুখেই শেষ হইয়া গিয়াছে। আসল কাজের কিছুই হয় নাই—কোন ফলই ফলে নাই। ইংরাজী-শিক্ষার ফলে এদেশে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতেছে—কি অপচয় ঘটিতেছে, তাহা এখন বিষম একটা সমস্যার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—চিন্তাশীলের ভাবিবার বুঝিবার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আশুতোষের যখন ইংরাজী অধ্যয়নের সময় উপস্থিত হইল, তখন ইংরাজী-বিদ্যালয়ে জাতি শ্রেণী বা ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকল পাঠার্থীকেই গ্রহণ করা হইত। তাহাতে অতি নীচ বংশের কলঙ্ক-কদাচার-সঙ্কুল কুলের ছেলেরাও অনেক সময় বিনা বিচারে বিনা বিবেচনায় স্কুলে কলেজে পড়িতে পাইত। বারবণিতার পুত্র বারাঙ্গনার গৃহে পালিত গঠিত হইয়া; সৎকুল সম্ভ্রান্ত বংশের বালকের সহিত সম-শ্রেণীতে বসিয়া অধ্যয়ন করিত। তাহাতে বিষময় ফল যে কতই বিকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সমাজতত্ত্বে সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন।

ইহা বুঝিয়া—এইরূপ বিধানের বিষময় ফল জানিয়া শুনিয়াই—বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে যে সে জাতির যে সে ছেলে ভর্ত্তি করিবার অনুমতি দিতেন না। ছেলের জাতি বা চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ থাকিলে, সে ছেলেকে স্কুল ক্লাসে বা কলেজ ক্লাসে স্থান দিতেন না।

সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞপ্রবর গঙ্গাপ্রসাদ, অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্রের অধ্যয়ন-পন্থা কিরূপে নির্দ্ধারণ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বঙ্গ-বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে,

গঙ্গাপ্রসাদ কিছুকাল পুত্রকে গৃহেই অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন।

ভাল ভাল উপযুক্ত শিক্ষক সুন্দররূপে নির্ব্বাচন করিয়া তিনি পুত্রের গৃহে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন। তখনকার শিক্ষা-বিষয়ে যে সকল শিক্ষক বিশেষ দক্ষ নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহাদিগকেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লণ্ডন মিশনারী কলেজের বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক গঙ্গাধর বাবু ও অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষক মধুসূদন বাবু আশুতোষের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। এমন যশস্বী কৃতী অধ্যাপক নিযুক্ত করা যে বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। গঙ্গাপ্রসাদ সে ব্যয় বাহুল্যের জন্য কিছু মাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। পুত্রের শিক্ষা-বিধানের জন্য অকাতরের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল গৃহে অধ্যয়ন করাইয়া, আশুতোষকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করাই স্থির হইল। কেবল উচ্চশিক্ষার জন্য আশুতোষকে তৎকালে কোন বিদ্যালয়ে যাইবার আদৌ প্রয়োজন হইত না। কারণ গৃহে, অসাধারণ অধ্যাপকগণ যেমন তাঁহার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, পিতা গঙ্গাপ্রসাদও স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার তত্ত্বাবধানে বিশেষ যত্নবান ও আগ্রহান্বিত ছিলেন। পুত্রকে শিক্ষাদান যেমন তাঁহার জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার চরিত্র-গঠনের প্রতিও তাঁহার তেমনি একটা প্রাণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাই আশুতোষকে ইংরাজী

বিদ্যালয়ে পাঠাইতে তিনি বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়াছিলেন।

তখন ভবানীপুরে সাউথ সুবারবণ স্কুল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তখনকার বাঙ্গালী সমাজের দুই জন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। পণ্ডিত-প্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী ও আশুতোষ বিশ্বাস এই দুই জন তখন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালীর মধ্যে একজন অতি প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। শুধু পাণ্ডিত্যে নয়, অনেক বিষয়েই তিনি অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-জ্ঞানে, বক্তৃতায়, সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম্ম-প্রচারে শিবনাথ বাঙ্গলা-দেশে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আশুতোষ বিশ্বাসও ব্যবহার-বিষয়ে বিশেষ কৃতীত্ব লাভ করিয়া আলিপুরে প্রধান উকিল হইয়াছিলেন। দুইজনই তখনকার শিক্ষিত-সমাজে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। দুইজনই আশুতোষের বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন।

শিবনাথ কেবল বাঙ্গালী-সমাজের নহে—তখনকার সকল সভ্য শিক্ষিত সমাজের পক্ষেই একজন অতি প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বক্তৃতায় বলিয়াছেন ও বহু সারগর্ভ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা একেশ্বর বাদ (Theology) সম্বন্ধে গভীর গবেষণা ও গুঢ়তত্ত্বে পরিপূর্ণ। যাঁহারা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন বা

যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্ম-বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া, একেশ্বর-বাদ সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে প্রতীচ্য সভ্য জগৎ বিশেষরূপে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি জীবনকালে এ দেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মেরুদণ্ড ছিলেন।

এ হেন শিবনাথের শিষ্যত্ব-সংস্পর্শে আসিয়া, শিক্ষকের প্রভাব নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিষ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; এবং সে বিশ্বাসের মূলে যে কিছুমাত্র সভ্য সারত্ব নাই এ কথাও নিঃসন্দেহে কে বলিতে পারে?

বালক-হৃদয় নবনীর ন্যায় সুকোমল। তাহাকে অনেক সময় অনেক ছাঁচেই ঢালাই করা যায়। বিশেষতঃ আশুতোষের ন্যায় কোমলে কঠোরে সংমিশ্রিত প্রাণ যে একটা মহৎ পবিত্র প্রাণের সংশ্রবে সংস্পর্শে আসিয়া, তাহা হইতে কিছুই সার সুন্দর সামগ্রী সংগ্রহ করিবে না, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। আশুতোষ যে কোন কোন স্থলে ঠিক অন্ধ গোঁড়া হিন্দুর ভ্রান্ত-পন্থা অনুসরণ করিতে পারেন নাই, অনেকে অনুমান করেন, বাল্যকালে শিবনাথের সংশ্রব সাহচর্য্য তাহার অন্যতম একটা কারণ।

আশুতোষ শ্রেষ্ঠপুরুষ—মহাপুরুষ। মহাপুরুষের সবই নিজস্ব। মস্তিষ্কের প্রাতভা হৃদয়ের ঔদার্য্য মহত্ত্ব সবই তাঁহার নিজের। পরের ভাবে—পরের পথে—পরের পদাঙ্কানুসরণে মহাপুরুষেরা

প্রায়ই পরিচালিত হন না। নিজের ভাব, নিজের ভাবনা জগতে ছড়াইয়া—নিজের কাজ—নিজের কথা সংসারে বিলাইয়া, মানব-সমাজকে নিম্নস্তর হইতে তাঁহারা উর্দ্ধস্তরে উত্তোলন করেন। পরের পুরাতন কথা—পুরাতন ভাব ভাবনা লইয়া তাঁহারা নাড়াচাড়া করেন না। তাঁহারা নিজের ভাবেই বিভোর থাকেন—নিজের ভাবেই জগৎকে বিভোর করিয়া রাখেন। সজীব সেই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের প্রাণের জলন্ত স্ফুলিঙ্গ লাভ করিয়া মৃত মানব-সমাজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মহাপুরুষ আশুতোষ বাঙ্গালার মৃত সমাজকে জ্ঞানালোকে—শিক্ষালোকে আলোকিত করিতে আসিয়াছিলেন। পরের নিকট হইতে আলোকের জন্য তাঁহার কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন ছিল না সত্য। কিন্তু স্বভাবের শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-শক্তি। স্বভাবের বিধানবলকে কে অতিক্রম করিতে পারে? সাহচর্য্য-সান্নিধ্য আদান প্রদানের পক্ষে এক অতি প্রবল উপাদান (medium)। এই উপায়ের হাত কেহই এড়াইতে পারে না। মনে হয় মহাপুরুষের পক্ষে উহার প্রয়োজনীতা আরও গুরুতর—আরও অধিক। জগতের সকল মহান চরিত্রের সাময়িক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

অসাধারণ পণ্ডিত শিবনাথের কোনই ভাব প্রভাব যে কিছু-মাত্র আশুতোষে সংক্রামিত হয় নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? শিষ্য জ্ঞাতসারে কিছু গ্রহণ করুন বা নাই করুন—জ্ঞাতসারে কিছু লইবার প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক, অন্ততঃ অজ্ঞাতসারে

প্রবল প্রভাবান্বিত শিবনাথের চিন্তা ভাব অনুভূতি যে প্রাণের তুল্য প্রিয়তম ছাত্র আশুতোষে সংক্রামিত হইতে পারে, ইহা নিতান্ত অসার অসম্ভব কাল্পনিক কথা নহে। ইহা জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) একটা নিতান্ত অলঙ্ঘনীয় বিধান।

মানুষ কেন বড় হয়—কেনই বা ছোট হয়—ইহা বড় রহস্যের প্রশ্ন। একই পিতামাতার ঘরে—একই সংসারে—কোন ভাই বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা প্রত্যয়ে খুব বড় হয়—আর এক ভাই সকল গুণে সকল শক্তিতে খুব ছোট হইয়া পড়ে কেন? পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলে ভাগ্য অনুসারে ঘটে—কি গ্রহ নক্ষত্র রাশি আদির শক্তি সংক্রমণের ফল অনুসারে ঘটে—কেন—কি কারণে এমন বিপর্য্যয় পার্থক্য সংঘটিত হয়, সামান্য সঙ্কীর্ণ মানব বুদ্ধি কি তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে?

আধুনিক জীবন-তত্ত্ব (Biology) মনুষ্যের মনুষ্যত্ব-উন্মেষণ অভিব্যক্তি কেবল জড়-বিজ্ঞানের দিক দিয়া সমাধান করিতে চায়। কিন্তু উহা যে নিতান্তই অসম্ভব প্রহেলিকার ব্যাপার তাহা এখন বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বেশ বুঝিয়াছেন।

মহাপুরুষদিগের দুর্ব্বোধ্য জটিল-ভাব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে বেশ বুঝা যায় যে কেবল জড়ের দিক দিয়া মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি-তত্ত্ব বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। মহাপুরুষ আশুতোষ-চরিত্রের ভাব ভঙ্গি সত্যই অতি জটিল—নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য।

সে যাহাই হউক ছাত্রজীবনে, শিবনাথের সাহচর্য্য-সম্মিলন

যে তাঁহার জীবনে একটা অতি সূক্ষ্ম রেখারও ছায়াপাত করে নাই এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। তাঁহার প্রিয়তমা বালবিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা তো অনেকে ব্রাহ্ম শিবনাথের সঙ্গ ফল বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আর সে কথার ভিত্তিতে আদৌ কিছুমাত্র সত্য নাই—সে কখনও আমরা বলি না—বোধ হয় কেহই বলিতে পারে না।

শিবনাথের নিকট ছাত্রভাবে—শিষ্যভাবে আশুতোষের গমন—তাঁহার সহিত আশুতোষের সাহচর্য্য-সম্মিলন হিন্দুর সুখের বা সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল কি না, তাহা সমাজতত্ত্বের একটা সমস্যার কথা বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব বা সামাজিক-তত্ত্ব যাঁহারা অনুশীলন আলোচনা করেন, তাঁহারা এ সময়ে তাহা সত্যরূপে বিশদভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না—কিছুদিন পরেও ঠিক যথাযথ রূপে পারিবেন কি না তাহাও বিশেষ সন্দেহের বিষয়। এ দেশে শিক্ষার ইতিহাসে—সমাজের ইতিহাসে আশুতোষের স্থান কোথায়—কত উচ্চে, তাহা দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের বিশেষ ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় নিশ্চয়ই। সে সম্বন্ধে আমাদের এখন নীরব থাকাই বিধেয় বলিয়া মনে হয়।

আশুতোষ, শিক্ষাব্যাপারে অল্পবয়সে শিবনাথের সান্নিধ্যে আসিলেন। অসাধারণ প্রতিভাবান আশুতোষকে শিক্ষাদান করিতে পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ আনন্দ পাইতেন, বোধহয় সে সুখের তুলনা বুঝি স্বর্গেও নাই। যিনি

যথার্থ ভাবুক পণ্ডিত, জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী কেবল সেই মহাজনই সে গূঢ় তত্ত্বের আনন্দ-উচ্ছাস হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন।

এই কথাটা কাব্য-কলার যেন একটি অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ বিশেষ। ভাল গায়ক ও বাদক যখন এক মজলিসে সঙ্গীতে নিজেরা তন্ময় হইয়া উঠে, পরকেও সেই সঙ্গীতের তান লয়ে বিভোর করিয়া তুলে, কেবল তখনই সে স্বর্গসুখ ধরায় যেন মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকটিত হয়। আবার যখন সাধুজন সজ্জনগণ সম্মিলিত হইয়া, এক সঙ্গে ভগবৎ-তত্ত্ব অনুশীলন করেন, অধ্যাত্ম তত্ত্ব আলোচনা করেন তখন যেন গোলকের পরমানন্দ-প্রবাহ পৃথিবীতে প্রবাহিত হইয়া, সংসারের পাপ তাপ বিধৌত করিয়া ফেলে। পণ্ডিত জ্ঞানবান পবিত্র-চরিত্রবান শিক্ষকও প্রতিভা-শালী সুশীল ছাত্রের সম্মিলন-সহযোগ তেমনই আনন্দপ্রদ উচ্চ ব্যাপারে পরিণত হইয়া থাকে। মহাজ্ঞানী সাধু সুপণ্ডিত শিবনাথের সহিত প্রতিভাশালী মহামেধাবী ছাত্র আশুতোষের সহযোগ-সম্মিলন যে তেমনি পরম সুখাবহ হইয়াছিল, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই।

উভয়ই অতি উচ্চ পন্থাবলম্বী। উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান, চিন্তা-রাজ্যে বিচার, আলোচনার ক্ষেত্রে উভয়ের একত্র বিচরণ পরম আনন্দপ্রদ—হইয়াছিল। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কেবল যে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় লইয়া আলোচনা হইত এমন নহে; তদ্ব্যতীত বহু সৎ ও উচ্চ প্রসঙ্গের উত্থাপন আলোচনাও হইত। ঈশ্বর-তত্ত্ব,

সমাজ-তত্ত্ব, রাজনীতি-তত্ত্ব প্রভৃতি বহু উচ্চ তত্ত্বের প্রসঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন।

গৃহে শিক্ষার জন্য আশুতোষ যেমন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বিদ্যালয়ের পাঠের জন্য অতি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পাইয়াছিলেন। তদুপরি সৎ সমুন্নত শিক্ষার ব্যবস্থাপক মহৎ পিতাও লাভ করিয়াছিলেন। এ সকল অপূর্ব্ব বিধান যেন বিধাতা কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যে আশুতোষ ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিবেন, তাঁহার নিজের শিক্ষার ভার যেন ভগবান নিজে পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আশুতোষের বিদ্যানুরাগ যে এই সকল শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সংসর্গে বাড়িয়াছিল, তাহা নহে। আশুতোষ যে স্বভাবতই বিদ্যানুরাগী শিশুকাল হইতেই তিনি বিদ্যার জন্য—জ্ঞানের জন্য আত্মহারা হইতেন। অধ্যয়নের সময় তিনি এমনই তন্ময় হইতেন যে তখন আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন; সময়-স্রোত যে কোথা হইতে কোন দিকে যাইতেছে, যেন তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেন না।

কেবল পাঠের সময়, অধ্যয়নের জন্য, জ্ঞান-পরায়ণ-যোগী আশুতোষ নিয়ম বিধানও কখন কখন লঙ্ঘন করিতেন। নিয়ম সংযম মিতাচার তাঁহার জীবনের সকল অনুষ্ঠানেই পরিলক্ষিত হইত। কেবল অধ্যয়ন কালেই আশুতোষ নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনকে কখন কখন সজোরে ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন।

পাঠের জন্য তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতেন। শুনা যায় তিনি পিতার কথা মতে ভোরের সময় নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। জ্ঞানী ডাক্তার পিতা প্রাতঃরুত্থানের সুফলপ্রদ কথা—স্বাস্থ্য-সম্পদের উপদেশ অবশ্যই পুত্রের প্রাণে সংগ্রথিত করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানের বিধান হিন্দুর দেশে হিন্দুর সমাজে কিছু নূতন বিধান নয়। এই উৎকৃষ্ট বিধানের উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত ও বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য-উদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার জন্য যে শাস্ত্র-বিধান নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা আনুষ্ঠানিক হিন্দু বহুকাল হইতে মানিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে যেমন হিন্দু-শাস্ত্রের সকল উৎকৃষ্ট বিধান হিন্দু-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, তেমনি এই মহৎ উপকারী নিয়মও উঠিয়া যাইতেছে। প্রাতরুত্থান যে শাস্ত্রীয় একটি পবিত্র বিধান, তাহা আর কেহই মানিতে চায় না। জাতীয়-অধোপতন অবনতি ঘটিলে যেমন হয়,—সকল বিষয়ে সকল কার্য্যে দুর্ব্বলতা অক্ষমতা ঘটে, কোন সৎ বিষয়ের অনুষ্ঠানে আর সামর্থ্য থাকে না, এই প্রাতরুত্থান ব্যাপারেও তেমনি বিশেষ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বে প্রায় সকল হিন্দুই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, হিন্দুর অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপ ধর্ম্মকর্ম্মাদি সমাধান করিত, এখন আর কে তেমন আনুষ্ঠানিক হিন্দু আছে—আর কে বা তেমন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের ধর্ম্ম-সম্মত ক্রিয়া কলাপাদির অনুষ্ঠান করে? তাই

এখন হিন্দুর শারীরিক-ব্যাপারে স্বাস্থ্য-বিষয়ে এখন অবনতি ঘটিয়াছে। প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের যে কি শুভ ফল, তাহাতে শারিরীক স্বাস্থ্যের মানসিক পবিত্রতার যে কতদূর উন্নতি ঘটে, তাহা আর অধোপতিত আমরা বুঝিতে পারি না। এখন বেলা আট নয়টার সময় শয্যা হইতে অতি কষ্টে উঠিয়া বসি, সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় বসিয়াই এক পেয়ালা চা পান করিয়া অর্থোপার্জ্জনে অথবা বিষয়-কর্ম্মে—অথবা ভোগ-সাধনে ব্যাপৃত হই। তাহার ফলে শরীরের স্বাস্থ্য সমন্ধে—মানসিক পবিত্রতা শান্তি সম্বন্ধেও তেমনি অধোনতিলাভ করিতেছি। এই তো দেশের দশা—হিন্দু সমাজের অবস্থা। বাস্তবিক পশুর ন্যায় যাহারা কেবল ইতর আহারে বিহারে তুচ্ছ নিকৃষ্ট ভোগে নিরত থাকিতে পারে—তাহাকেই জীবনের মহা সৌভাগ্য সম্পদ বলিয়া হাঁসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারে—সেই সকল কীট আমাদের জীবনে আর উচ্চ বা পবিত্র কর্ম্ম কি থাকিতে পারে?

আমরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের সকল মহৎ ও শুভ-অনুষ্ঠান বিধান জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়াছি—একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। অন্ধ দাসের ন্যায় প্রতীচ্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়া সকল শুভ-ভাব সকল মঙ্গল-বিধান—সৎশাস্ত্রের সকল শ্রেষ্ঠ আচার ব্যবহার কর্ম্মনাশার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি। বাস্তবিক কবি যে বলিয়াছেন:—

"ক্ষীণ প্রাণ ক্ষীণ মন ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী।"

কেবল তাহাই—সেই দুর্দ্দশাই এখন আমাদের ঘটিয়াছে।

আহারে বিহারে—শয়নে জাগরণে কিছুতেই আর আমাদের সে সংযম নাই—আর সে সামর্থ্য-তেজস্বিতা কিছুতেই নাই। সবই যেন তমোভাবাচ্ছন্ন—অলস অবসাদ-গ্রস্ত! সকলই যেন জীবনহীন মৃতকল্প!

প্রাতরুত্থান বাস্তবিকই সাত্ত্বিক-জীবনের এক অতি পবিত্র মঙ্গলময় বিধান। যে জীবনে অর্থ-সম্পদে বা ধর্ম্ম-সম্পদে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে এই প্রকৃষ্ট বিধানকে মানিয়া চলে।

আশুতোষ বাল্যকাল হইতেই এই পবিত্র বিধানের বিশেষ বশবর্ত্তী ছিলেন। তিনি কখনই আলস্যের বশীভূত হইয়া, তন্দ্রাতুরের ন্যায় শয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিতেন না। দিবা-নিদ্রা আলস্যের একটা অতি বিকট লক্ষণ। বিশেষ কারণ ব্যতীত আশুতোষকে কেহ কখন দিবা ভোজনের পর নিদ্রা যাইতে দেখে নাই। প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, বাল্য-কাল হইতেই তাঁহার জীবনের এক বিশেষ বিধানরূপে পরিণত হইয়াছিল।

আশুতোষের পিতা পরম পণ্ডিত ডাক্তার ছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। হিন্দুর যাহা যথার্থ শাস্ত্র—শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত বিধান—গুণগ্রাহী সূক্ষ্মদর্শী ডাক্তার গঙ্গা-প্রসাদ তাহাতে অবশ্যই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃষ্ট পবিত্র বিধান। এ

বিধানের অনুসরণ কার্য্যের পক্ষে বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকুল ও আবশ্যকীয়।

তিনি নিজেও এই পবিত্র-বিধানের অনুষ্ঠান করিতেন। পুত্রকেও সেই বিধান অনুসরণ করিতে শিখাইতেন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ ভোরে উঠিতেন। প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধান্তে বেড়াইতে বাহির হইতেন। বেড়াইবার সময় পুত্র আশুতোষকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আশুতোষ পিতার সহিত বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া অতি প্রত্যুষে উঠিতেন। তিনি গৃহের সকলের অগ্রে উঠিয়া, পিতার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। প্রাতঃকালে ভ্রমণ আশুতোষ চিরদিনই বজায় রাখিয়াছিলেন। শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ উঠিয়া, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন।

বিদ্যালয়ে পাঠের জন্য, আশুতোষ কখন পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। তিনি চিরদিনই নির্দ্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অধিক পাঠ সমাধা করিতেন। গৃহ শিক্ষকদিগের সাহায্যে এবং নিজের চেষ্টায় তিনি বরাবরই অনেক অধিক বিষয় শিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি প্রতিভা ও অসাধারণ স্মৃতি শক্তি পাঠোন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সহায় ছিল।

আশুতোষ একবার যাহা পড়িতেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাহা সম্পূর্ণ-রূপে দখল করিয়া লইতেন। আর তিনি একবার যাহা দখল করিতেন, তাহা জীবনে কখনই ছাড়িতেন না—ভুলিতেও পারিতেন না।

তিনি শিশুকালে, পাঠশালে পাঁচ বৎসরের পাঠ দুই বৎসরে সমাধা করিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় এলএর বিদ্যা অধিকার করিতেন। এলএর সময় বি এর পাঠ্য আর বি এর সময় এম এর পাঠ্য উৎকৃষ্ট রূপে অধ্যয়ন আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। এখন কয়টা ছাত্র শিক্ষাকালে এমন প্রতিভাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে? কৈ এমন অসাধারণ প্রতিভার প্রভা তো কোনছাত্রেই আর পরিদৃষ্ট হয় না।

আশুতোষের তুলনা সত্যই এক আশুতোষ। তাঁহা ছাড়া আর দ্বিতীয় নাই। কি কর্ম্মে—কি জ্ঞানে—কি ধর্ম্মে—কি নৈতিক-চরিত্রে এমন শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর দ্বিতীয় কৈ? আবার আশুতোষ যেমন তেজস্বী তেমনি বিনয়ী· শ্রেষ্ঠ পুরুষের, মহাপুরুষের এই তো লক্ষণ। এই তো প্রতীচ্য-সুপারম্যানের (Superman) আদর্শ-দণ্ড।

হেন আশুতোষকে পূজা সম্মান না দিবে কে? অন্ধ-গোঁড়া ভক্ত বলিয়া আমাদিগকে যে যাহাই বলুক, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই আমরা সত্যই আশুতোষের গুণ রাশির উপাসক। সে অপূর্ব্ব অদ্ভুত গুণরাশি অনুকরণ করিলে বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী-জীবন যথার্থই ধন্য কৃতার্থ হইবে।

পিতা গঙ্গাপ্রসাদের সহিত তখনকার বঙ্গের বহু বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ বন্ধুত্ব ও আলাপ পরিচয় ছিল। তন্মধ্যে হাইকোর্টের দেশবিখ্যাত জজ তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় ব্যবহারজীবী দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ছিলেন একজন।

তিনি অনেক সময় প্রিয় সুহৃদ গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে যাওয়া আসা করিতেন।

শিশু আশুতোষ এই সময়ে পিতৃ-বন্ধু দ্বারকানাথকে দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। দ্বারকানাথের মূর্ত্তি তেমন সুন্দর ছিল না। তাঁহার শরীরের রঙ কাল ছিল। কিন্তু সেই কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তির মধ্যে কি অদ্ভুত অপূর্ব্ব প্রতিভা-শক্তি বিদ্যমান ছিল, তাহা যে দ্বারকানাথকে দেখিয়াছে—বা চিনিয়াছে সেই জানিতে পারিয়াছে। নীল-বিদ্রোহের সময় উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে দ্বারকানাথের দরিদ্র বিপন্ন প্রজাপক্ষ-সমর্থন-কল্পে যে অসাধারণ বাগ্মীতা—বক্তৃতার জ্বালাময়ী প্রবল অগ্ন্যুদ্গাম; আর সেই একই সময়ে একই ক্ষেত্রে লেখক-প্রবর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকটিত জ্বালাময়ী প্রবন্ধ নিচয় আজও বহু বাঙ্গালীর হৃদয়ের শোণিতে সংমিশ্রিত রহিয়াছে।

দ্বারকানাথ প্রভৃতি মনস্বীগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া, আশুতোষের প্রাণে তখন অবশ্য উচ্চ অভিলাষ উচ্চ আকাঙ্ক্ষার নানাভাব আবির্ভূত হইত। বাল্যকালে আশুতোষ হয়তো হাইকোর্টের জজীয়তীকে স্বাতি-নক্ষত্রের বারি বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস শেষ-জীবনে তিনি এক মহাআদর্শ হৃদয়ে ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জাতীয়-জীবনকে উচ্চ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদানে উৎকৃষ্টরূপে সংগঠিত ও উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে বলিষ্ঠ করিয়া, তাহাকে প্রবুদ্ধ করা ও সুশিক্ষিত করাই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য

হইয়াছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, যিনি যাহাই করুন, উচ্চ শিক্ষার সংস্কার সম্প্রসারণ ব্যতীত জাতীয়-হৃদয় বিকশিত হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন জাতীয়-জীবন কখনই প্রবুদ্ধ হইতে পারে না।

তিনি সভ্য-জগতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত পাঠে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে উচ্চ-শিক্ষাই জাতীয়-জীবন গঠনের ও উদ্বোধনের একমাত্র উপযুক্ত উপাদান। উচ্চ শিক্ষা দ্বারাই প্রকৃত-পক্ষে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়া থাকে। কেবল উচ্চ শিক্ষা দ্বারাই মানবের সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়, তৎসঙ্গে তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়। তাহাতে মানবের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়—তাহার হৃদয় প্রশস্ত হইয়া মানুষকে যথার্থ মানুষ করিয়া তোলে। কেবল তখনই—সেই বিদ্যার বলে বলীয়ান হইয়া, মানব মহত্ব লাভ করে—আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য—দেশের জন্য—জগতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে—আপনার স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে বলিদান দিতে সমর্থ হয়।

আশুতোষ আরও বুঝিয়াছিলেন যে উচ্চ-শিক্ষা সকল সভ্য সমুন্নত জগতের মধ্য-শ্রেণীর মধ্যম-স্তরে সন্নিবদ্ধ থাকে। সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর স্তরে তাহা প্রায় পঁহুছিতে পারে না—নিম্ন শ্রেণীর নিকটে আদৌ যাইতে পারে না। মধ্য শ্রেণীর লোক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াই, সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণ অভ্যুদয় সংসাধিত করিয়া থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অভ্যুদয়-ইতিবৃত্তে এ কথার সত্যতা সারবত্তা বিশেষরূপে প্রকটিত। তথায় মধ্য-শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণই সর্ব্ববিধ জাতীয় উন্নতি, সামাজিক কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। আশুতোষের শিক্ষা দীক্ষা কেবল গণিত বিজ্ঞানে নিবদ্ধ ছিল না। জাতীয় উত্থান পতনের ঐতিহাসিক তত্ত্বেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা পারদর্শিতা ছিল। তদনুসরণে তিনি জাতীয়-শিক্ষা সুগঠন সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

আমাদের মনে হয়, তাই আশুতোষের শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য কখন হাইকোর্টের জজীয়তী পদ লাভ ছিল না—তাহা হইতেও পারে না। নির্ভীক তেজস্বী আশুতোষ, চাকুরী যত বড়ই হউক না—তাহা চাকুরী বলিয়াই মনে করিতেন। তবে স্বাধীন কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও ওকালতী পদে বা পদবীতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব লাভ নিতান্ত কঠিন ব্যাপার, একরূপ অসম্ভব বলিয়া তিনি স্বীয় স্বভাব-সঙ্গত ওকালতী ব্যবসা অনায়াসে পায়ে ঠেলিয়াছিলেন। তেমন প্রশস্ত-হৃদয় আশুতোষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য কখনই জজীয়তী হইতে পারে না।

জাতীয়-জীবনের উন্নতি নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনের মহৎ ও শেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ছাত্র-জীবনেই দেশের রাজনীতি ব্যাপারে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন উচ্চ শিক্ষার বিধান ভিন্ন কখন জাতীয়-জীবন উন্নত বা প্রবুদ্ধ হইবে না—তাহাতে বিশেষ ফলও ফলিবে না—তখনই নীরব কর্ম্মযোগী বৃথা গলাবাজির বৃথা আন্দোলন

আস্ফালন ছাড়িয়া নীরবে প্রকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে—যাহাতে সুপ্ত জাতি জাগিয়া উঠিবে—মৃত দেশ সঞ্জীবিত হইবে—তজ্জন্ত নীরবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, নীরবে সে পবিত্র কর্ম্মযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। যদিও সে কর্ম্মযজ্ঞের হোতা জাতীয়-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার অবলম্বিত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যে কত উচ্চ কত শ্রেষ্ঠ তাহা এখন না হউক অদূর ভবিষ্যতে সকলেই জানিতে পারিবে। যদি এ পতিত জাতি কখন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে—যদি অভিশপ্ত দেশ কখন আত্মোদ্ধারে সমর্থ হয়, আর সেই বিষয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়, তখনই আশুতোষের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিজয়-নিশান মস্তকে ধারণ করিয়া, সেই ইতিবৃত্তের শীর্ষস্থান নিশ্চয়ই অধিকার করিবে। এ সকল কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কোন মহাপুরুষের জীবনী-লেখক প্রাণের আবেগ সম্বরণ করিয়া লেখনী সংযত করিতে পারে? আমরা সত্যই মহাপুরুষ আশু-তোষের অনুরাগী উপাসক। জানি না তাঁহার পূত জীবন চরিত পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত করিতে পারিব কি না,—তবে লিখিতে লিখিতে যথার্থই প্রাণের অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। যেখানে যতটুকু গুণ—যতটুকু শক্তি, মহাপ্রাণ আশুতোষের মন প্রাণ সেইখানেই আকৃষ্ট হইত।

আশুতোষ স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। পরীক্ষা মাত্রেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতেন। যে শ্রেণীতে যখন পড়িতেন,

সে শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়ও প্রায় সকল সময়েই শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন —হইবারই কথা।

বলিয়াছি তো তিনি যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন তখনই সেই শ্রেণীর পাঠ্য অপেক্ষা অনেক বেশী পড়া পড়িতেন। পাঠে অনুরাগ আসক্তি আশুতোষের এতই অধিক ছিল, যে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ পুস্তকের পাঠে তাঁহার পরিতৃপ্তি সাধিত হইত না। যতই পড়িতেন, ততই আরও অধিক পড়িবেন বলিয়া তাঁহার একান্ত আগ্রহ জন্মিত। জ্ঞান-শিখা যতই প্রজ্বলিত হইত, জানিবার বুঝিবার কৌতূহল-শিখা ততই আশুতোষের মনের মধ্যে দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিত।

জ্ঞানে এ কৌতূহল-আগ্রহ—জানিবার জন্য এতো ব্যাকুল-পীপাসা কি জন্য আশুতোষের প্রাণে জাগিয়া উঠিত? জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠ স্বভাব। জ্ঞানলাভ যে মনুষ্যত্বের প্রধান উপায়। জ্ঞানই মনুষ্যত্ব-অভিব্যক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপাদান। আশুতোষ যে মনুষ্যত্বের আদর্শ।

কিছুকাল হইতে এদেশে শিক্ষার যেরূপ গতি প্রকৃতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত শিক্ষার পথ একরূপ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কেবল পরীক্ষায় পাশ হওয়াই, এদেশীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তজ্জন্য অনেক ছেলে কেবল পাঠের বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া, কোন রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বিদ্যার সার্থকতা সাধন করে। এমন অনেক ছেলে

আছে—তাহাদের সংখ্যাই অধিক—তাহারা বড় বেশী কিছু জানে না বুঝেও না, অথচ অনায়াসে উনিবারসিটির বি-এ এম, এ পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়া, বহু মেডাল ডেপ্লোমার অধিকারী হইয়া থাকে। এ সকল শিক্ষার দোষ—শিক্ষা প্রণালীর দোষ—আর প্রধান দোষ—পরীক্ষা-প্রণালীর। যে বিষয়টা পড়িতে হয়—যে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, তাহা কখন মুখস্থ করিলে, অথবা কণ্ঠস্থ করিলেও বিশেষ ফল ফলে না। তাহাকে এমন ভাবে হজম করিতে হয়, যেন উহা নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইতে পারে। একেতো ইংরাজী-বিদ্যালয় গুলা হট্টগোলের আখড়া হইয়া পড়িয়াছে। এক একটা স্কুল দেখিলে মনে হয়, যেন বহু বিহঙ্গ-সমাকুল একটা বিশাল-বৃক্ষ-বিশেষ। অধ্যাপক আসিয়া পুস্তক খুলিলেন—কতগুলা ছত্র আওড়াইলেন—কোথায় কিছু ব্যাখ্যা-বিবৃতি প্রয়োজন অনুসারে করিলেন—কোন ছাত্র কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিল, তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। অধিক ছাত্রই নিজেরা ইচ্ছামত প্রয়োজনমত শিক্ষাকার্য্য সমাধা করে। টীকা টিপ্পনী আদি-সম্বলিত নোট হইয়াছে তাহাদের শিক্ষার সহায়। পাঠ্য পুস্তক কি—তাহাতে কেমন ভেক বা সর্প আছে—তাহা হয়তো অনেকে জানেনা বুঝেনা। নোট-বুকের বলে, আর আপনাদের স্মরণ-শক্তির ফলে, অনেক স্থলে অনেক ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, এইটা আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান দোষ ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া আরও একটা প্রধান দোষ ঘটিয়াছে—বহু বিষয়ের কিছু কিছু জানা চাই। এই পল্লব-গ্রাহিতা-ব্যাপার

শিক্ষার একটা মহৎ দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে ঘটিতেছে কোন বিষয়ই ভালরূপে শিক্ষা হইতেছে না—সকল শিক্ষাতেই মুখস্থ পুঁথিগত বিদ্যা (Cramming) ঘটিয়াছে শিক্ষার চরম দশা। ভাল করিয়া শেখা আর বড় বেশী ছাত্রের ভাগ্যে ঘটিতেছে না।

আশুতোষের বিদ্যা—আশুতোষের শিক্ষা মুখস্থ পুঁথিগত ছিলনা। তিনি যাহা শিখিতেন ভাল করিয়াই শিখিতেন। যে বিষয় ধরিতেন, তাহার সকল তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতেন, তন্ন তন্ন বিচার বিশ্লেষণ করিয়া জানিয়া লইতেন। তিনি নিজে এইরূপে শিখিয়াছিলেন। উনিভারসিটির বিদ্যা-ব্যাপারেও সেইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু পোড়া বাঙলার প্রতি বিধাতা বিমুখ! তিনি কি করিবেন!

আশুতোষ অধ্যয়নে—জ্ঞানার্জ্জনে এমন তন্ময় আত্মহারা হইতেন, যে তখন তাঁহার আহার নিদ্রার সময় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিত না। বিজ্ঞ বহুদর্শী বুদ্ধিমান পিতা, পুত্রের এরূপ কার্য্য অনুমোদন করিতেন না। পুত্রের শিক্ষার প্রতি তাঁহার যেমন দৃষ্টি ছিল, তেমনি তাঁহার চরিত্র-গঠনের প্রতিও দৃষ্টি ছিল, আবার তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতিও তেমনি বা ততোধিক প্রখর দৃষ্টি ছিল। পাছে জ্ঞান-তৃষ্ণার আধিক্যে—শিক্ষা বাসনার প্রাবাল্যে— আশুতোষের স্বাস্থ্যহানি হয়, সেইজন্য ডাক্তার পিতা গঙ্গাধর সততই সতর্ক থাকিতেন।

আশুতোষ জ্ঞান-পীপাসায় অধীর হইয়া, অনেক সময় অধিক

রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া লেখা পড়া করিতেন। পিতা, পুত্রের স্বাস্থ্য-ভঙ্গের ভয়ে তাহা অনুমোদন করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই আশুতোষকে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে সাবধান হইতে উপদেশ দিতেন। পিতা অনেক সময়ে পুত্রকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে নিষেধ করিতেন।

আশুতোষ, বড় দায়ে ঠেকিলেন। প্রবল জ্ঞান-পীপাসা একদিকে তাঁহাকে রাত্রি জাগিয়া পড়িবার জন্য তাড়না করিতে লাগিল, অপর দিকে পিতার নিষেধ-আজ্ঞা। আশুতোষ কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জ্ঞান-তৃষ্ণা এতই প্রবল হইয়া উঠিল, যে আশুতোষ পিতার মহামূল্যবান নিষেধ বাক্য অনেক সময় ভুলিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতার ভয়—পিতার প্রতি প্রাণের ভক্তি—তাঁহাকে মহাসঙ্কটের মাঝে নিক্ষেপ করিল।

আশুতোষের জ্ঞান-পীপাসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি পিতার নিষেধ-আজ্ঞায় ভীত হইয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে রাত্রি জাগিয়া পড়িতে লাগিলেন। নিয়ম-বিধানের বশবর্ত্তী মহা-সংযমী পুরুষ আশুতোষ কেবল অধ্যয়ন-ব্যাপারে নিয়মের বিধানকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

এইরূপ অনিয়মে ও উৎকট পরিশ্রমে অল্পদিনেই আশুতোষের স্বাস্থ্য হানি ঘটে। বাল্যকালে তিনি দুইবার অতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার সকল অঙ্গে ফোড়া

হয়। তখন তিনি মাতার সহ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গাজিপুরে গমন করেন।

গাজিপুর, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের এক পরম স্বাস্থ্যকর ও সৌন্দর্য্যময় নগর। শুনা যায় সেখানে এক অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে। তাহাতে আশুতোষ স্ফোটক, ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করেন।

একটি ইঁদারার ধারে বসিয়া তিনি স্নান করিতেছিলেন। ইঁদারার নিকটে একটা ভীমরুলের চাক ছিল। একটা ছেলে তৎকালে সেই চাকে ঢিল ছুড়িয়াছিল। চক্রে আঘাৎ লাগিলে দলে দলে ভীমরুল উড়িয়া বাহির হইল। যে আঘাত করিয়াছিল, সে পলাইয়াছিল। ভীমরুলদল, আক্রমণকারীকে দেখিতে পাইল না। নিকটে আশুতোষ অনন্যমনে স্নান করিতেছিলেন। ক্রুদ্ধ ভীমরুলদল আশুতোষকে পাইয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। অনেক গুলি ভীমরুল একসঙ্গে দংশন করায় আশুতোষ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর সংজ্ঞা হইল না।

এদিকে গৃহে জননী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন বহুলোক ছুটিয়া ইঁদারার নিকট আসিল। তাহারা দেখিল সর্ব্বনাশ! আশুতোষ মূর্চ্ছিত!

ভৃত্যগণ ধরাধরি করিয়া আশুতোষকে গৃহে লইয়া গেল। বহু সেবা সুশ্রূষা ও ঔষধির ব্যবস্থা হইল। কিছুতেই আর আশুতোষের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না।

আশুতোষের জননী, পুত্রের জন্য অধীরা জ্ঞানহারা হইয়া উঠিলেন। অনেক রকম চিকিৎসা চলিতে লাগিল। অবশেষে প্রায় এক দিবস পরে ধীরে ধীরে আশুতোষের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

অনেকেই জানেন, ভীমরুল-দংশন বিষাক্ত ব্যাপার। ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক ভগবানের কৃপায় সে যাত্রা আশুতোষের প্রাণরক্ষা হইল।

আশুতোষের জীবন-লাভের সঙ্গে আর একটি অতি সুফল ফলিল। আশুতোষ স্ফোটক-ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যও উত্তরোত্তর উন্নত হইতে লাগিল।

সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া, সুস্থ শরীরে আশুতোষ গাজিপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আবার মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে আবার উৎকট পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণাদি অনিয়মের জন্য আশুতোষ পীড়িত হইলেন। এবারে তাঁহার পীড়া অতিশয় কঠিন ভাব ধারণ করিল। অনেকেই রোগ গুরুতর বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। পিতা ডাক্তর গঙ্গাপ্রসাদ অত্যন্ত চিন্তিত উৎকণ্ঠিত হইলেন।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ নিজে একজন অতি বিজ্ঞ বহুদর্শী সুচিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু আপনার নিজ চিকিৎসা বা নিতান্ত আত্মীয় অন্তরঙ্গের চিকিৎসা নিজের দ্বারা ভালরূপে

চলিতে পারে না, ইহা তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ডাক্তার বেশ বুঝিতে পারেন। তাই বুঝিয়া গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের চিকিৎসার ভার, তৎকালের মেডিক্যাল কলেজের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের হস্তে প্রদান করিলেন।

কিছুদিন চিকিৎসার পর, আশুতোষের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল। আশুতোষ তজ্জন্য মথুরায় গমন করিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে আশুতোষের স্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। এখানে আশুতোষের অধিক মাত্রা দুগ্ধ-পানের ব্যবস্থা হইল। আশুতোষ প্রতিদিন তিন সের খাঁটি দুধ খাইতে লাগিলেন।

অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাঁহার হৃদ-রোগ জন্মিয়াছে। অনেক সময় তাঁহার বুক ধড়ফড় করিত—বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিত। বড় কঠিন পীড়া! পিতামাতা আত্মীয় স্বজনগণ আশুতোষের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারা আশুতোষের জীবনের আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

যাহাহউক মথুরার আবহাওয়ায়, আশুতোষ আরোগ্য লাভ করিলেন। আহারের ব্যবস্থায় আশুতোষের দৈহিক-অবস্থা বিশেষ উন্নতিলাভ করিল।

আশুতোষ ফিরিয়া আসিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অসংযত ভাবে অনিয়মে আর কখন অধ্যয়নে

রত হইতেন না। আর কখন অধিক রাত্রি জাগিয়া উৎকট পরিশ্রম করিয়া পাঠ অভ্যাস করেন নাই।

এখন হইতে তিনি নিয়মিত ভাবে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। পিতাও অধিক রাত্রি জাগিয়া বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া পুত্রকে পড়িতে অনুমোদন করিতেন না। বাস্তবিক পক্ষে আশুতোষের তাহা প্রয়োজনও হইত না। আশুতোষের যেরূপ অসাধারণ প্রতিভা ছিল—এমন কি অমানুষিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য, তাঁহার পক্ষে অতিরিক্ত পরিশ্রম বা অধিক রাত্রি জাগণের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান পীপাসা—এতই প্রবল ছিল যে নূতন বিষয় শিখিতে হইলে তিনি তাহারনিগুঢ়-তত্ত্ব না জানিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি তখন নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিতেন। জ্ঞানের জন্য তাঁহার কৌতুহল-শিখা এতই জ্বলিয়া উঠিত, যে তিনি তখন সত্যই আত্মহারা হইয়া উঠিতেন।

জ্ঞান-পীপাসা—জ্ঞান-অনুশীলনই আশুতোষকে এতো বড় করিয়াছিল। আবার জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে এমন কর্ম্ম-শক্তির প্রভাবও এখন এদেশে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এক সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেমন বিদ্যাচর্চ্চায় তেমনি কর্ম্মসাধনায় অতিশয় দক্ষ কর্ম্মী বলিয়া এদেশে-বিখ্যাত। তদ্ব্যতীত জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, হৃদয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বব্যাপারে আশুতোষের নাম মহাপুরুষ এদেশে নিতান্ত বিরল। যদি আশুতোষের ন্যায়

পুরুষসিংহ এদেশে না জন্মিয়া প্রতীচ্য-দেশে কোন সভ্য সমুন্নত সমাজে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে তিনি যে কত বড় হইতে পারিতেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এই পতিত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি নিজে জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বা মহাকর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গলা-দেশ বাঙ্গালী জাতি আশুতোষের ন্যায় মহাপুরুষকে লাভ করিয়া যে ধন্য হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতের ইতিহাস নিশ্চয়ই ঘোষণা করিবে।

পিতার ন্যায়, আশুতোষের জননীও শিক্ষা-বিষয়ে পুত্রের সাহায্য করিতেন। জননী নিজে যাহা জানিতেন, তাহা পুত্রকে শিখাইতে সদাই উৎসুক ও যত্নবতী ছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত বীর দৃঢ় দক্ষ কর্ম্মী নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে জননীর গুণেই প্রধানতঃ সুসন্তান গুণে কর্ম্মে সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে গৃহে জননীর শিক্ষাগুণে, জননীর উপদেশে, জননীর আদর্শ-দৃষ্টান্তে সন্তানের উৎকৃষ্ট শিক্ষার ভিত্তি গঠিত হইয়া থাকে। গুণবতী জননী, সন্তানকে সুগঠিত করিয়া থাকেন। শিশু-অবস্থায় মানব-মন মানব-প্রকৃতি অতি কোমল থাকে। তখন তাহাকে যে ভাবে গড়া যায়, যে আদর্শের ছাঁচে তাহার সরল মানস-প্রকৃতিকে ঢালা যায়, সন্তান সেই ভাবে গড়িয়া উঠে। মাতা গুণবতী হইলে, সন্তান প্রায় গুণবান হইয়া উঠে। গুণহীনা জননীর পুত্র কখন বড় হইতে পারে না। জগতে যত শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখা যায়—মহৎ

চরিত্রের কথা শুনা যায়, তাঁহাদের সকলেরই গর্ভধারিণী লালন-পালন-কর্ত্রী জননী নিশ্চয়ই গুণবতী। গুণহীনা রমণীর সন্তান প্রায় কখনই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। আশুতোষের জননীও মহা গুণবতী ছিলেন। যদিও তৎকালে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার এতোটা প্রসার ঘটে নাই, তথাপি আশুতোষের মাতা নিতান্ত বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিতা 'সেকেলে' মেয়ে ছিলেন না। তিনি নিজগুণে নিজ চেষ্টায় যতদূর শিখিয়াছিলেন, তাহা পুত্রকে প্রাণপণে শিখাইতেন। আশুতোষের উন্নতি উৎকর্ষণের সহিত মতৃ-প্রভাব বিশেষভাবে বিজড়িত। আশুতোষের শিশু-কালে, জননীর শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁহার উন্নতির একটা প্রধান কারণ।

আমাদের দেশে একটা কথা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে যে 'ছেলে মামার ভাবের অধিকারী হইয়া থাকে।' ইহার অর্থ এই যে গর্ভধারিণী জননীর গতিমতি অনুসারেই প্রায় পুত্রের চরিত্র প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা সর্ব্বক্ষেত্রে সাধারণ-বিধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কোন কোন স্থলে যে এ বিধানের ব্যতিক্রম না হয় এমন নহে। তবে অনেক স্থলে এই বিধানের প্রক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আশুতোষ মাতৃকুলের .বা মাতার ভাব প্রকৃতির ঠিক উত্তরাধিকারী হউন বা নাই হউন, জননীর প্রকৃতি-প্রভাব যে তাঁহাতে, পূর্ণাঙ্গে না হউক, কতক পরিমাণে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আশুতোষের জননী সাধারণ বঙ্গ-রমণীর ন্যায় অতি সামান্য বিষয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন না। উচ্চ-চিন্তা, মহৎ-কার্য্যের প্রতি তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অনুরাগ ছিল। এদেশের রমণীর পক্ষে, বিশেষতঃ তাঁহার সম-সময়ে ইহা একটা অদ্ভূত কথা বলিয়াই মনে হয়। এদেশে তখন স্ত্রী-শিক্ষার এমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটে নাই। এখনও সে সম্বন্ধে বিশেষ অধিক কিছু বিধান ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বলি না। তবে তুলনায় তখনকার অপেক্ষা যে এখন অধিক ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আশুতোষের জননী, দেশের তদানীন্তন অবস্থায়ও বঙ্গ-সমাজের এক অতি শ্রেষ্ঠা রমণী ছিলেন। আশুতোষ জননীর সেই মহৎ প্রকৃতির পুর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। জননীর ন্যায় তিনি সামান্য বিষয়—তুচ্ছ ভাব চিন্তা—ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া থাকিতে পারিতেন না। বাস্তবিক পক্ষে কথায় বলে 'সাদাসিধা জীবন আর উচ্চ চিন্তা ভাব' (Plain living and high thinking) মহত্ত্বের লক্ষণ। আশুতোষের জননী সেই ভাবেই প্রণোদিতা ছিলেন। তিনি জীবনে বাহ্য আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না; উচ্চ প্রসঙ্গ, মহৎ কার্য্য ও শ্রেষ্ঠ ভাব লইয়া থাকিতে সর্ব্বদা ভাল বাসিতেন। জননীর এই মহৎ প্রকৃতি পুত্র আশুতোষে পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত হইয়াছিল।

তখন এদেশে প্রথম 'বক্তৃতার' যুগ আরম্ভ হয়। রাম-গোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, প্রভৃতি কোন কোন প্রধান

ব্যক্তিগণ সামান্য ভাবে রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, শিক্ষা-নীতির সূত্র ধরিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কিছু পরেই ধর্ম্ম ও নীতি-ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, প্রতাপচন্দ্র আর রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া, বক্তৃতায় বাগ্মীতায় বঙ্গদেশকে উদ্বোধিত করিলেন। সেই সময় হইতে বিলাতের ন্যায় এ দেশেও বক্তৃতার স্রোত খুব প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। অনেকেই বুঝিল যে দেশকে জাগাইতে হইলে—সমাজকে উদ্বোধিত করিতে হইলে, বক্তৃতা এক বিশেষ প্রয়োজনীয় উপায় উপাদান।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ একথার সারবত্তা বেশ হৃদয়ে অবধারণ করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই পুত্রের মহৎভাব—শ্রেষ্ঠপ্রকৃতি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন সন্তান আশু-তোষ কালে যে একজন অতি মহৎ ব্যক্তি হইবেন—একথা বুঝিতে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের কিছুমাত্র বাকি রহিল না।

গঙ্গাপ্রসাদ যেমন বিশ্লেষন দ্বারা, শারীর-বিধান বেশ বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি-বিচার দ্বারা মানসিক ভাবশক্তিও উত্তমরূপে বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন সূক্ষ্মদর্শী মনস্বী সদা-পুত্র-হিতেরত পিতার চক্ষে, পুত্রের অসাধারণ মানস-প্রতিভা যে সত্বরই ধরা পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কালে আশুতোষ যে জগতের এক উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, গঙ্গাপ্রসাদ তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং পুত্রকে সেইভাবে গঠন করা, তাহার পুরোভাগে

অবস্থিত পন্থাকে সরল সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন।

দেশের শিক্ষা-দীক্ষার বায়ু-গতি বুঝিয়া, আর পুত্রের অসাধারণ প্রতিভা-শক্তি জানিয়া, গঙ্গাপ্রসাদ তাহাকে সর্ব্বদিকে সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত রূপে গঠিত করিতে বিশেষ উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত হইলেন। দেশে তখন যে হাওয়ার ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব লাভের জন্য আশুতোষের পক্ষে বক্তৃতা-শিক্ষা বাগ্মীতার অনুশীলন যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা গঙ্গাপ্রসাদ সুন্দররূপে বুঝিয়া ছিলেন।

পিতা, স্বগৃহে নিজের সম্মুখে, আশুতোষের বক্তৃতা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। একখানি টুলকে প্লাটফরম রূপে সংস্থাপন করিয়া তদুপরি পুত্রকে দাঁড় করাইতেন। আশুতোষ টুলের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন। তখন আশুতোষ জলদ-গম্ভীর স্বরে, বিশুদ্ধ-বাক্যে ওজস্বী-ভাষায় অনেক বিষয়ে অনেক কথা কহিতেন।

এইরূপে প্রথমে অধ্যয়ন-অবস্থায় আশুতোষের বক্তৃতা-প্রভা বাগ্মীতা-শক্তি বিকশিত হইয়াছিল। এই প্রভা-শক্তি বিকশিত হইয়া, কালে তাঁহাকে দেশের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ বক্তায় পরিণত করিয়াছিল। যদিও তিনি সতত বক্তৃতা করিতেন না, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে তিনি যে ক্ষেত্রে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা

অতি বিখ্যাত—এমন কি অনেকস্থলে সাহিত্যের সারসম্পদ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তিনি লাট-সভায়, বিদ্যোদ্বোধন (Convocation) সভায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সভায় বহুস্থলে বহুবার যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, সেগুলি বহুগুণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কি যুক্তি-বিচারে, কি ওজস্বিতায়, কি ভাষার ছটায়, কি বাক্য-বিন্যাসে আশুতোষের বহু বক্তৃতা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমাদরের সামগ্রী হইয়া চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিবে।

এই বক্তৃতা-শক্তি বাগ্মীতা-প্রভা আশুতোষের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া, অনায়াসে অনুমিত হইয়া থাকে। মানুষের যাহা কিছু অসাধারণ—মনুষ্যত্বের যত কিছু বিশিষ্ট-ভাব তাহাই তাহার নিজস্ব স্বভাবযাত-ধর্ম্ম বিশেষ। আশুতোষের বক্তৃতা-শক্তি অপর বহুশক্তি বহুগুণের ন্যায় ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা—একটা সম্পূর্ণ অসাধারণত্ব।

আশুতোষ বাগ্মীতার ওজস্বিতায় শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি যে বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন তাহার মৌলিক-তত্ত্ব, কৈন্দ্রিক-তথ্য সত্বরই অতিসহজে স্বয়ং আয়ত্ত করিয়া লইতেন। তাহাকে বুদ্ধি বিচারের ঔজ্জ্বল্যে ভাব-গবেষণার সৌন্দর্য্যে, ওজস্বিতার অলঙ্কারে ও বাক্য-বিন্যাসের ছটায় সুসজ্জিত করিয়া, এমন ভাবে প্রয়োগ-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিতেন, যে সভাস্থ শ্রোতৃ-মণ্ডলী শ্রবণমাত্রেই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। আশুতোষ যাহা বলিতেছেন তাহাই যেন দৃঢ় যুক্তি-মূলক

—কঠোর সত্য-ভিতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, শ্রোতা যেন তাহাই অন্তরের অন্তস্তলে উপলব্ধি করিয়া প্রাণে প্রাণে মানিয়া লইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিত। এমন দৃষ্টান্ত আমরাই অনেক সভাস্থলে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার আর একটা প্রধান কারণ—আশুতোষের সত্যাগ্রহিতা সত্যের প্রতি প্রাণের অনুরাগ। আশুতোষ যাহা সত্য বলিয়া নিজে বুঝিতেন, তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা সভাস্থ ব্যক্তি বর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। যাহা সত্য বলিয়া তাঁহার অন্তরের ধারণা, বা প্রাণের বিশ্বাস না জন্মাইত, তাহা তিনি কখনই নিজেও গ্রহণ করিতেন না—পরকেও গ্রহণ করিবার জন্য মিথ্যা বাক্যজাল বিস্তারের প্রয়াস পাইতেন না। কিন্তু যাহা ঠিক সত্য বলিয়া বুঝিতেন, যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, সিংহ-বিক্রমে তাহা নিজে ধারণ করিতেন, পরকে গ্রহণ করিবার জন্য সিংহ-বিক্রমে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত বুঝাইতেন—প্রচার করিতেন। যাহা মিথ্যা—যাহা মন্দ—বলিয়া তিনি নিজে বুঝিতেন, অতি ঘৃণার সহিত তাহা হইতে নিজেও দূরে রহিতেন—অপরকেও তাহার নিকটে আসিতে দিতেন না।

আশুতোষের বাগ্মীতার ফলে বহু সত্য বিষয় গৃহীত সমাদৃত হইয়াছে, বহু মিথ্যা অশুভ ব্যাপার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব বক্তৃতা-শক্তির বীজ, যাহা আশুতোষের সহজাত স্বভাবজাত—তাহা গৃহে পিতার সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত বিধান-অনুসারে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই প্রকৃতি-জাত বক্তৃতা-শক্তি

আশুতোষের ওকালতি-অবস্থায় ও সভাক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে আলোচিত প্রদর্শিত হইবে। আজি কালি সভাসমিতির প্রাদুর্ভাবে বা দৌরাত্ম্যে এদেশে বক্তার বিশেষ অভাব নাই। অনেক ছোট ছোট ছেলে, বহু বিদ্যা-ধ্বজাধারী ব্যক্তি আজ কাল হাটে মাঠে বক্তৃতা করিয়া বক্তা সাজিয়া বেড়াইতেছে। কিছুদিন আগে—আশুতোষের সময়ে বক্তার এতো ছড়াছড়ি হয় নাই। তখন এদেশে এমন কথার কেনা বেচা হইয়া দেশকে ব্যতিব্যস্ত করে নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জানিয়া বুঝিয়া লোকে কথা কহিত। বিশেষতঃ সভাস্থলে বক্তৃতা করা যে সে লোকের কাজ ছিলনা।

আশুতোষ প্রথম অবস্থায় রাজ-নৈতিক-ক্ষেত্রে কিছু কিছু বক্তৃতা যে না করিয়াছিলেন এমন নহে। তাঁহার সে প্রথম অবস্থার বক্তৃতাতেও অনেক সার সত্য কথা—চিন্তাযুক্তির কথা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আশুতোষ ওকলতির অবস্থায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মধিকরণে যে বক্তৃতা করিতেন, তাহাতে জজগণ ও শ্রেষ্ঠ উকিল ব্যারিষ্টারগণ শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ হইতেন।

আশুতোষ যেমন সুলেখক ছিলেন, তেমনি সুবক্তাও হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত, তিনি কোথাও বক্তৃতা করিতেন না, তাই বড় বক্তা বলিয়া তাঁহার ততটা নাম নাই। নাম নাই হউক, বক্তৃতায় তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার বক্তৃতা কোন সভাস্থলে শুনিয়াছে, সেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে।

আশুতোষ ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। দুই ভাষাতেই তাঁহার সমান অধিকার জন্মিয়াছিল। বক্তৃতা করিবার সময় তিনি কখন ভীত বা কুণ্ঠিত ভাবে ইতঃস্তত করেন নাই। ইহার এক প্রধান কারণ, তাঁহার নির্ভীকতা তেজস্বিতা, আর এক কারণ—তাঁহার সত্যানুরাগ। সত্যের জন্য তিনি সকলই করিতেন—সকলই করিতে পারিতেন। তজ্জন্য তিনি জগতের কোন শক্তিকেই ভয় করিতেন না—কোন শক্তির নিকট নতশির হইতেন না।

এমনও দেখা গিয়াছে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়াও আশুতোষ অনর্গল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এখানে একটা কথা আমাদের মনে উপস্থিত হইল। কথাটার উল্লেখ না করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। আশুতোষ যে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়াও অনায়াসে অনর্গল সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানে সমর্থ ছিলেন, তাহা তদ্দারা বেশ বুঝা যায়।

একবার হাওড়ায় এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। যে সে সভা নয়—অতি বৃহৎ সভা—হাওড়ার বেদ-সভা। দেশ বিদেশ হইতে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া আশুতোষ তথায় উপস্থিত হইলেন। আশুতোষ আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে বড় বেশীক্ষণ তিনি সভায় থাকিতে পারিবেন না। কারণ সেদিন তাঁহার শরীর বড় ভাল ছিল না। আর তাঁহাকে তখন দেখিয়া সকলেরই মনে হইল যে বিশেষ কোন চিন্তার-কার্য্যে তিনি পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত

রহিয়াছিলেন। তাহাতে আশুতোষের দেহ মন যেন কিছু ক্লান্ত হইয়াছিল।

আশুতোষ সভায় আগমন করিবামাত্র সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে সর্ব্ববাদী-সম্মত-রূপে সভাপতি নির্ব্বাচন করিলেন। আশুতোষ প্রথমে সে সভায় সভাপতি হইতে অস্বীকার করিলেন।

আশুতোষ তেজস্বী নির্ভীক পুরুষ-সিংহ ছিলেন সত্য ; তাই বলিয়া তিনি দাম্ভিক বা কর্কশ উদ্ধত ব্যক্তি ছিলেন না। আশুতোষ সদাই বিনয়ী ছিলেন। বিনয় নম্রতা সত্যই তাঁহার বিদ্যাকে মহারত্নে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' এই মহাবাক্যের সার্থকতা, আশুতোষের জীবনে সদাই দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইত। সাধু সজ্জনের নিকট বিনয় নম্রতা প্রদর্শন তাঁহার স্বাভাবিক-ধর্ম্ম ছিল।

মহা মহা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়-সমন্বিত বেদ-সভার সভাপতি হইবার জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহ আশুতোষকে একান্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন আশুতোষ বিনীত-কণ্ঠে কহিলেন—"ইহা বেদ-সভা। যে সে সভা নহে। সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠবিদ্যা—বেদবিদ্যার কথা এখানে আলোচিত হইবে। বহু বিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-মণ্ডলী এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিতে, এই সভায়—এই বেদ-সভায় আমার মত ব্যক্তির সভাপতিত্ব কখনই শোভন বা শুষ্ঠু হইতে পারে না। যে সকল

মহামহোপাধ্যায় এই সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন এই সভার সভাপতি হউন।"

তাহাতে সকল পণ্ডিতগণই একবাক্যে কহিলেন—'এই সভার সভাপতি হইবার প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র আপনি। আপনি মহাপণ্ডিত। সর্ব্ববিষয়ে আপনার মত পণ্ডিত আর দেশে কে আছে?'

আশুতোষ আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না—সভাপতি হইতে আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় সীতারাম স্থায়াচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে ও অপর বহু পণ্ডিতের সমর্থনে আশুতোষ বেদ-সভার সভাপতি হইলেন।

তৎকালে কাহারও বুঝিতে বাকি ছিল না—যে সভাপতিত্বের কার্য্যের জন্ম আশুতোষ তখন প্রস্তুত ছিলেন না। অশুতোষ কোনরকমে সভাপতির দায়ীত্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে মনস্থ করিলেন। বেশী কিছু বলিবেন বলিয়া প্রস্তুতও ছিলেন না। তখন সভাস্থ কয়জন সভ্য তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্ম বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথা সদাশয়তার আধার আশুতোষ আর বার বার অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অগত্যা উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। বহু পণ্ডিত-সমাকীর্ণ বেদ-সভায় তাঁহার সেই বক্তৃতা আজিও আমাদের মনে সুস্পষ্ট জাগরূক রহিয়াছে। সে যে কি অপূর্ব্ব বক্তৃতা, তাহা যিনি শুনিয়াছেন,

তিনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আশুতোষ তখন পূর্ব্ব হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু কি সুন্দর-ভাবে আশুতোষ সেদিন বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন! যেমন সুন্দর তাঁহার বক্তৃতার যুক্তি-বিচার তেমনি সুন্দর তাঁহার ভাষার ছটা—তেমনি সুন্দর তাঁহার বলিবার ভঙ্গী—সর্ব্বোপরি সুন্দর সে বক্তৃতার ওজস্বিতা! সভাস্থ সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আশুতোষের সে বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। যথাস্থানে এ কথা বিশেষ-রূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—আশুতোষ বাঙ্গালা পড়া শেষ করিয়া, কিছুদিন গৃহে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি, পিতার তত্ত্বাবধানে ঘরে বসিয়া, শিক্ষকগণের দ্বারা বহুবিষয় শিখিতে লাগিলেন। ইংরাজী-ভাষা অঙ্ক প্রভৃতি বহু বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা তিনি ঘরেই লাভ করিাছিলেন।

আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ অতি বিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার যে দুরাবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। ছেলেকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিতে হইলে, গৃহেই তাহার উচ্চ-শিক্ষার বিধান ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা বিদ্যালয়ে যে সে ছাত্রের সঙ্গে সামান্য পড়া বহুদিন পড়িয়া, প্রতিভাবান ছাত্রকে অনেক সময় নষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি অসাধারণ

বুদ্ধিমান পুত্র আশুতোষের গৃহ-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক শিক্ষা-ব্যাপার অতি কঠিন ব্যাপার। কেবল পরের সাহায্যে বিদ্যা লাভ করা যায় না। জ্ঞান-সামগ্রী স্বীয় চেষ্টা স্বীয় সাধনার আয়ত্তাধীন। জগতে যত জ্ঞানী পণ্ডিত হইয়াছেন—যত গভীর বিদ্যার অধিকারী হইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই, আপনার সাধনার ফলে, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে কয়দিন বা শিক্ষা হয়, আর কতটুকুই বা শিক্ষা হয়। প্রকৃত শিক্ষা আপনার সাধন বলেই—আপন গৃহেই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এদেশে বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার যেরূপ অবনতি ঘটিয়াছে, তাহাতে এখানে খুব বেশী শিক্ষার বা খুব উচ্চ শিক্ষার আশা বৃথা—বিফল। যাহারা বাস্তবিকপক্ষে পক্ষে জ্ঞানে বিদ্যায় বড় হইতে চায়, তাহাদিগকে স্বয়ং স্বগৃহে সরস্বতীর সাধনা করিতে হয়। আর ছেলেদের শিক্ষাও ঘরেই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

গঙ্গাপ্রসাদ একথার সারবত্তা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই গৃহেই পুত্রের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আশুতোষ ঘরে বসিয়া বেশী পরিমাণে ইংরাজী সাহিত্য, গণিত আদি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যালয়ে বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি তজ্জন্য স্কুলে চতুর্থ-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত হইয়া-

ছিলেন। স্থবরবণস্কুলের শিক্ষকগণ আশুতোষকে পরীক্ষা করিয়া, তাহাই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু আশুতোষের বয়স, তখন যথাসময়ে এণ্ট্রান্স দিবার কাল পাইবে না বলিয়া, তাঁহাকে চতুর্থ-শ্রেণীতেই গ্রহণ করা হইল। আশুতোষ দুই বিখ্যাত শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

শুনাযায় আশুতোষের পাঠের অবস্থায় পিতা, পুত্রের বিদ্যার উৎসাহ অনুরাগ বিবর্দ্ধনের জন্য, পুরস্কার-প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ব্যবস্থা করিলেন যে ক্লাসে যখন আশুতোষ পড়িবেন, সেই শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিলে এক টাকা আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলে আট আনা পুরস্কার-স্বরূপ পাইবেন। আশুতোষ প্রায় প্রত্যহই এক টাকা করিয়াই পাইতেন।

এ ব্যবস্থা, আশুতোষের পিতার পক্ষে আধিক্য-ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। কারণ আশুতোষ যে স্বভাবতঃই বিদ্যা-অনুরাগী। জ্ঞানলাভ করিবার জন্য—বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তই যে তিনি নর-দেহ ধারণ ও নর-জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষাতত্ত্ব—জ্ঞানতত্ত্ব বাস্তবিকই মানব-জীবনের একটা ঘোর প্রহেলিকায়-সমাচ্ছন্ন। বাস্তবিক মানব-জন্মটাই যে শিক্ষার জন্য—জ্ঞানের জন্য—বিদ্যার জন্য। এ কথাটা অনেক সময় আমরা ভুলিয়া যাই। বহু মানবই এ কথার মহামূল্য জীবনে অনুভব করে না। জগতে অনেক লোকই দেখিতে পাওয়া যায়

যাহারা আহার বিহার বা ভোগ বিলাসাদি সাধন করিতে পারিলেই মানব-জীবনের—মানব-জন্মের সার্থকতা সাধিত হইল বলিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। অনেকেই কোনরূপে অর্থ সম্পদাদি উপার্জ্জন করিয়া, কোন রকমে ভোগ-সাধ চরিতার্থ করিতে পারিলেই, আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে। তদুপরি যদি মান যশ তাহার উপর কিছু লাভ করিতে পারে, তবেই তাহাদের পক্ষে সোণায় সোহাগা পড়িল—মণি কাঞ্চন সংযোগ ঘটিল! বিদ্যা যে কি সামগ্রী—জ্ঞান যে কি অপূর্ব্ব সুধা—সে কথা তাহারা জানিতে বুঝিতে পারে না—জানিতে বুঝিতে চায়ও না। প্রকৃতপক্ষে ইহারাই তো এ সংসারে নরাকারে পশু। যত অর্থ বা সামর্থ্যবান তাহারা হউক না কেন, প্রকৃত মনুষ্যপদ-বাচ্য তাহারা নহে—প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারীও তাহারা হইতে পারে না।

আশুতোষ, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য—বিদ্যাশিক্ষার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যায় অনুরাগ—বিদ্যা-অনুশীলন যে আশুতোষের স্বভাবধর্ম্ম। আশুতোষের বিদ্যাশিক্ষার জন্য, বাহিরের ব্যবস্থা করা নিতান্তই অনাবশ্যক।

আশুতোষের পিতা-আশুতোষের জন্য এক টাকা আট আনা পুরস্কারের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আশুতোষের ন্যায় বিদ্যানুরাগী আজন্ম-বিদ্যারত বিদ্যাব্রত ছাত্রের পক্ষে তাহা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। আশুতোষ যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে—কর্ম্ম জীবনে এদেশে সকল কর্ম্মী অপেক্ষা প্রধান ছিলেন তেমনি

পঠদ্দশায় সকল ছাত্র অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কি নিজ বিদ্যালয়ে—কি বাহিরের অপর বিদ্যালয়ে—সর্ব্বত্রই আশুতোষ তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সত্যই অমানুষিক-রূপে প্রতীয়মান হইত। এইরূপ ব্যক্তিগত বিদ্যাই দৈব-বিদ্যা বা অসাধারণ-প্রতিভা বলিয়া এদেশে পরিপূজিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা যথার্থ মহাপুরুষরূপে মানব-সমাজের মহাকল্যাণ সাধন করিতে আইসেন, তাঁহারাই এইরূপ দৈব-বিদ্যা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়া থাকেন। মহাপুরুষ আশুতোষ, উচ্চ-বিদ্যার অধিকারী আশুতোষ, এ দেশের উচ্চ-বিদ্যার সংস্কার সাধনে—সম্প্রসারণে ও সংবর্দ্ধনের জন্য আসিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে বিদ্যা-অর্জ্জন যে তাঁহার পক্ষে সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মস্বরূপ।

আশুতোষ প্রতিবর্ষেই প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রায় সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া, উত্তীর্ণ হইতেন।

আশুতোষের এই অধ্যয়ন-অবস্থায় একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জানি না কথাটা কতদূর সত্য। তবে আশুতোষের পক্ষে উহা কিছু অসম্ভব নহে।

একবার ক্লাসে একটা গণিতের অঙ্ক লইয়া বহু ছাত্র কয়দিন ধরিয়া সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল। অঙ্কটি একটি বিবাহের বরযাত্র-উপলক্ষে ঠকাইবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। বরযাত্র-ঠকানো এমন বহু শুভঙ্করী-অঙ্ক তখন বড় প্রহেলিকা-বিশিষ্ট

বলিয়া লোকের বড় ভয়ের সামগ্রী ছিল। বহু গণিত-বিদ্যা-বিশারদ সেই সকল জটিল-অঙ্কের নিকটে যাইতে সাহস করিত না।

আশুতোষ সেই সময় কয়দিন অসুস্থতার জন্য ক্লাসে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আশুতোষ সুস্থ হইয়া ক্লাসে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বহু ভাল ভাল ছেলে অঙ্কটি লইয়া কয়দিন হইতে মস্তক খনন করিতেছে। আশুতোষ উপস্থিত হইয়াই অঙ্কটি অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই অতি বিশদভাবে সেই জটিল অঙ্ক সমাধান করিলেন।

এতো অল্পসময়ের মধ্যে অমন কঠিন অঙ্কের সমাধান, অল্প বয়স্ক বালক আশুতোষের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই সকলে অনুমান করিয়াছিল। আশুতোষের অসাধারণ শক্তি—গণিত-শাস্ত্রে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতার কথা অনেকেই জানিত। তাই স্কুলের শিক্ষকগণ ও আরও অনেকে মনে করিয়াছিলেন—অনেকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন—যদি কোন ছাত্র এই জটিল অঙ্ক সমাধান করিতে পারে, তবে তাহা একমাত্র আশুতোষের পক্ষেই সাধ্য সম্ভবনীয়। এক্ষণে সকলে আশুতোষের সেই অসাধারণ কৃতকার্য্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

আশুতোষ যে কেবল গণিতেই এমন পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে। তিনি অনেক বিষয়েই দক্ষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই অসাধারণ প্রতিভা ইংরাজী-সাহিত্য ক্ষেত্রেও

প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনা যায় তিনি নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন-কালে কবিবর কাম্বেলের বহু ছত্র মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

একজন শিক্ষক, তখন আশুতোষের অসাধারণ অমানুষিক মানসিক-শক্তি দেখিয়া নাকি বলিয়াছিলেন—'মনে করিলেই বড় ছেলে তৈয়ারী করা যায় না।'

শিক্ষক মহাশয়ের একথার মূলে যে এক অতি গুঢ় সত্য নিহিত আছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বাস্তবিক ইচ্ছা করিলেই কি সকল ছেলেকে শ্রেষ্ঠ-মানুষে পরিণত করা যায়? ইচ্ছা করিলে অথবা যত্ন করিলেই কি সকল ছেলেকে শিক্ষিত করা যায়? ইচ্ছা করিলেই কি সকল মনুষ্যের মধ্য হইতে মনুষ্যত্বের বিকাশ করা যায়? তাহা যায় না। কেন যায় না? ইহা অবশ্য মানব-তত্ত্বের একটা অতি দুর্বিজ্ঞেয় জটিল-তত্ত্ব।

এক আর একে দুই হয় ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নিশ্চয়ই। চুন আর হলুদ একত্র সংযোগ করিলে, লাল হইয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক বিধানের এক অলঙ্ঘনীয় বিধান। কিন্তু একই প্রকার নিয়মে—একই অবস্থায় রাখিয়া দুইটি মানুষকে কখনই সমান-ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারা যায় না। ইহার কারণ কি? কারণ মানব জড় নহে। জড়-মস্তিষ্ক লইয়াই মানুষ মানুষ হয় না। জড়দেহ—জড়ভাব ছাড়া আরও একটা খুব বড় জিনিস মানুষের মধ্যে মহৎ উপাদানরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেইটাই মানুষের মহৎ-শক্তি—উহাই মানবের মানব-শক্তি—আত্মিক-

শক্তি। তাই কেবল দেহের বলে মানুষ কখন শ্রেষ্ঠ-মানুষ হইতে পারে না। একই সময়ে—একই অবস্থায়—একই পিতা-মাতার নিকটে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া, যদি একই শিক্ষক দ্বারা ঠিক একই ভাবে শিক্ষিত হয়, তবুও দুই ভাই কখনই বিদ্যাবুদ্ধিতে সমান হয় না—কখনই সমান হইতে পারে না। জড়-বিজ্ঞান—বাহ্য জ্ঞান বিজ্ঞান এখানে সম্পূর্ণ বধির অন্ধ। সে এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিপতিত—কিছুই স্থির করিতে পারে না। জড় বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, মানুষকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিদ্যা প্রদান করিতে—তাহার মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত করিতে—সে নিতান্তই অক্ষম।

যে বড় হয় সে সত্যই স্বীয় শক্তিতেই বড় হইয়া থাকে। তাহার প্রতিভা-প্রভা আপনি ফুটিয়া পড়ে। সে প্রতিভার সৌরভ আপনি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়।

আশুতোষ স্বীয় শক্তিতে—নিজ প্রতিভার বলে বাল্যকাল হইতেই বিশেষ বড় হইয়াছিলেন—শিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষার কথা সকল দিকে স্বতঃই ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল। আগুন কখন ভস্মে আচ্ছাদিত থাকে না। আশুতোষকে যে দেখিত, সেই তাঁহার অসাধারণ শক্তিতে বিমোহিত হইত। প্রতিভা প্রভা যেন তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া বাহির হইত।

নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত সকলেই আশুতোষের শক্তি ধরিয়া ফেলিত। একবার কাশীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

সহিত আশুতোষের পরিচয় হয়। আশুতোষ তখন মথুরা হইতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় অসিতেছিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে মহাপুরুষ ছিলেন। সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মার সূক্ষ্মদৃষ্টি, আশুতোষকে দেখিবামাত্রেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধির প্রাবর্ষ্য সহজেই বুঝিতে পারিল। তিনি আশুতোষকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, আশুতোষ চিরদিনই নির্ভীক কুণ্ঠাহীন ছিলেন। তাঁহার বিনয় সুশীলতা কখনই তাঁহার তেজস্বী প্রকৃতিকে ভীত-ভাবাপন্ন করিতে পারে নাই। তিনি অতি শৈশব অবস্থা হইতে বীর্য্যবান বীরপুরুষের ন্যায় সদা ভয়হীন তেজীয়ান পুরুষ ছিলেন।

এমন অনেক বালক, অনেক লোক আছে যাহারা স্বভাবত ভীরু। স্বভাব তাহাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত করিয়া রাখে। তেমন ভয় বা সঙ্কোচ কখন প্রকৃত বিনয়ের লক্ষণ নহে। উহা ভীরুতা কাপুরুষতারই ভাবান্তর। আশুতোষ, তেমন ভাবাপন্ন ভীরু-বিনয়ী ছিলেন না। তিনি সততই প্রবল ধৈর্য্য বীর্য্য-সম্পন্ন পুরুষসিংহ ছিলেন। এই নির্ভীকতা হইতেই তিনি বিখ্যাত সম্মান-সূচক 'বঙ্গ-ব্যাঘ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীর পক্ষে—ভীরু পদানত গোলামের জাতির পক্ষে—ইহা নিশ্চয়ই গৌরবের উপাধি।

কাশীধামে আশুতোষকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পরম প্রীত হইলেন। আশুতোষকে অনেক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বিদ্যাসাগর লোক-চরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। আশুতোষকে দেখিয়া—তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। নির্ভীক আশুতোষের কোথাও কাহারও নিকট ভয় বা কুণ্ঠা ছিলনা। বিদ্যাসাগরের বিশ্ব-বিশ্রুত নাম যশ তিনি ভালই জানিতেন। তাঁহার সম্মুখে সকলেরই শির স্বতঃই অবনত হইয়া পড়িত। বিনয়ের আধার আশুতোষ বিদ্যাসাগরকে নত-শিরে অভিবাদন করিলে, তিনি আশুতোষের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইবার জন্য নানাভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

আশুতোষের মহাবিখ্যাত পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বঙ্গের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি তখন বঙ্গের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিভাবান আশুতোষ তাঁহারই পুত্র জানিয়া বিদ্যাসাগর পরম প্রীত হইলেন।

আশুতোষের বিদ্যা ও শিক্ষা সম্বন্ধে কৌশলে তিনি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। নির্ভীক আশুতোষ বিনীতকণ্ঠে সকল কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন।

আশুতোষের কথাবর্ত্তা শুনিয়া অসাধারণ বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই বুঝিলেন—'এ ছেলে বড় সহজ ছেলে নয়।'

আশুতোষ প্রথমাবধিই দেশীয়-বিদ্যায় জাতীয়-ভাষায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি 'সংস্কৃত ভাষাকে' স্বদেশীয় বিদ্যা স্বজাতীয় জ্ঞানের আকর বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। অপর বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে তিনি যেমন যত্নবান ছিলেন, সংস্কৃত ভাষা অধিগত করিবার জন্য তিনি তেমনি ব্যগ্র ছিলেন। উন্নত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতেন। বিদ্যাসাগর আশুতোষের কথাবর্ত্তায় তাহা বুঝিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর, আশুতোষের শিক্ষার কথা ও বিদ্যানুরাগের কথা শুনিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়া নানাপ্রকার উপদেশ বাক্যে আশুতোষকে উৎসাহিত করিলেন।

আরও একবার আশুতোষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহা অধ্যয়ন-শীল পুরুষ ছিলেন। জগতের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। তাঁহার নিজ লাইব্রেরী তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়-নিদর্শন। পুস্তকগুলি যেন তাঁহার সজীব সহচর ছিল। যাঁহারা তাঁহার বড় বড় আলমারি বোঝাই পাঠাগার দেখিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল আলমারির মধ্যস্থ অমূল্য গ্রন্থ সমূহ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানিয়াছেন যে পুস্তকগুলি তাঁহার কি আদরের সামগ্রী—প্রাণের অতি প্রিয় পদার্থ ছিল। যে সকল সাধারণ বা সামান্য পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরিতে স্থান পাইয়াছে, তাহারাই নূতন সাজের সজ্জা লাভ করিয়াছে। তাঁহার সকল পুস্তকই প্রায় মরক্কো বাইণ্ডিংএ

সজ্জীভূত ছিল। সে সকল পুস্তকের যত্ন পারিপাট্যই বা কত!
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার লাইব্রেরির পুস্তকগুলিকে এতই
ভালবাসিতেন, যে তাহাদিগকে সত্যই সজীব সহচর জ্ঞানে যত্ন
সেবা করিতেন। এমন কি স্বহস্তে পুস্তকগুলির গায়েরধূলি
আবর্জ্জনা প্রায় সকল সময় ঝাড়িয়া দিতেন। অনেকে অনেক
সময় তাঁহাকে এইরূপ পুস্তক সাফাই করা কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিতে
দেখিয়াছে। যখন তিনি নিজ লাইব্রেরিতে বসিয়া অধ্যয়নে
ডুবিয়া যাইতেন, তখন সত্যই তাঁহাকে যোগধ্যানে নিমগ্ন
যোগীর ন্যায় বোধ হইত। এমনই তাঁহার অধ্যয়ন সাধনা ছিল।

আশুতোষও সেই একই পথের পথিক ছিলেন। তিনিও
জন্মাবধি অধ্যয়ন-ব্রত পুরুষ ছিলেন। তিনিও নিজ পাঠাগারে-
জগতের বহু অমূল্য গ্রন্থ বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া সংগ্রহ
করিয়াছিলেন।

পুস্তক ক্রয় করিবার সময় আশুতোষের অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত
ছিল না। যে পুস্তক তিনি ক্রয় করিবেন বলিয়া মনস্থ করিতেন,
তাহার জন্য যত অর্থই ব্যয় হউক না কেন, তাহাতে তিনি
কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। অধ্যয়ন আশুতোষের এক
পরম সাধনা ছিল।

আশুতোষ জানিতেন যে নিজের অধিকারের মধ্যে না
রাখিতে পারিলে, কোন মহৎ-গ্রন্থ সুচারুরূপে অধ্যয়ন করা যায়
না। প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ একবার বা দুইবার
মাত্র পাঠ করিলে প্রকৃতভাবে আয়ত্ত করা যায় না। অনেকবার

—বারবার পাঠ করিয়া, তেমন পুস্তকস্থ বিষয় আয়ত্ত করিতে হয়। উপাদেয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ অবশ্য অতি নিগূঢ় তত্ত্বে পরিপূর্ণ। কতবার অনুশীলন আলোচনা করিয়া সে সকল পুস্তকের বিষয় পরিপাক করা যায়। বহুবার—বারবার না পড়িলে সে সকল সারতত্ত্ব-সমাকীর্ণ-গ্রন্থে অধিকার লাভ করা ঘটে না। গ্রন্থের অন্তর্গত জটিল তত্ত্ব, যাহা অধিকার করিতে হইলে, বিশেষ বিচার ও চিন্তা করিতে হয়, তাহাদিগের পার্শ্বে বা নিম্নে দাগ করিয়া রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজনমত তাহাদের যেন আলোচনা অনুশীলন করা যাইতে পারে, এইরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখা নিতান্তই আবশ্যক।

বাস্তবিক যাঁহারা অধ্যয়ন-ব্রত ধারণ করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন—জগতে পরম পণ্ডিত বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই সযত্নে পুস্তক রাশি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছেন। পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজনীয় পত্র বা ছত্র বিশেষ বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন।

আশুতোষ, জীবনব্যাপী অধ্যয়ন-ব্রতধারী ছিলেন। বাল্য-কাল হইতেই অধ্যয়নে তাঁহার পরম প্রীতি অনুভব হইত। তিনি সর্ব্বসময় পুস্তক সংগ্রহে প্রবৃত্ত রহিতেন।

বিদ্যাসাগরও স্বয়ং একজন প্রধান পুস্তক-সংগ্রাহক ছিলেন। এদেশে থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির দোকান বিখ্যাত পুস্তকের দোকান বলিয়া সাধারণে পরিচিত। যাঁহারা উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাঠে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রায় এই দোকানে আসিয়া পুস্তক ক্রয় করেন।

বিদ্যাসাগর পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য এই দোকানে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে আবার আশুতোষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাসাগর আশুতোষকে কিছুকাল পরে আবার দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। উভয়ের অনেক কথা বার্ত্তাই হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, আশুতোষের বিদ্যা ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আশুতোষ, তাঁহার জিজ্ঞাসাবাদে যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁহার অদ্ভুত শিক্ষায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। আশুতোষের কথায় বিদ্যা-অনুরাগী, বিদ্যাগতপ্রাণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তিনি যে আশুতোষকে কি দিবেন, কি দিয়া তাঁহার হৃদয়ের-আগ্রহ চরিতার্থ করিবেন, তাহা যেন সহসা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এতই প্রবল বেগে, আশুতোষের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি-উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিয়াছিল।

আশুতোষ কেবল গণিত বিজ্ঞানে অনুরাগী ছিলেন না। উচ্চ সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি ছিল। সূক্ষ্মদর্শী, হৃদয়জ্ঞ বিদ্যাসাগর তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন।

তিনি কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া, স্থির করিলেন এরূপ বিদ্যানুরাগী ছাত্রের হস্তে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ স্নেহ-উপহার স্বরূপ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাবনার কথা—বিচারের বিষয় হইল—কি পুস্তক প্রদান করা কর্ত্তব্য ও উপযুক্ত।

ইংরাজী সাহিত্য-জগতে 'রবিন্সন ক্রুসো' একখানি অতি

অপূর্ব্ব উপাদেয় গ্রন্থ। কি ভাষার মাধুর্য্যে—কি ভাবের সৌন্দর্য্যে —এক কথায় কাব্য-কলা অংশে উহা ইংরাজীর এক অপূর্ব্ব রত্ন সম্পদ বিশেষ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঐ উপাদেয় গ্রন্থখানি আশুতোষের হস্তে প্রদানের যথার্থ উপযুক্ত সামগ্রী বলিয়া স্থির করিলেন। উৎকৃষ্টরূপে বাঁধাই-করা একখানি 'রবিনশন ক্রশো' সেই দোকান হইতে ক্রয় করিয়া, পরম সমাদরে তিনি আশুতোষকে স্নেহ-উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন ও প্রাণভরিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ অর্পণ করিলেন।

ভারতের পণ্ডিতপ্রধান বিদ্যাসাগর-দত্ত উপহার-গ্রন্থ আশুতোষ অতি বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। আশুতোষ অতি যত্নের সহিত গ্রন্থখানি নিজ পুস্তকাগারে রক্ষা করিলেন। সেই পুস্তকখানি অদ্যাপি অতি যত্নের সহিত তাঁহার সেই বিস্তীর্ণ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

একটা সাধারণ প্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে। প্রবাদটি চলিত-কথায় বলে—'রতনে রতন চেনে।' পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যা-আকরের এক অমূল্য নিধি—মহারত্ন ছিলেন। আশুতোষও সেই বিদ্যাআকরেরই আর এক অতি দুর্ল্লভ নিধি—পরম রত্ন। এমন রত্নদ্বয়ের একত্র সম্মিলন একটা যেন শুভযোগের ফল বিশেষ।

বিদ্যাসাগর যখন দেশ বিদেশে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তখন আশুতোষ বিদ্যালয়ের একজন

ছাত্র। উভয়েই কিন্তু একই ক্ষেত্রে একই পন্থার অনুগামী পথিক।

বিদ্যাসাগর যেমন নিজে মহাবিদ্বান পরম পণ্ডিত হইয়া, দেশের বিদ্যা-উন্নতির জন্য—জাতীয়-শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আশুতোষও সেইরূপ স্বদেশীয়দিগের জন্য—স্বজাতীয়-ব্যক্তিবর্গের জন্য উচ্চ শিক্ষার—উৎকৃষ্ট বিদ্যার দ্বার উন্মোচন করিতে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। যেন দৈবযোগে উভয়ের এই বিদ্যা-বিপণিতে সম্মিলন-সুযোগ সংঘটিত হইয়াছিল। তখনই—সেই শুভ মুহূর্ত্তেই যেন উভয়ে উভয়কে জানিয়াছিলেন চিনিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তো চিরদিনই শিক্ষক। তিনি শৈশবে—যৌবনে—প্রৌঢ়ে—বার্দ্ধক্যে যেমন আপনি আপনাকে শিখাইয়াছিলেন—তেমনি চিরদিনই অপরকেও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার সুযোগে জীবনে অবশ্য কত শিক্ষার্থী ছাত্রেরই সংস্পর্শ-সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কয়জন ছাত্রকে তিনি এইরূপ অল্পসময়ের মধ্যে এমন ভাবে চিনিয়া লইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন? অবশ্য বহু ভাল ভাল ছেলে তিনি বহুস্থানে, বহুবার দেখিয়াছিলেন—বহুবার তাহাদিগকে জানিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু কৈ—এমন ছেলে বোধ হয় যেন তিনি জীবনে আর কখন দেখিতে পান নাই। তাই দেখিবামাত্র আপন হাতে পুস্তক কিনিয়া, আপন হাতে তখনই হৃদয়াকর্ষক ছাত্রের হাতে প্রাণের প্রীতি-উপহার প্রদান করিলেন ও নিজে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব

করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। আশুতোষের অসাধারণ প্রতিভা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে সকলেরই নিকট প্রতিভাত হইয়া পড়িত। বিদ্যাসাগর তো অতি অসাধারণ মহাপুরুষ। তাঁহার নিকট কি আশুতোষের অসাধারণ প্রতিভার প্রদীপ্ত-শিখা লুকাইয়া থাকিতে পারে?

এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের কথা আশুতোষ জীবনে কখন ভুলিতে পারেন নাই। যখনই কোথাও কোন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত, আশুতোষ তখনই সেই মহাপুরুষকে সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। সেইজন্যই অতি যত্নের সহিত বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত উপহার গ্রন্থখানি নিজ বিশাল পুস্তকাগারের শীর্ষস্থানে আশুতোষ রক্ষা করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

অনেকে বলিয়া থাকে—অনেকের বিশ্বাসও সেইরূপ যে 'আশুতোষ কেবল জড়-জগৎ জড়-বিজ্ঞান লইয়াই বিভোর থাকিতে ভাল বাসিতেন। ভাব-রাজ্যে তিনি কখন বিচরণ করিতেন না—তিনি কখন ভাবুকতার ধার ধরিতেন না।'

ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ধারণা। আশুতোষ যেমন কর্ম্মী ছিলেন, তেমনি রসগ্রাহী ভাবগ্রাহী মহামনস্বী ছিলেন। তিনি জড়জগতের কর্ম্মে, সংসারের কার্য্য-সাধনে যেমন ব্যস্ত ও ব্যগ্র থাকিতে ভালবাসিতেন, অধ্যাত্ম-জগতে—ভাব-রাজ্যে ভ্রমণ করিতেও হৃদয়ে তেমনি আনন্দ উপভোগ করিতেন।

আশুতোষ জীবনের সাধনায়—জগতের কার্য্যে যেমন আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন, তেমনি আধ্যাত্মিক-ব্যাপারে—জ্ঞান ধর্ম্ম-অনুশীলনেও বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন! পূর্ণ মনুষ্যত্ব অভি-ব্যক্তির জন্য যে উভয়বিধ অনুশীলন প্রয়োজন, সেই আত্মিক ভৌতিক উভয় তত্ত্বই তাঁহার পরিচর্চ্চার আধার-ক্ষেত্র স্বরূপ ছিল। তবে তিনি কর্ম্মহীন অলস ভাবুক হইয়া—কল্পনারাজ্যের আকাশ-কুসুম লইয়া ব্যগ্র থাকিতে পারিতেন না। তিনি মানব জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম—জগৎ-সংসারের শুভ-সাধনের জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহার সাধনায় যথার্থই আত্মোৎসর্গ করিয়া-

ছিলেন। কর্ম্মের যাহা সূক্ষ্ম সারতত্ত্ব, তাহা তিনি জীবনে বুঝিয়া লইয়াছিলেন,—তাহাই সাধনার জন্য জীবন-যজ্ঞে ব্রতী হইয়া ছিলেন।

গীতায় ভগবানের আদেশ—

'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ।'

অর্থাৎ 'তুমি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল।

প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিত এই বাক্যের বিকৃত ছায়া ধরিয়া বলিয়াছেন।

'Work is an evil, but it is necessary to avoid greater evil.'

একটা কথা মনুষ্য-জীবনের পরিপক্ক-অবস্থায় অবশ্যই উদয় হয়—'এই জগৎ—এই জীবনই বা কেন? এই জীবনের কর্ম্মই বা কি?'

এই জিজ্ঞাসায় হিন্দুর দার্শনিক-ধর্ম্ম উত্তর দিয়াছে—গীতাও সেই উত্তরই পরিপোষণ করিয়া বলিয়াছেন "কর্ম্মের ক্ষয় করাই কর্ম্মের উদ্দেশ্য।"

এই উত্তরে আবার কথা জন্মে—যদি কর্ম্ম ক্ষয় করাই কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে কর্ম্মের আদৌ প্রয়োজনই বা কি? ভগবানের লীলা ভিন্ন এ কথার আর কোন উত্তর দেওয়া চলে না। বাস্তবিক জগৎ-জীবন—জীবনের কর্ম্ম—এ সকল ভগবানের বাসনা—ভগবানেরই লীলা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায়

না। মানুষের বুদ্ধি তাহা ব্যতীত আর কিছুই নির্দ্ধারণ করিতেও পারে না।

কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মকে ধ্বংস করাই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু, স যুক্ত কৃৎস্ন কর্ম্ম কৃৎ॥"

কর্ম্ম ধ্বংস করিয়া নিশ্রয়েস, মহামুক্তি বা পরমানন্দ লাভ করাই যে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই।

আশুতোষ এ কথার সত্যতা সারবত্তা প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করিয়াছিলেন। মধুপুরে অবস্থান কালে, আশুতোষ প্রাণের সহিত বলিয়াছিলেন—সে সার কথা।

একজন আশুস্তোষের পরমভক্ত আশুতোষকে কহিলেন—"আপনি বর্ত্তমান বঙ্গের মহাপুরুষ। আপনার মত মহাপুরুষের জীবনই সার্থক—ধন্য।"

আশুতোষ উচ্চহাস্যে কহিলেন,—'এমন আশুতোষ বহুবার হ'তে হ'লেই হয়েছে আর কি! না জানি—কতবারই বা এমন আশুতোষ সেজে যাওয়া আসা করতে হবে।"

কথাটা মহাসাধু মহাজনের বৈরাগ্য-বাণী বা মহাকবির করুণ-রসাত্মক কাব্য-কথা!

আশুতোষ কেবল জড়-জগৎ—স্থূল-সংসার বা স্থূল-কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসিতেন কে বলে?

আশুতোষ বাহিরে যেমনই বিষয়ী বা ভোগীপুরুষ থাকুন না কেন—অন্তরে অন্তরে তিনি মহা বৈরাগ্য-বিশিষ্ট বিবেকবান মহাযোগী ছিলেন। এ জগত—এই সংসার—এই সংসারের ভোগ-ঐশ্বর্য্য যে নিতান্তই বায়স্কোপের বাজি তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তবে জীবনে ধর্ম্মের যে নিতান্তই প্রয়োজন—উহাই যে ভগবানের নির্দ্ধারিত সাধন—জীবনের অলঙ্ঘনীয় বিধান, তাহাও তিনি বেশ জানিতেন—বুঝিতেন।

আশুতোষ কর্ম্মক্ষেত্রে যেমন কর্ম্ম-পথের পথিক ছিলেন, তেমনি অধ্যাত্ম-পন্থারও অনুরাগী মহাসাধক ছিলেন। কর্ম্মযোগী ভাবুক, অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ ছিলেন আশুতোষ।

ভাবরস তাঁহার মহৎ-জীবনের একশ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল। যিনি তরুণ-বয়সে কবিবর ক্যাম্বেলের বহু কাব্য-শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন—অনর্গল আবৃত্তি করিতেন, তিনি কখনই রসহীন ভাবহীন কঠোর কর্ম্মী মাত্র ছিলেন না।

তাঁহার কাব্যপ্রীতি, সৌন্দর্য্যানুরাগ, ভাবুকতা বাল্যকালেই বিকশিত হইয়াছিল। তিনি যখন বাল্যকালে গাজিপুরে, মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, তখনই তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

গাজীপুর, মুসলমান রাজত্ব-কাল হইতে ভারতের এক অতি বিখ্যাত স্থান। বহু মুসলমান-নবাব আপন আপন রাজ্যের কেন্দ্রস্থানরূপে ইহাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমান-সময়ে যখন আতর গলাপজলাদির বিশেষ সমাদর

এদেশে সংবর্দ্ধিত হয়, তখন এই গাজিপুরই সেই সকল সখের সামগ্রী উৎপাদনের জন্য আরও বিখ্যাত হইয়াছিল। সেইজন্ত এখানে বহু গোলাপ-বাগান স্থাপিত হয়। সেই সকল গোলাপ-বাগিচায় কত দেশ বিদেশের বিবিধ জাতীয় সৌরভ সৌন্দর্য্য-সমন্বিত গোলাপ ফুলের লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ রোপিত হয়। সেই সকল গোলাপ-উদ্যান কি রমণীয়! যেমন তাহাদের সুমধুর সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত, তেমনি তাহাদের সুষুমা-সৌন্দর্য্যে দিক সমূহ উদ্ভাসিত। সেই সকল বাগানের নিকট গমন করিলে স্বতই মনে হয় যেন মর্ত্তে নন্দন-কাননের সন্নিধানে আসিয়াছি!

বহুদিন পূর্ব্বে আমরা একবার গাজিপুর গিয়াছিলাম। গাজিপুরের সেই সকল অপূর্ব্ব গোলাপ-বাগান দেখিয়া সত্যই বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম! কি অপূর্ব্ব সে শোভা! সত্যই যেন স্বর্গের সৌন্দর্য্য-শোভা মর্ত্তে বিরাজিত! বহুদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল গোলাপ-উদ্যান! যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত অগণ্য গোলাপ-বৃক্ষ! বহু জাতীয় বহু বর্ণের—বহু আকারের গোলাপফুল সেই সকল বৃক্ষের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। গোলাপ পুষ্প গুলির মধ্যে কোনটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত—কোনটি অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত—কোনটি কোরক-অবস্থায় যেন প্রস্ফুটনের আশয়ে উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল প্রস্ফুটিত—অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত গোলাপসমূহের উপরিভাগে—তাহাদের চারি পার্শ্বে—বহু বর্ণের বহু জাতীয় অলিকুল গুণ গুণ

রবে গুঞ্জন করিতেছে! অদূরে বিটপী-শাখে বিচিত্র বিহঙ্গকুল মধুর কাকলীতে শ্রবণ রঞ্জন করিতেছে। আরও দূরে পুণ্যতোয়া ভাগিরথী পূত-সলিল-রাশি বিশাল বক্ষে বহন করিয়া, কুল কুল ধ্বনিতে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে! সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রাতঃকালে এমন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সত্যই মনে হয় যেন ভূ-স্বর্গে ভ্রমণ করিতেছি!

আশুতোষ বাল্যকালে পীড়িত হইয়া একবার কিছুকাল এই গাজিপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন প্রায়ই প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এ সৌন্দর্য্য-সমন্বিত পরম রমণীয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। প্রাতঃকালে ভ্রমণ তাঁহার পক্ষে এক স্বভাব-জাত ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যে প্রীতি কাব্য-রসাত্মক হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ। যে প্রকৃতির সন্তান প্রকৃত মাতৃভক্ত, প্রকৃতি জননীর উপাসক, তাহার প্রেমপূর্ণ-হৃদয় কখন সে আকর্ষণের আবেগ সম্বরণ করিতে পারে না।

আশুতোষ প্রকৃতির উপাসক স্বভাবের সন্তান। আশুতোষ এইরূপ প্রাকৃতিক শোভার নিভৃত-সংস্পর্শে থাকিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন। বৈদিক-ঋষির ন্যায় তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উষা-দেবীর পূজায় আত্মনিয়োগ করিতেন।

আশুতোষ প্রাকৃতিক রস ভাবের মাধুর্য্য তন্ময়-চিত্তে উপভোগ করিতেন। তিনি উহার স্বাভাবিক অধিকারী ছিলেন।

তিনি বাল্যেই তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাই তিনি গাজিপুরে গোলাপ-বাগের ধারে বেড়াইতে বড় ভাল বাসিতেন।

তিনি যখন মথুরায় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গমন করেন, তখন সুনীল সলিল-বাহী বংশী-বট-তট-সমাকুলা যমুনাতীরে ভ্রমণ করিতে পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। সে ভ্রমণে না জানি কি অপার্থিব স্বর্গসুখ তিনি পবিত্র হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে উপভোগ করিতেন!

যে বৃন্দাবন এককালে মর্ত্তে গোলকের মধুর-লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল, তাহার অনুপম শোভা ভাবুক-ভক্ত ভিন্ন আর কাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে পারে? আশুতোষের সুকোমল বাল্য-হৃদয় সত্যই সে শোভায় বিমোহিত হইয়াছিল। তিনি তখনও যমুনা-পুলিনে ভ্রমণ করিতে বড় ভালবাসিতেন।

জীবনের শেষ অবস্থায় মধুপুর প্রভৃতি প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদের লীলাক্ষেত্রে তিনি প্রাণের আবেগে ছুটিয়া যাইতেন। সেই সকল স্থানে নির্জ্জন নিভৃত প্রদেশে প্রাকৃতিক শোভার সাহচর্য্য করিতে—তাহার সঙ্গ সম্ভোগ করিতে কতই না আনন্দ উপভোগ করিতেন! এ সকল আশুতোষের কবি-হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রকৃতি-পূজার ফল।

কে হেন ভক্ত ভাবুক পুরুষ আশুতোষকে স্থূলদর্শী স্থূল কাজের লোক—**Matter of fact man.** বলে?

আশুতোষ কলাবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কলা-

বিদ্যার অনুশীলন জন্য তিনি যে কেবল প্রতীচ্য ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন এমন নহে। তাঁহার সমজদার প্রাণ বুঝিয়াছিল বিদেশে যাহাই থাকুক—বিদেশীর নিকট যতই পাওয়া যাউক—নিজের দেশে নিজের ঘরে নিজের লোকের নিকট হইতে যে শিক্ষা যে সৌন্দর্য্য পাওয়া যায়, প্রাণের পীপাসা তাহাতে যেমন পরিতৃপ্ত হয়, এমন বোধ হয় জগতের কোথাও নয়—মনে হয় স্বর্গও স্বয়ং যেন সে সৌন্দর্য্য-সুধা দানে সমর্থ নয়। বিশেষতঃ হিন্দুর প্রাণ যেন জন্ম-ভূমির সৌন্দর্য্য-সুধা-পানে সর্ব্বদাই উন্মুখ। শুধু হিন্দুই বা বলি কেন? ইংরাজ 'হোম' বলিতে বিভোর হইয়া পড়ে। আপন দেশের প্রকৃতি—আপন দেশের সৌন্দর্য্য—আপন জাতির শিল্পকলা কাহার না প্রাণকে আকৃষ্ট করে?

জন্মভূমি এই জন্যই স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী। জন্মভূমি এই জন্য জননী-রূপে হিন্দুর প্রাণে পূজনীয়া। তাই আর্য্য-বাক্যে বিঘোষিত হইয়াছে—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

প্রকৃতই জন্মভূমির তুল্য সর্ব্ববিষয়ে সকল ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য সুধা-ধারা আর কেহই ঢালিতে পারে না। তাই জাতীয়-সাহিত্যের কাব্যকলা যেমন প্রাণস্পর্শী হয়—— তাহাতে যেমন প্রাণ মন মাতিয়া উঠে—এমন আর জগতের কোন ভাষার কোন সাহিত্য-সম্পদ সে ভাব সে রস দিতে পারে না।

আশুতোষের ভাবগ্রাহী-হৃদয় তাহা স্বতঃই বুঝিয়া লইয়াছিল। তাই আশুতোষ ইংরাজী ফ্রান্স আদি শ্রেষ্ঠ প্রতীচ্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধিকারী হইয়াও জাতীয়-বিদ্যা কখন ভুলেন নাই। জাতীয় বিদ্যার মধ্যে—সংস্কৃতের মধ্যে যে এমন অপূর্ব্ব কাব্য-কলা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কখন অবহেলা করেন নাই। তিনি মনে প্রাণে কবির কথা বুঝিয়াছিলেন—ধরিয়াছিলেন—'নানান দেশে নানান ভাষা বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ?'

আশুতোষ গণিত বিজ্ঞানাদির সাধক ছিলেন। তেমনি কাব্য-কলার প্রতিও, বিশেষতঃ দেশীয় জাতীয় কাব্য-কলার পরম উপাসক ছিলেন। পরপদলেহী দাসের মত তিনি ইংরাজী পড়িয়া—ইংরাজী-ভাষা শিখিয়া, মাতৃভাষা জাতীয়-সাহিত্যকে অবহেলা করেন নাই ; বরং চিরদিনই তাহার একনিষ্ঠ পূজক উপাসক ছিলেন। মাতৃভাষা—দুঃখিনী-বঙ্গভাষা বঙ্গের মহাকৃতী সুসন্তান আশুতোষের নিকট যেমন ঋণী, এমন বোধহয় আর কাহারও নিকট নহে।

আশুতোষ সেক্সপিয়র, মিল্টন মুখস্থ করিয়াছিলেন—অনর্গল সে সকল কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাই বলিয়া জাতীয়-ভাষার কাব্য-কলা ভুলেন নাই—তাহা কখন অবহেলাও করেন নাই। তিনি প্রায় জীবনের বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার কাব্য-কলা অনুশীলন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উপযুক্ত

অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া, ব্যাকরণের সঙ্গে কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের শ্রেষ্ঠ কাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আশুতোষ কেবল যে সংস্কৃত-কাব্য অনুশীলন করিতেন এমন নহে! কাব্যের সহিত হিন্দুশাস্ত্রে মনু যজ্ঞবল্ক প্রভৃতির ব্যবহার-বিধান ও দায়ভাগ মিতাক্ষরা বিধান অধিগত করিয়াছিলেন। আশুতোষ, হিন্দুশাস্ত্রের বহু তত্ত্ব সংস্কৃত কাব্যের বহু বচন আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাই বেদ-সভা প্রভৃতি হিন্দুর ধর্ম্ম-সম্মিলনীতে বক্তৃতা-ব্যপদেশে বিশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বঙ্গভাষায় ও সংস্কৃত-সাহিত্যে অনুরক্ত হইয়াছিলেন—উভয় ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যে এমনই ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে ব্যাকরণের জটিল প্রশ্নও সমাধান করিতে পারিতেন। একবার সংস্কৃত-ব্যাকরণের পুনঃ সংস্করণ সম্বন্ধে কলিকাতা উনিভার-সিটিতে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তাহাতে এ দেশের দুইজন প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন! একজন ছিলেন পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বহুবল্লভ শাস্ত্রী মহাশয়, আর একজন ছিলেন পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিয়াছিলেন যে কার্য্যটি সামান্য বা সহজ নয়। এই কার্য্য লইয়া তাঁহার সহযোগী পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত মতভেদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সে গোলযোগ উপস্থিত হইলে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে।

এই ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। কথাটি আশুতোষের নিকট তিনি উপস্থিত করিলেন। আশুতোষ কহিলেন—'যদি তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন মতভেদ ঘটে তবে তাহা যেন তাঁহার নিকট উত্থাপন করা হয়। আশুতোষ নিজেই তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আশুতোষের সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিজে অবশ্যই তাঁহারও নিজের ক্ষমতা বুঝিতেন। নতুবা এমন কথা কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন না। একে সংস্কৃত-ব্যাকরণের ব্যাপার নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। সেই ব্যাপার লইয়া দুই মহাপণ্ডিতের মধ্যে মতভেদের সম্ভাবনা। সে মতভেদ দূরীকরণ করিয়া, জটিল প্রশ্ন সিদ্ধান্ত করিবার জন্য স্বয়ং আশুতোষ অগ্রসর হইলেন। বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে তিনি কখনই এরূপ কার্য্যে সাহসী হইতেন না। না জানিয়া—না বুঝিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা, কখনই তাঁহাব স্বভাব-সঙ্গত ধর্ম্ম ছিল না।

যাহা হউক প্রসঙ্গত এখানে অন্য কথা উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা আশুতোষের কলা-বিদ্যায় অনুরাগের কথা বলিতে-ছিলাম। তিনি যে সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিখ্যাত কবি স্বর্গীয় ডি এল রায়ের পুত্র ললিত কলা-বিশারদ শ্রীমান দিলীপ কুমার রায় মুক্তকণ্ঠে আশুতোষের সঙ্গীত-প্রিয়তা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

শুনিয়াছি শ্রীমান দিলীপ কুমার রায় সঙ্গীত-কলায় বিশেষ কৃতীত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি দেশীয় বিদেশীয় বহু জাতীয় সঙ্গীত-তত্ত্বের সূক্ষ্মমর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। এদেশে যাহাতে সঙ্গীতের সমুন্নতি সম্প্রসারণ ঘটে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টাও করিতেছেন।

একসময়ে এই ভারতে বহু প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত সঙ্গীত-কলারও যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার বহু নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তানসান (ত্রিলোচন মিশ্র) ব্রজবাওরা প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ গায়কগণ নিজ নিজ সঙ্গীত-প্রচারে বহু সভাস্থল—এমন কি দিল্লীর বাদশাহ-দিগের দরবার পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, তখন এদেশের সঙ্গীত-কলার কতই উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাস্তবিক এদেশে সঙ্গীতের রাগ রাগিনী আলোচনা করিলে, তাহাদের গুঢ় মর্ম্ম বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় কি অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক-ভিত্তির উপর হিন্দুসঙ্গীত সংস্থাপিত! ভারতের সঙ্গীত-কলা যে এক সময়ে, বহু বিজ্ঞান বিদ্যার ন্যায় সভ্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। রেখার-গন্ধ্যারাদি যে সপ্তস্বর হিন্দু-সঙ্গীতের বীজ স্বরূপ, প্রতীচ্য সঙ্গীতও সেই সপ্ত স্বরকেই মৌলিক তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া গঠিত হইয়াছে।

এইরূপ বহুকারণের সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া, বহু সঙ্গীতজ্ঞগণ অনুমান করেন, যে নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত সঙ্গীত

বিজ্ঞানও ভারত হইতে য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব বিশদরূপে মীমাংসা করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি এখন কোথা? যদি কোন শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অনুশীলন করেন, তবেই তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। শ্রীমান দিলীপ কুমার সঙ্গীতজ্ঞ সুপণ্ডিত। আশা করি তিনিই এক সময়ে এ রহস্যের সমাধানে সমর্থ হইবেন। একদা শ্রীমান দিলীপ কুমার আশুতোষের নিকট সঙ্গীত-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আশুতোষের বহু কথাবার্ত্তা হয়। দিলীপ বাবু বলেন:—শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষা প্রবর্ত্তক হিসেবে তাঁর (আশুতোষের) কৃতিত্ব সকলেই জানেন। তাই তার পুনরুক্তি আমি কর্ত্তে চাই না। এজন্য তিনি কি প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন সে সম্বন্ধেও বেশী লেখা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। আমি কেবল ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় আর্টের স্থান সম্বন্ধে যে সামান্য আলোচনা হয়েছিল তারই উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের শেষ করব—কারণ উচ্চশিক্ষার মধ্যে আর্টের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি যে কতটা সযতন ছিলেন তার খবর অনেকেই রাখেন না।

সে আজ মাত্র আট মাস আগেকার কথা। পূজার সময়ে। আমি তখন মধুপুরে। আশুতোষের ওখানে সন্ধ্যায় আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকক্ষণ গান বাজনা হইল। তাঁকে সঙ্গীতে বেশ উৎসাহী দেখে মনটা ভারি খুসি হ'ল। কারণ, আমার ধারণা ছিল যে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আমাদের অন্যান্য

বড়লোকদেরই মত—অর্থাৎ "ও একটা সখ মাত্র" গোছের। আমাদের মধ্যে কথায় কথায় উচ্চশিক্ষায় ললিত কলার (fine art) স্থান সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। আশুতোষ বল্‌লেন "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শেখাবার আমার খুবই ইচ্ছে ছিল হে! একবার চেষ্টা করেছিলাম—তাই একথা বলতে পারি।" আমি বললাম যে এটা দুঃখের বিষয়। কারণ য়ুরোপে অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়েই তারা সঙ্গীত প্রভৃতি আর্টের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছে—অথচ আমরা এ সম্বন্ধে এতই উদাসীন। আশুতোষ একটু হেসেই বল্‌লেন—'তা আর বলতে? আমাদের দেশ এ সম্বন্ধে এতই পেছিয়ে রয়েছে যে চিত্র বিদ্যায় আমি অধ্যাপনার ব্যবস্থা করার দরুণ লোকে বলে—'আমাদের গরীবের ও ঘোড়া রোগ কেন?' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাকে এজন্য কি কম গঞ্জনা সহ্য কর্ত্তে হয়েছে! তবে সে যাই হোক—সঙ্গীত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ঢোকাবই।"

সে দিন বিখ্যাত মণীষী বার্টরাণ্ড রাসেলের কথাও হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনি নাকি বার্টরাণ্ড রাসেলকে নিনন্ত্রন করেছেন? তিনি কি নিমন্ত্রন গ্রহণ করেছেন বলতে পারেন? যদি করে থাকেন ত কবে আসবেন বলুন। কারণ অনেকেই আমাকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেন।' উত্তরে আশুতোষ বল্‌লেন "নিমন্ত্রণ ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে পাঠিয়েছি, তবে তিনি যে কবে আসবেন তা এখনও ঠিক জানা যায় নি।" পরে একটু হেসে বল্‌লেন, "জান হে তাঁকে নিমন্ত্রণ

করার জন্যও আমাকে সেনেটে কথা শুনতে হয়েছে! সেনেটের একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক (এ প্রবন্ধে তাঁর নামোল্লেখের প্রয়োজন দেখি না) মহা আপত্তি করে উঠে বল্‌লেন, 'জানেন কি বার্টরাণ্ড রাসেল একজন সোশ্যালিষ্ট Roads to freedom ইত্যাদি বিপ্লবপন্থী বইএর প্রণেতা? তাঁকে কেন নিমন্ত্রণ করা হ'ল? আমাদের যুবক সম্প্রদায়কে তিনি কুপথে নিয়ে যাবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি', বলে আশুতোষ অল্প অল্প হাসতে লাগলেন, ভাবটা এই যে আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেই যখন এই সঙ্কীর্ণতা ও সশঙ্কতা তখন অন্যে পরে কথা।'

এর চাইতে বেশী সাক্ষী সাবুদের আর প্রয়োজন কি? তবে এখনও অনেক লোক আমাদের সমাজে আছেন, যাঁহারা আশুতোষকে অতি আনন্দের সহিত—হৃদয়ের আগ্রহের সহিত সঙ্গীত শুনিতে দেখিয়াছেন। কোন ভাল গাহনা বাজনার অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে আশুতোষ উপস্থিত থাকিলেই সে উৎসবে আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ভাল গান শুনিতে শুনিতে আশুতোষ তন্ময় হইতেন—বিভোর হইয়া পড়িতেন। এমন ব্যাপার অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আশুতোষ সত্যই চিত্র সঙ্গীতাদি ললিতকলার বিশেষ অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিত-কলার প্রবর্ত্তনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সে অনুরাগ উৎসাহের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে এদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কলা-বিদ্যার প্রবর্ত্তনা ও তাহাতে উৎসাহদান আশুতোষের পক্ষে সঙ্গত ও সমীচীন হইয়াছিল কি না, ইহা বাস্তবিকই বিশেষ বিচার ও বিবেচনার কথা।

এদেশে—হিন্দুসমাজে একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে—সেটা 'সু' কি 'কু' তাহা এখানে আলোচ্য নহে। তবে সংস্কারের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে তর্ক আন্দোলনের অবসর নাই। সংস্কারটা এই যে ছাত্র-জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতই জীবন-গঠনের এক প্রধান উপায় উপাদান স্বরূপ। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত, চিত্র সঙ্গীতাদি ললিত কলার বিশেষ পরিপন্থী। তাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা সংযম আদি উচ্চভাব সমুহ স্বতঃই শিথিল হইয়া পড়ে; অথবা উচ্চ শিক্ষা গবেষণাদির পক্ষেও বিঘ্নকর হইতে পারে। পক্ষান্তরে কলাবিদ্যার অনুশীলন, মনুষ্যের একটা শ্রেষ্ঠভাব—মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ। তদভাবে—চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির (Esthetic culture) অনুশীলনে বিষম ব্যাঘাত ঘটে। ইহা একটি বিশেষ কথা বটে।

পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপীঠে ললিত-কলার অনুশীলন বিরুদ্ধ ব্যাপার বলিয়াই বিবেচিত হইত। এখন প্রতীচ্য-প্রথা অনুসারে উহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা পূর্ব্বেই প্রচলিত হইয়াছে। ফল ভবিষ্যতের আঁধার গহ্বরে নিহিত।

অষ্টম অধ্যায়।

কি প্রাকৃতিক কি কৃত্রিম উভয় জাতীয় সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে আশুতোষের বিশেষ অনুরাগ আকর্ষণ ছিল। সে অনুরাগ আসক্তি আশুতোষের সহজাত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে অনুরাগ আশুতোষে শৈশবেই প্রকটিত হইয়াছিল।

গাজীপুরে গোলাব উদ্যানের নিকট ও বৃন্দাবনের যমুনাতীরে ভ্রমণ করিতে আশুতোষ বাল্যকালেই পরম প্রীতি অনুভব করিতেন। তাহাতেই সহজে অনুমিত হয় সৌন্দর্য্যানুরাগ আশুতোষের সহজাত এক শ্রেষ্ঠ চরিত্রাঙ্গ। এ সম্বন্ধে আশুতোষের অভাব বলিয়া যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহাদের ধারণা ঠিক সত্য নয়।

সৌন্দর্য্যানুরাগ—মধুর ভাবের প্রতি প্রাণের আকর্ষণ—মনুষ্যত্ব বিকাশের একটি প্রধান মৌলিক বীজ-স্বরূপ। শ্রেষ্ঠ-পুরুষের অন্তরাত্মায় উহা সহজাত স্বাভাবিক। যে পুরুষে মনুষ্যত্ব পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়, জীবন-তরুর আরম্ভ হইতেই তাহাতে এই বীজের অঙ্কুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে জীবনে এই বীজের সত্ত্বা পরিদৃষ্ট হয় না, সে জীবন কখনই পূর্ণতা লাভ করে না—কখনই পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে না।

জগতের সকল শ্রেষ্ঠ জীবনের ন্যায়, আশুতোষের জীবনেও ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আশুতোষ নিজে গাওনা বাজনা জানিতেন না। কেহ কখন তাঁহাকে গাহিতে বাজাইতেও দেখে নাই—চিত্র করিতেও দেখে নাই। কিন্তু তিনি যে সর্ব্ববিধ ললিত-কলার অনুরাগী উৎসাহী ছিলেন, বহু ব্যাপারে তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

উষালোকের মনোহর-মাধুর্য্য—প্রভাত গগণের গরিমাময় সৌন্দর্য্যে আশুতোষের বিশাল-হৃদয় সদাই উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরম ভক্ত উপাসক ছিলেন। শৈশব হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত প্রাতঃভ্রমণের সৌন্দর্য্য-উপভোগ হইতে কোন বাধা বিঘ্নই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

সৌন্দর্য্য অনুভূতি—সৌন্দর্য্য অনুশীলন হইতে ভক্তি-ভাব ধর্ম্মভাব—আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষণ অভিব্যঞ্জন ঘটিয়া থাকে। আশুতোষ ভক্ত-ধার্ম্মিক—আধ্যাত্মিক পথের পথিক ছিলেন; তবে তিনি ধর্ম্মধ্বজী কখনই ছিলেন না—ধর্ম্মকে ধরিয়া কখন বাহ্য-আড়ম্বর আয়োজন প্রদর্শন করেন নাই। নীরব যোগী সুন্দরের নীরব যোগ সাধনায় নিরত রহিতেন।

'শুইয়া পড়িয়া হরিনাম করিতে পারিব না'—এ কথাটা—আশুতোষের উক্তি বলিয়া শুনিতে পাই। জানি না কিম্বদন্তী কথাটার মধ্যে সারসত্য কত টুকু। এমন উক্তি আশুতোষের

হইলেও উক্তির মূলে যুক্তি যথেষ্টই আছে। শুইয়া শুইয়া আত্মোদ্ধারের জন্য আত্মনিয়োগ—আর মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য—মানব-জাতির উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ এই উভয় সাধনার উভয় সাধকের মধ্যে বড় কে—আর পরিণামে পুরস্কার কাহার ভাগ্যে অধিক সে বিচার-ভার আমাদের নিজের হাতে না রাখিয়া—ভগবানের হাতে রাখাই মঙ্গল। মহামানব প্রেমিক আশুতোষ প্রকৃতি-পূজায় জীবনের সর্ব্ব কালেই আত্ম-হারা হইতেন। সত্য শিব সুন্দরের মহাভাবে মুগ্ধ নীরব হইয়া রহিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে—পরা-প্রকৃতিকে প্রাণের পুষ্পে পূজা করিতেন। যে আশুতোষকে চিনিত, কেবল সেই সূক্ষ্ম-দর্শী জনই জানিত—আশুতোষের হৃদয় অধ্যাত্মের কি গভীর রাজ্যে বিচরণ করিত।

নবম অধ্যায়।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে আশুতোষ পীড়িত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া হইয়া তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। তথাপি তিনি কখন অধ্যয়নে বিমুখ হন নাই। সেবারে এণ্ট্রাস পরীক্ষায় আশুতোষ দুই কারণে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার এক কারণ তাঁহার পীড়া। আর এক কারণ—তখনকার পরীক্ষার প্রশ্ন-রহস্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতার অভাব।

আশুতোষ কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন না। গ্রন্থের যাহা সার তত্ত্ব, তাহা অধিগত করাই, তাঁহার অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য আশুতোষ, অধ্যয়ন-অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রথা ভালরূপে শিখিতে পারেন নাই।

তখন অনেক ছাত্র কেবল নোট পড়িয়া, কোনরকমে মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষা পাশ করিত। এখনও অনেকেই সেরূপ করে। তাই তখন হইতে পরীক্ষা-ব্যাপারে নানারূপ রহস্য সঙ্কুল বিকট ব্যাপার সংঘটিত হইতে আরম্ভ করে। শিক্ষক পরীক্ষক একই ব্যক্তি হওয়ায় পরীক্ষা-ব্যাপারে বিবিধ বিড়ম্বনা ঘটিতে থাকে। পরীক্ষক-শিক্ষকদিগের ছাত্রগণ পরীক্ষার প্রশ্ন

পূর্ব্ব হইতেই বেশ বুঝিতে পারিত। তাহারাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত। আশুতোষের সেরূপ সুবিধা কখন ঘটে নাই। কাজেই আশুতোষ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি আশুতোষ যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন সে কেবল তাঁহার নিজের গুণে—নিজের শক্তির ফলে।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে আশুতোষ জ্ঞানের জন্য, বিদ্যা লাভের জন্য পুস্তক পাঠ করিতেন। জ্ঞানই ছিল—তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। যে পুস্তক পাঠে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে—বিদ্যার অধিকার হয়—সেইরূপ পুস্তকই তিনি পাঠ করিতেন; বিশেষ বুঝিয়া—চর্চ্চা করিয়া জটিল তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিতেন। সেই সকল পুস্তকের বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেন—বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া জটিল তত্ত্ব বুঝিয়া লইতেন।

আশুতোষ জগতের সকল সভ্য সমুন্নত জাতির উৎকৃষ্ট উপাদেয় পুস্তক সমুহ অধ্যয়ন আলোচনা করিয়াছিলেন। যে কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক যখনই প্রকাশিত হইয়াছে, আশুতোষ তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিয়াছেন। আশুতোষ বেশ জানিতেন যে ভালরূপে কোন পুস্তক পাঠ করিতে হইলে, তাহার মূলতত্ত্ব অধিগত করিতে হইলে, সেই পুস্তক ক্রয় করা প্রয়োজন। তাই তিনি স্বগৃহে বিশাল পুস্তকাগর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এতো বড় পুস্তকাগর এদেশে আর কাহারও নাই। প্রায়

ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি এই নিজস্ব পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি আশুতোষের লাইব্রেরীতে আপনাদের বাঞ্ছিত পুস্তক দেখিতে পাইতেন। শুনা যায় এদেশে রাজকীয়-পুস্তকাগারে যে সকল উৎকৃষ্ট অমূল্য গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমন পুস্তকও আশুতোষের পুস্তকাগারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আশুতোষ যে কেবল ইংরাজী ফরাসি ভাষায় বিরচিত বৈদেশিক গ্রন্থ পাঠ করিতেন এমন নহে। দেশের যে কোন পুস্তক উৎকৃষ্ট উচ্চ, তাহাই আন্তরিক অনুরাগ শ্রদ্ধার সহিত তিনি পাঠ করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই রামায়ণ মহাভারতের প্রতি আশুতোষের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। শৈশবকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি রামায়ণ মহাভারত পাঠে পরম অনুরক্ত ছিলেন

অনেক স্থলে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—'রামায়ণ মহাভারত জগতের দুই অতি অমূল্য দুর্লভ রত্ন।'

মহাভারতের প্রসঙ্গ উপলক্ষে একদা তিনি বলিয়াছিলেন—'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে। অর্থাৎ যাহা মহাভারত-রূপ মহাভাণ্ডারে নাই, তাহা বিশাল ভারতবর্ষেও নাই। আমার মনে হয় কেবল ভারতবর্ষে কেন? যাহা মহাভারত-গ্রন্থে নাই তাহা জগতের কোথাও নাই। বাস্তবিক রাজনীতি, সমাজনীতি ধর্ম্ম নীতি, দার্শনিক তত্ত্ব, কলাতত্ত্ব, সংসারের কোন সার-সম্পদ মহাভারতে নাই? আশুতোষ গোঁড়া হিন্দুর ন্যায় মহাভারতের

উপাসক ছিলেন। মহাভারতকে অগাধ জ্ঞান বিদ্যার আধার বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির ন্যায় তিনি অতি অনুরাগের সহিত রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন। হিন্দুর বহু দার্শনিক গ্রন্থ বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ, উপনিষদাদি তত্ত্ব-গ্রন্থ তিনি যেমন সাগ্রহে বিচার চিন্তা সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তেমনি বাঙ্গলা ভাষার যাহা সার সম্পদরূপে সংপূজিত, সে সকল গ্রন্থও সেইরূপেই পাঠ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষা কাঙ্গালিনী বলিয়া তাহাকে কখন অবহেলা করেন নাই। বরং নিজের জাতীয়-ভাষা—মাতৃভাষা বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাব প্রতি তাঁহার জীবনের, শৈশব কাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত, বিশেষ অনুরাগ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত।

তাঁহার সমসময়ে মাইকেল, দীনবন্ধু, অক্ষয় কুমার দত্ত, হেমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বঙ্গ ভাষার প্রধান লেখক বলিয়া এদেশে বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। আশুতোষ, ইঁহাদের বিরচিত সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন।

আশুতোষের শিক্ষার প্রথম সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তখন বঙ্কিম চন্দ্র এদেশে সাহিত্য নেতা হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় সাময়িক-পত্রের প্রথম প্রবর্ত্তনা করিলেন। বঙ্গ-দর্শন নামে বিখ্যাত মাসিকপত্র প্রচার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার সাহিত্য-জগতে এক অতি

অদ্ভুত অভিনব ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখকগণ উহাতে নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। উহা বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ ভাব রস ও চিন্তাভাব সৌন্দর্য্য সমন্বিত হইয়া মাসে মাসে বাহির হইত। আশুতোষ সাগ্রহে উহা পাঠ করিতেন। বঙ্গভাষার প্রতি প্রাণের অনুরাগ, অকৃত্রিম হৃদয়ের শ্রদ্ধা আশুতোষের শৈশব অবস্থাতেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অবশেষে সেই অমৃত-অঙ্কুর কিরূপ বিশাল মহীরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই নিকট পরিজ্ঞাত।

বঙ্গভাষা যদি কোনদিন আপনার মহান ঐশ্বর্য্য-সম্পদে মহীয়সী হইয়া জগতে সমুত্থিত হইতে পারে, তবে তাহার মূলে আশুতোষের কৃতীত্ব-কথা নিশ্চয়ই উদ্ঘোষিত হইবে। বাঙ্গালা-ভাষায়, অবশ্য আশুতোষের প্রণীত কোন বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই সত্য। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে চিরদুখিনী চিরউপেক্ষিতা বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়া, তিনি মাতৃমন্দিরে মাতৃভাষার যে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুল্য অমূল্য। বহু বড় বড় লেখক লেখনী ধারণ করিয়া মাতৃভাষার যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই, আশুতোষ এই একই মাত্র কার্য্যে তাহা সাধন করিয়াছেন।

আশুতোষের পুস্তকাগার, যেমন বহু বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অধিবাস-স্থল, বঙ্গভাষার বহুসৎ উপাদেয় পুস্তকও তেমনি

তাহাতে অবস্থানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আশুতোষ দুঃখিনী বঙ্গভাষাকে কখনই উপেক্ষা অবহেলা করেন নাই।

যখন এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়িতেন, আশুতোষ তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট অনুশীলন আলোচনা করিতেন। বাঙ্গলা-সাহিত্যের ন্যায় ইংরাজী-সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

অনেকেই জানেন লর্ড মেকলে, ইংরাজী-সাহিত্যে একজন অতি শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া বিখ্যাত। ঐতিহাসিক বর্ণনার সহিত কাব্যের ভাবরস সংমিশ্রিত করিয়া তিনি যেরূপ লিপিচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমন দৃষ্টান্ত অতি অল্প সাহিত্যিকে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আশুতোষ মেকলের লিখন-ভঙ্গীতে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বর্কের বক্তৃতায় সেই কাব্য-ভাব রস উপভোগ করিয়া ভাবগ্রাহী আশুতোষ পরম পরিতুষ্ট হইতেন। তাই উক্ত দুই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রবন্ধ ও বক্তৃতা তিনি প্রায় আত্মগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি মেকলে প্রণীত ছোট ছোট প্রবন্ধ ও বর্কের বক্তৃতা অনেক স্থলে অনর্গল কণ্ঠস্থ রূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

আশুতোষ এইরূপ বহু শ্রেষ্ঠ লেখক—প্রধান প্রধান গ্রন্থকারের বহু বিষয় অধিগত করিয়াছিলেন। কিন্তু কখন পরের কথা, পরের ভাব গ্রহণ করিতেন না। আশুতোষের যেখানে যাহা অপূর্ব্ব অদ্ভুত তাহাই তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিগত। পরের

অনুকরণ তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত—নিতান্তই প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

আশুতোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। তিনি ছিলেন ছাত্র কুলের যথার্থই একচ্ছত্রা সম্রাট্। তিনি কেন পরীক্ষায় প্রথম না হইয়া দ্বিতীয় হইলেন, ইহা বড়ই রহস্যের কথা, যেমন তেমন করিয়া লিখিলেও তিনি যে সকলের উপরে স্থান লাভ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তবে কেন এমন হইল ?

আশুতোষ কেন প্রথম না হইয়া দ্বিতীয় হইলেন ? যাঁহারা আশুতোষকে জানিতেন—যাঁহারা তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও গুণ বুঝিতেন—তাঁহাদের সকলেরই মনে একটা বিস্ময় সন্দেহের আবির্ভাব হইল—আশুতোষ প্রথম না হইয়া কেন দ্বিতীয় হইলেন ? তবে তখনকার পরীক্ষা-প্রথার ভাবভঙ্গি বুঝিয়া আবার অনেকেরই সন্দেহ বিস্ময় বিদূরিত হইল। আশুতোষ হিন্দু বা হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন না—তিনি যে সাধারণ বিদ্যালয়ের 'সাউথ সুবরণের' ছাত্র।

যাহা হউক আশুতোষের প্রাণে একটু আঘাত লাগিল। তিনি কিছু দুঃখিত হইলেন। কিন্তু আশুতোষের বীর হৃদয়—কিছুতেই দমিবার নয় ? তিনি আবার পূর্ণ উৎসাহ উদ্যমের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

আশুতোষের পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা এখানে

প্রয়োজন। তাঁহার ন্যায় মহৎ ছাত্রের ছাত্র-জীবন সকল ছাত্রের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্বরূপ। তাহার অনুকরণ অনুসরণ নিশ্চয়ই পরম সুফলপ্রদ।

আশুতোষ চিরদিনই উপন্যাস-গ্রন্থে বিশেষ আসক্ত ছিলেন না। ছাত্রজীবনে তিনি যতদূর সাধ্য উপন্যাসকে বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বিখ্যাত লেখক ডিফোর রবিন্সনক্রুশো নামক গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন। কাব্যজগতে ইহা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে পাঠক এমনি তন্ময় হইয়া যায়, যে এই গ্রন্থখানি কবি-কল্পনা কি সত্য জগতের সত্য ব্যাপার, তাহা যেন বুঝিতেও পারে না। ইহাতে আধুনিক কাব্যের নায়ক নায়িকার বিলাস-বাসনা-বিজড়িত ভাব ভঙ্গি আদৌ নাই। ইহা খালি কল্পনারই সম্পদ—উপন্যাস না হইলেও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেরই মত 'রবিন্সন ক্রুশো' এক অপূর্ব্ব কাব্য। অনেকে মনে করেন ডিফোর এই বিখ্যাত কাব্যের ছায়া অবলম্বনে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডুমার 'ডিউক অব মণ্টিক্রীষ্টো' বিরচিত। সে যাহাহউক রবিন্সন ক্রুশো যে ভাব ও কল্পনা রাজ্যের এক অদ্ভুত রত্ন-সম্পদ তাহা অনেকেই স্বীকার করেন।

ইংরাজী-সাহিত্যের মধ্যে এই পুস্তকখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম প্রিয় পদার্থ ছিল। তিনি ইহা ছাত্র-জীবনের পক্ষে সুখপাঠ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। এমন সরল

সহজ বিশুদ্ধ ইংরাজী অতি অল্পই ছাত্র-পাঠ্য-পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক বুঝিয়াই এই পুস্তকখানি বিখ্যাত ছাত্র আশুতোষের হস্তে আশীর্ব্বাদ-উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। আশুতোষ সৎ গ্রন্থপাঠে সদাই বিভোর তন্ময় হইয়া রহিতেন। আশুতোষ সত্যই আশুতোষের ন্যায় তখন ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

আশুতোষ ছাত্র-জীবনে যেমন উপন্যাস পাঠে বড় ইচ্ছুক বা রত ছিলেন না শেষ-জীবনেও নিজে উপন্যাস পাঠে বিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তবে উপন্যাস উৎকৃষ্ট হইলে, তাহাতে কুফল অপেক্ষা সুফলেরই সম্ভাবনা সমধিক—ইহা বুঝিতেন। উৎকৃষ্ট উপন্যাসে মানব-চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানস তত্ত্বের আলোচনা অনুশীলন হয়, সামাজিক অবস্থার ইতিহাস বিবৃত হইয়া থাকে। তাহাতে উচ্চ শিক্ষার উন্নতি ভিন্ন কখন অধোনতি ঘটে না। সিঙ্কোইজের 'কো ভেডিজ' নামক উপন্যাস একাধারে ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের আধার ক্ষেত্র। এই পুস্তকখানি পড়িবার সময় পাঠকের মনে হয় যেন দুরাত্মা সম্রাট নেরোর সময়ের রোম-সাম্রাজ্যের অতি উজ্জ্বল বিশদ চিত্র দর্শন করিতেছি, কখন মনে হয় খ্রীষ্টধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্ব ও তাহার মৌলিক অবস্থার ইতিহাস অবগত হইতেছি, কখন মনে হয় তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ সমাজের শ্রেষ্ঠ মানব-চরিত্র-কথা পাঠ

করিতেছি—আবার কখন বা মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব ও অবস্থা ঘটনাদির বিশদ-বাস্তব ভাবের বর্ণনা-চাতুর্য্যে, কখন বা উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় নিমগ্ন রহিয়াছি। এমন ভাবের উপন্যাস যথার্থই মানব-সমাজের অতুলনীয় অমূল্য সম্পদ।

একবার আশুতোষের সহিত উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাতে কথায় কথায় 'কো-ভেডিজ' উপন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। অনেকে সেই উৎকৃষ্ট উপাদেয় উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তাহাতে আশুতোষ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন উপন্যাস ভাল হইলে; তাহাতে সত্যই Psychology (মনোবিজ্ঞান) পাঠের ফল হয়।

প্রথম জীবনে যাহাই হউক—শেষ জীবনে আশুতোষের উপন্যাস পাঠের ফল ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল ; তবে বোধ হয় মনে মনে তিনি বাঙ্গলা-ভাষার উপন্যাসের প্রতি কখন আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না।

আশুতোষের পাঠ্য ছিল অতি গভীর গবেষনাপূর্ণ গ্রন্থ সমূহ। যে গ্রন্থ পাঠে ভাবনা চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন না ঘটে—বা যাহা পাঠ করিলে কোন উচ্চ ফল লাভের সম্ভাবনা না থাকে, সেরূপ গ্রন্থ আশুতোষের নিকট সদাই উপেক্ষিত ছিল।

আশুতোষ অতি প্রবল দুর্জ্জয় মস্তিষ্ক লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিন্তা গবেষণা যেন তাঁহার মস্তিষ্কের পক্ষে খেলার বিষয় ছিল। আশুতোষ এমনি মস্তিষ্ক লইয়া জগতে আসিয়া ছিলেন যে—না ভাবিয়া—না চিন্তা করিয়া যেন তিনি

ক্ষণকালওস্থির থাকিতে পারিতেন না। প্রকৃতির এই শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইয়া আশুতোষ মানব-জীবনের সার্থকতা সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চিন্তা লইয়াই মানব প্রকৃত মানব—চিন্তা-ধ্যান দ্বারাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হয়, একথা আশুতোষ মহৎ কর্ম্ম-জীবনে যেমন বুঝিয়াছিলেন—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি যেমন স্বীয় জীবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় অতি অল্প লোকেই দেখাইতে পারে।

আশুতোষ ভাবিবার বুঝিবার বিষয় হঠাৎ সম্মুখে না পাইলে, 'পজল' লইয়া—নিজ মস্তিষ্ককে নিযুক্ত রাখিতেন—এমনই ছিল তাঁহার চিন্তাপ্রিয়তা। ছাত্রজীবনে পাঠের সময় হইতেই আশুতোষ স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ছিলেন। গণিতের জটিল অঙ্কাদি সমাধান করিতে তিনি যে কত ভালবাসিতেন আর তাহাতে কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এখন এদেশের অনেকেই জানেন। গণিত-শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে যে কিরূপ মস্তিষ্ক আলোড়নের প্রয়োজন—তাহাতে কিরূপ ভাবনা চিন্তার পরিচর্চ্চা করিতে হয় তাহা গণিতজ্ঞগণ ভালই জানেন। তদ্ব্যতীত বাহিরের লোকেও যে তাহা না বুঝে এমন নহে। সেই অতি কঠিন অতি জটিল গণিত-শাস্ত্রের চর্চ্চায় আশুতোষ যেন যোগ-সাধকের ন্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এতদপেক্ষা তাঁহার চিন্তাশীলতার অধিক পরিচয় আর কি হইতে পারে?

দশম অধ্যায়।

সাধারণতঃ একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে যাহারা চিন্তাশীল, তাহারা প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। দার্শনিক পণ্ডিতগণ অনেকসময় কার্য্যক্ষেত্রে—সংসারের ব্যাপারে নির্ব্বোধের মত আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। একটি রহস্যের গল্প আছে যে নৈয়ায়িক পণ্ডিত তেলের বাটি হাতে লইয়া বিচার করেন—তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল? এমনই বাহ্যজ্ঞানবিবর্জ্জিত চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ হইয়া থাকেন।

আশুতোষ চিন্তাশীল ছিলেন—মহাপণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে কখন সাধারণ বোধবিবর্জ্জিত বাহ্যজ্ঞানবিহীন নির্ব্বোধ বর্ব্বরের ন্যায় আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই।

বহু ইংরাজী-পড়া-পণ্ডিতও অনেক সময় বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন এমনও শুনা গিয়াছে। সে সম্বন্ধে একটি গল্প কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। এস্থলে গল্পটি উল্লেখ না করিয়া আমরা আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না।

দেশ-বিখ্যাত মনস্বী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যামাতা স্বর্গীয় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এদেশে প্রথম ও প্রধান এম এ। তিনি একজন পুস্তকের কীট বিশেষ ছিলেন। কত ভাষার কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থই

যে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এ হেন পণ্ডিত তারাপ্রসাদ বাবু শুনিয়াছি কর্ম্মক্ষেত্রে বিষয় ব্যাপারে কিছু বাহ্যজ্ঞানহীন ভাব প্রকাশ করিতেন।

একবার তাঁহার শ্বশুর মহাশয় কোন পার্ব্বন উপলক্ষে যামাতা তারাপ্রসাদ বাবুকে এক যোড়া কাপড় দিয়াছিলেন! তারাপ্রসাদ বাবু নাকি এক সঙ্গে সেই এক যোড়া কাপড়ই পরিতে আরম্ভ করিলেন। কাপড় পরিতে পরিতে তিনি হাঁসিতে লাগিলেন। নিকটস্থ কেহ জিজ্ঞাসা করিল—হাঁসি কেন?

তারাপ্রসাদ বাবু হাঁসির বেগ আরও প্রবল করিয়া কহিলেন—'শ্বশুর মহাশয় মহাজ্ঞানী বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বাহ্য-জ্ঞানহীন।'

জিজ্ঞাসা হইল—'কেন?'

তারাপ্রসাদ বাবু কহিলেন—'এই দেখনা—কত বড় একখানা কাপড় কিনিয়াছেন।'

যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে তখন একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিল—কাপড় একখানা নয়—এক যোড়া। হাসিয়া সে কহিল—'বাহ্য জ্ঞান-শূন্য কে? আপনি কি আপনার শ্বশুর? কাপড় তো একখানা নয়—এ যে এক যোড়া। আপনি একখানা ভাবিয়া এক যোড়াই পরিতেছেন?'

তারাপ্রসাদ বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—'তাই কি?' আপনার অজ্ঞতা বুঝিয়া নীরব হইলেন।

আশুতোষ মহাপণ্ডিত অতি চিন্তাশীল ছিলেন। কিন্তু কখন

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বাহ্যজ্ঞানহীনতার ভাবপ্রকাশ করেন নাই। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আশুতোষ সর্ব্বব্যাপারে মহাবুদ্ধিমান বিবেচকের ন্যায় কার্য্য সমাধান করিতেন! যখন যাহা ধরিতেন, তাহাই মহা অভিজ্ঞ কর্ম্মীর ন্যায় সম্পাদন করিতেন। কোথাও কেহই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মব্যাপারে পরাজিত করিতে পারে নাই। ইহার কারণ তিনি যেমন চিন্তাশীল গবেষণা-পরায়ণ তেমনি কর্ম্মী ছিলেন। আশুতোষের কর্ম্মবৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি, ভাববৃত্তি সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হইয়া, তাঁহার মনুষ্যত্ব পূর্ণাঙ্গে অভিব্যক্ত করিয়াছিল। আশুতোষ যথার্থই আদর্শ পুরুষ—মহাপুরুষ।

অধ্যয়নের অবস্থায় যথার্থই মনে হইত আশুতোষ যেন পাঠ্য পুস্তক পূর্ব্ব হইতেই সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই তিনি এণ্ট্রান্স পাঠের সময় এল-এর পাঠ্য, এল এর সময়ে বি-এর পাঠ্য আর বি,এর সময় এম-এর পাঠ্য সমাধা করিয়াছিলেন। এমনভাবে সে সকল সমাধা করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাঁহার যে কোনরূপ বেগ পাইতে হইয়াছে, এমন কখনও কাহারও মনে হয় নাই। বাস্তবিক অতি অল্প বয়সে ছাত্র অবস্থায় তাঁহার সেইরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। অনেকে উহা এক অমানুষিক ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করিত।

আশুতোষ, সময়ে সময়ে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া, একটু অধিক মাত্রায় পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সে

কেবল তাঁহার জ্ঞান-পীপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য আশুতোষকে কখন উৎকট পরিশ্রমে প্রপীড়িত হইতে হয় নাই। আশুতোষ যে পাঠ্য বিষয় অপেক্ষা অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া যাইতেন, সে কেবল তাঁহার জ্ঞান-কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য। জ্ঞান-ক্ষেত্রে তিনি কখন সামান্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। আশুতোষ জ্ঞান-সমুদ্রের তিমিঙ্গিল। বিদ্যার ক্ষুদ্রহ্রদে বিচরণ করিতে তাঁহার বিশাল হৃদয় কখনই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই।

আশুতোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া কিছু বিষণ্ণ হউন বা না হউন বিস্মিত নিশ্চয়ই হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন এই শিক্ষারণ্যে তাঁহা ছাড়া আর দ্বিতীয় সিংহ কে থাকিতে পারে? আশুতোষ যখন তাঁহার দ্বিতীয় স্থান অধিকারের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময় বিষাদ বিদূরিত হইল। আশুতোষ জানিলেন তখনকার কালে হিন্দুস্কুল বা হেয়ার স্কুলের ছাত্র না হইলে পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভের আশা একরূপ ভস্মে ঘৃতাহুতি।

আশুতোষ এল, এ পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ রাজকীয় কলেজ—সমগ্র বঙ্গের —বঙ্গের কেন—সমগ্র ভারতের আদর্শ-কলেজ। বিলাত হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানে পণ্ডিত গণকে আনাইয়া এখানে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। বাঙ্গলায় উচ্চশিক্ষার প্রথা পরীক্ষার

প্রণালী এই প্রেসিডেন্সি কলেজে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, কর্ত্তৃপক্ষ অপর বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার পন্থা প্রদর্শন করেন। তবে যে উদ্দেশ্য ধরিয়া এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গে সংসাধিত হইতেছে কিনা ইহা বিশেষ বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার দ্বারা যথার্থ শিক্ষিত ছাত্র ও ছাত্রের শ্রেষ্ঠ নৈতিক-জীবন গঠন করাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতেছে কিনা এখন অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

কল্পনা, ভাবুকতা, বা চিন্তাশক্তি অপরে দিতে পারে কিনা ইহা মনোবিজ্ঞানের এক অতি জটিল প্রশ্ন। আধুনিক মনো-বিজ্ঞান (Psychology) শিক্ষার সেই রহস্য-সঙ্কুল-প্রশ্ন লইয়া ব্যতিব্যস্ত। অবশ্য শিক্ষা সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের সে শক্তি আছে কিনা, তাহা বলা যায় না। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যায় যে মূলে আধারে বুদ্ধি বিচারাদি শক্তি না থাকিলে অপরের বা বাহিরের আঘাতে কিছুরই পূর্ণাঙ্গে পরি-স্ফুরণ হইতে পারে না। পূর্ণাঙ্গে না হইলেও শিক্ষা-কৌশলে বিশেষ কিছু কাজ নিশ্চয়ই সাধিত হইতে পারে বৈকি।

বঙ্কিম চন্দ্রের ন্যায় বহু ছাত্র প্রেসিডেন্সি হইতে বি-এ, এম·এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমের ন্যায় অপূর্ব্ব সৃজন-শক্তির (Creative power) অসাধারণ প্রতিভা

পাইয়া এক বঙ্কিম চন্দ্র ব্যতীত আর কয়টি বাহির হইয়াছে? শিক্ষা দীক্ষা অনেকেরই তো একইরূপ ঘটিয়াছিল।

বঙ্কিম চন্দ্র, সম নাই হউক, সুশিক্ষায় কতকটা সুফল যে ফলে, তাহাতে সন্দেহ তর্কের অবসর নিশ্চয়ই নাই। অসাধারণ প্রতিভা একটা অদ্ভুত দৈবশক্তি। মনুষ্য-প্রবর্ত্তিত শিক্ষায় বা চেষ্টায় তাহার উদ্ভব নিতান্তই অসম্ভব। তবে সুশিক্ষার সুফল সাধনীয় একথাও সর্ব্বথাই স্বীকার্য্য।

আশুতোষ নিজেও নিজের প্রতিভা বুঝিতেন—আশুতোষের পিতাও বুঝিতেন। বুঝিয়াই তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেজ—প্রেসিডেন্সি কলেজেই আশুতোষকে ভর্ত্তি করা হইল।

আশুতোষ যখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র, তখন এখানে বিশেষ বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত-প্রবর টনি সাহেব তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ইহাঁর প্রণীত ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ অতি বিখ্যাত। রো সাহেব ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত ইংরাজী ব্যাকরণ যাহা রো এর হিণ্ট Hint on the stuady of English Literature' তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র গণের পক্ষে নির্দ্ধারিত পাঠ্য ছিল। ইনি এদেশীয়-দিগের লিখিত ও কথিত ইংরাজীকে 'বাবু ইংরাজী' 'Babu English' বলিয়া উপহাস করিতেন। বিখ্যাত বাগ্মী ও দার্শনিক পণ্ডিতকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একবার কঠোর উত্তরে রো সাহেবের সেই নির্দ্দেশ উড়াইয়া, রো এর ইংরাজী

ভুল দেখাইয়া তাঁহাকে বেশ একটু জব্দ করিয়াছিলেন। বুথ, রবসন, পার্শিভাল প্রভৃতি আরও কয়েকটি উত্তম অধ্যাপক তখন প্রেসিডেন্সিতে পড়াইতেন।

আশুতোষের সমসময়ে, আরও কয়টি বিশেষ প্রতিভাবান ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিতেন। তন্মধ্যে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার কারফরমা একজন বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ছাত্র।

ইনি আশুতোষের এক সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইনি হিন্দু স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। যে কারণেই হউক ইনি সেবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, আশুতোষের উপরে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

প্রসন্ন ব.বু আমাদের বিশেষ পরিচিত বন্ধু ছিলেন। তিনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া বহুদিন পুরুলিয়ায় ছিলেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী কার্য্য করিয়াও সাধারণের জন্য তিনি মানভূমে সাধারণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি যেখানে যেখানে অবস্থিতি করিতেন, তখনই তথাকার জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী হইতেন। ইনিও নিজ কালে একজন বিশেষ শিক্ষিত বলিয়া সাধারণে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ কৃতীত্ব দেখাইয়া অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যাঁহারা ইহার সহিত পরিচিত ছিলেন, বা ইহাঁর সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহারা সকলেই ইহাঁর অকালমৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

আশুতোষ ১৮৮০ সালের জানুয়ারি হইতে এল এ পড়িতে

আরম্ভ করিলেন। তখন প্রেসিডেন্সির কলেজ-ক্লাসে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিত, তাহারা অনেকেই প্রায় হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের ছাত্র। তদ্ব্যতীত কতকগুলি ছাত্র কলিকাতারই অপর কলেজ স্কুল হইতেই সমাগতঃ। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক কয়জন ছাত্র কেবল মফস্বল হইতে আগমন করিল। তাহারা প্রেসিডেন্সির ছাত্র-গণের নিকট 'পাড়াগেঁয়ে-বলিয়া অভিহিত হইত। কলিকাতাবাসী ছাত্রগণ অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত ছাত্র গণকে বিশেষ অবজ্ঞা করিত। স্বদেশী-ভাবের সহিত নবজাগরণের ভাব মিলিয়া মিশিয়া এখন ছাত্রগণের মধ্যে যে মৈত্রী সহানুভূতির নবযুগ আনয়ন করিয়াছে, তখন সহযোগ মৈত্রী ভাব ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষতঃ প্রেসিডেন্সির ছাত্রগণের মধ্যে—বড় একটা পরিলক্ষিত হইত না। প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ ছাত্রই 'বড়লোকের আদুরে গোপাল' ছিল। তাহাদের মধ্যে আভিজাত্য-ভাবটা (aristocratic feeling) খুব প্রবল ছিল। এখন যেমন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে—স্বদেশী ভাবের সঙ্গে —সমাজের মধ্যে স্তরগত শ্রেণীগত বিভাগ নষ্ট করিয়া, সাম্য ও মৈত্রী ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষিত সজ্জন গণের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, তখন সেরূপ ভাবেরই বিন্দু মাত্রও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে স্বপ্নেও কখন উদয় হইত না। 'বড় লোকের ছেলে' বলিলে 'বাবু আনা' বিলাসিতা সম্বন্ধে যে একটা প্রীতি জনক-ভাব সাধারণ লোকের মনে জাগিয়া উঠিত, তাহা এখন আর কল্পনায়ও বোধ হয় আনা যায় না : এখনকার

যে সকল যুবক, তরোয়ারধারী পশ্চাৎগামী লাঠিয়াল দারোয়ান লইয়া—বাবু বর্গের ধরাখানাকে সরা জ্ঞানে চলা ফেরার অভিনয়-ভঙ্গি কখন দেখে নাই, তাহারা সে যুগের বাবু-চিত্র ধারণা করিতে নিতান্তই অক্ষম। স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্রও প্রেসিডেন্সিতে পড়িবার সময় এইরূপ ছত্রধারী দারোয়ান পিছু লইয়া কলেজে যাওয়া আসা করিতেন। নিপুণ চিত্রকর দীনবন্ধু সবার, একাদশীতে' অটল-চরিত্রে তখনকার বাবু-চিত্র আভাসে আঁকিয়া সমাজের চক্ষে ধরিয়াছিলেন।

আশুতোষের অধ্যয়ন কালে সেই আভিজাত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত ধন মদে মত্ত বাবু দলের দম্ভ দর্প দূর হয় নাই। আশুতোষ যখন প্রেসিডেন্সিতে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন, তখন বহু বড় লোকের ছেলে জুড়ি গাড়ি হাঁকাইয়া কলেজ ক্লাসে তাঁহার সহিত সমপাঠী হইয়া একসঙ্গে পড়িত। তাহারা আশুতোষকে ভালরূপে চিনিত না—চিনিবার সাধ্যও তাহাদের বড় ছিল না। তাহারা আশুতোষকে গ্রাহ্য করিত না।

আশুতোষ চিরদিনই যে সে ছেলের সহিত মিশিতেন না—মিশিতে ভালও বাসিতেন না। ইহা তাহার দম্ভ বা অহঙ্কারের ফল নয়। আশুতোষ কখন মিথ্যা দাম্ভিক উদ্ধত ছিলেন না। তিনি আপন মনে আপনি ধ্যান-পরায়ণ যোগীর ন্যায় ভারতীর উপাসনায় তন্ময় হইয়া সদাই নিমগ্ন রহিতেন। যে সে ছেলের সহিত মিলিবার মিশিবার সময় সুযোগ তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না।

যে সকল বড় লোকের বাবু ছেলেরা কলিকাতার আব হাওয়ায় বিলাসের বৈঠকে লালিত পালিত হইয়াছিল, তাহারা আশুতোষকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দর্শন করিত না। চাটুল চিত্ত চটুল-বিত্ত চুরুট-মুখ চসমা-চক্ষু চেইন-বক্ষ সেই বাবুর দল সাহস করিয়া প্রকাশ্যে পুরুষসিংহ আশুতোষকে অবজ্ঞা করিতে সাহসী হউক বা নাই হউক, পাকে প্রকারে পরোক্ষে তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য-বিদ্রূপের কটাক্ষপাতে কুণ্ঠিত হইত না।

গাম্ভীর্য্য বীর্য্যের আধার সদাশয় সদাসংযত আশুতোষ তাহাদের সে দম্ভ চাপল্য গ্রাহ্যও করিতেন না। তিনি আপন মনে আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেন।

কি পরিচ্ছদের ব্যাপারে কি দৈহিক ব্যাপারে আশুতোষ জীবনের কোন অজ্ঞাত কালেও আড়ম্বর আস্ফালন জানিতেন না—দেখাইতেও কখন চেষ্টা করেন নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরম ভক্ত আশুতোষ পুষ্পের প্রতি পরম অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাকে কেহ যদি উপহার স্বরূপ সুন্দর সুরভি পুষ্প প্রদান করিত, তবে আশুতোষ যেন মূল্যবান সম্পত্তি পাইলেন বলিয়া পরম প্রীতি প্রকাশ করিতেন। সৌন্দর্য্যে অনুরাগ তাঁহার হৃদয়ের এক বিশেষ ভাব ছিল। সেই ভাব বশতঃ তিনি ফুল দেখিলে বা ফুল পাইলে পরম আনন্দ লাভ করিতেন। যৌবনে তাঁহার সৌন্দর্য্যানুরাগ যেমন প্রবল ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অনুরাগ যেন আরও বিশেষরূপে বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিচিত সকলেই তাঁহার এই সৌন্দর্য্যা

নুরাগেরও পুষ্পানুরাগের কথা জানিত। তাই অনেকে যখন তখন আশুতোষকে সুরভি পুষ্প উপহার স্বরূপ প্রদান করিত। স্বয়ং আশুতোষ মহাদেব বিল্ব পত্রে পূজা-উপহার পাইলে যেমন পরিতুষ্ট হন, পুষ্প উপহার পাইয়া সৌন্দর্য্য-উপাসক আশুতোষের প্রাণ তেমনি উচ্ছসিত হইয়া উঠিত।

একবার আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একটি ভদ্রলোক, আশুতোষকে একটি অতি সুন্দর সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প আশুতোষকে প্রীতি-উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। আশুতোষ ফুলটি হাতে লইয়া অতি মুগ্ধনেত্রে মুগ্ধহৃদয়ে গোলাপ ফুলটি দেখিতে লাগিলেন। মনে হইল সেই পুষ্পের সৌন্দর্য্য দেখিয়া—আশুতোষের প্রাণ সত্যই বিগলিত হইয়াছে। যেন কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে উভয়ে মাটির সংসারে নামিয়া আসিয়াছেন। আশুতোষ সারথ্যে স্বর্গের সরল শিশু ছিলেন। তিনি পাপতাপক্লিষ্ট সংসারের কুটিল বুদ্ধির ধার ধারিতেন না। আশুতোষ সৌন্দর্য্য-অনুরাগী ছিলেন সত্য, কিন্তু আপনার বেশ ভূষায় কখন সৌন্দর্য্যের আড়ম্বর প্রকাশ করেন নাই। তিনি জানিতেন আড়ম্বরটা একেবারেই কৃত্রিম কাণ্ড। তাহাতে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের স্থান বড় বেশী নাই। আড়ম্বরহীনতাই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের যথার্থ স্বরূপ। নিরভরণা সুন্দরীই সৌন্দর্য্যের যথার্থ আধার-ক্ষেত্র। অলঙ্কারে জড়াইয়া যে সৌন্দর্য্য ফুটাইতে হয়, তাহাতে প্রকৃতই রূপ-বিড়ম্বনা ঘটে।

আশুতোষ এ তত্ত্ব বেশ জানিতেন বুঝিতেন। তাই শিক্ষা

কাল হইতে তিনি সাজ সজ্জায় সর্ব্ববিধ বিষয় ব্যাপারে আড়ম্বর হীন ছিলেন। আশুতোষ চিরদিনই প্রকৃতির অনুরাগী প্রকৃতির উপাসক প্রকৃতির সুসন্তান। পঠদ্দশা হইতে তিনি আড়ম্বরহীন সাদাসিধা স্বর্গের শিশু সম সরলপ্রাণ ছিলেন।

আশুতোষ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে প্রথম প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের অবস্থা বিশেষ উন্নত। ডাক্তার গঙ্গাপ্রাসাদের তখন পসার প্রতিপ্রত্তি প্রচুর। তাঁহার ধনার্জ্জনও তখন যথেষ্টই হইয়াছিল। আশুতোষ ইচ্ছা করিলে, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যে খুবই জাঁক জমক আড়ম্বরের ঘটা ছটা দেখাইতে পারিতেন। সেপক্ষে তখন আর অর্থের অভাব জন্য তাঁহাকে কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না। তিনি পিতামাতার অতি প্রিয় পাত্র পরম স্নেহের সন্তান ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তখন অনায়াসে দুই শ' পাঁচ শ' খরচ করিয়া বিলাসিতা বাবুগিরির আড়ম্বর ঐশ্বর্য্য দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ বিলাসিতার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন।

আশুতোষ জানিতেন বাবুগিরি বাহ্য জাঁক জমক প্রজাপতি ময়ূরপক্ষী আদির দলে শোভা পায়—প্রকৃত মানুষের পক্ষে বাহ্য আড়ম্বর, দৈহিক পোষাকের জাঁকজমক নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা বা দুর্ব্বলতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আশুতোষের সমপাঠীরা অনেকেই তখন বড় লোকের ছেলে

—অনেকে 'আলালের ঘরের দুলাল'। তাহারা অনেকে অনেক রকমওয়ারি বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া কলেজে আসিত। তাহারা আশুতোষের সাদাসিধা—পোষাক পরিচ্ছদে বিশেষ অবজ্ঞা উপেক্ষা প্রদর্শন করিত। পুরুষসিংহ আশুতোষ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। পক্ষান্তরে তিনি তাহাদের ফাকা আড়ম্বরের ঐশ্বর্য্যে সদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। তবে কখনও তিনি কাহারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন নাই। কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করা বা অবজ্ঞা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই স্বভাব বিরুদ্ধ ভাব ছিল।

অধ্যাপক বুথকে অনেকেই দেখিয়াছেন। তিনি তখন—আশুতোষের প্রেসিডেন্সির পাঠ্য অবস্থায় কলেজের একজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বুথ সাহেব নিজে বিশেষ সদাশয় ও আড়ম্বর বিহীন মহাশয় ব্যক্তি। তিনি আশুতোষের পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর-হীনতা দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেন। তিনি স্নেহভরে প্রিয় ছাত্র আশুতোষকে 'সাধাসিধা সরল' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

আশুতোষ অল্পদিনেই গণিতাধ্যাপক বুথের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বুথ গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আশুতোষ গণিতে বিশেষ দক্ষ ছাত্র। উভয়ের মধ্যে সত্বরই বিশেষ অনুরাগ সহানুভূতি জন্মিল। আশুতোষ অল্পদিনেই সহৃদয় বুথের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। আশুতোষ—তাঁহার এমনি প্রিয় হইয়াছিলেন যে ক্লাশে আসিয়া

আশুতোষকে না দেখিলে, তিনি যেন সত্যই দিশাহারা হইতেন।

আশুতোষ একেই আড়ম্বরহীন সাদাসিধা লোক ছিলেন—বাবুগিরি বিলাসিতা তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না। অদ্রুপরি তিনি হিন্দুস্কুল বা হেয়ারস্কুলের ছাত্র ছিলেন না। তিনি ভবানীপুরের সাধারণ একটি বিদ্যালয় সাউথ সুবরবণ' স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রেসিডেন্সির তাৎকালিক বিলাসী বাবু ছাত্রদিগের দল আশুতোষকে বড় ভাল বাসিত না। কাজেই আশুতোষের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মিল না। তাহারা আশুতোষকে ভালবাসার চক্ষে দেখিতে পারিত না। আশুতোষেরও তাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিবার সুযোগ সুবিধা ঘটিত না।

একেই আশুতোষ যে সে ছেলের সহিত মিশিতেন না—মিশিতে ভাল বাসিতেন না। ভাবুক চিন্তাশীলের পক্ষে যাহা ঘটে, আশুতোষের পক্ষে তাহাই ঘটিল। ধ্যান-পরায়ণ যোগী যেমন একাকী থাকিতে—একাকী রহিয়া আপনার মনে আপনার কাজ করিতে ভাল বাসে—আশুতোষের তাহাই ঘটিল। আশুতোষ আপন শ্রেণীতে বসিয়া আপন মনে আপন কাজ করিতে লাগিলেন। তিনিও বড় একটা বাবু ছাত্রদের সহিত মেলা মেশা করিতেন না। তাহারাও বড় একটা তাহার কাছে ঘেঁষিতে সাহসও করিত না—ইচ্ছাও করিত না।

এজন্য কেহ যেন মনে না করেন যে আশুতোষে সামাজিকতার অভাব ছিল। প্রকৃতপক্ষে আশুতোষ কখনই সমাজ-বুদ্ধি-বিহীন অসামাজিক বা নরদ্বেষী Manhater ছিলেন না। তিনি মানবকে বড় ভালবাসিতেন। আশুতোষ মনুষ্যত্বের পরম হিতৈষী ছিলেন। এমন কি মনুষ্যত্বের উপাসক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনুষ্য-সমাজের কল্যাণ বিধান—মানবের কল্যান সাধন—মানবের উন্নতি বর্দ্ধন তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চিরদিনই সকল মানুষকেই বড় ভালবাসিতেন। গৃহের সামান্য দাসদাসী পর্য্যন্ত তাঁহার মহা মানব-প্রীতির করুণা বারিবর্ষণ হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

ক্লাসে তথাকথিত বাবুরদল তাঁহাকে ভালবাসিতেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিসিবার অবসর পাইতেন না। কিন্তু মফঃস্বল হইতে যে সকল ভালছেলে অধ্যয়নের জন্য প্রেসিডেন্সিতে আসিয়াছিল, তাহারা প্রাণ দিয়া আশুতোষকে ভালবাসিত। আশুতোষও হৃদয়ের সহিত তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। যে সকল ছাত্র মফস্বল হইতে ভালরূপে পাশ হইয়া বা বৃত্তি লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সিতে পড়িবার জন্য তখন আসিত, তাহারা প্রায় সাদাসিধা ছিল। আহারে ব্যবহারে, বা পরিচ্ছদের ব্যপারে তাহাদের মধ্যে কাহারও বড় একটা বাহ্য আড়ম্বরের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইত না। কারণ তাহারা তখন নিহাত নিরীহ পাড়াগেঁয়ে ছাত্র। তাহারা বিলাসী বাবু দিগকে দেখিয়া স্বতঃই নত কুণ্ঠিত হইয়া রহিত। আশুতোষের স্বাভাবিক সরল

ভাব—আর সেই প্রাকৃতিক সারল্যের মধ্যে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও তেজস্বিতার ভাব, তাহাদিগের নিরীহ সরল প্রাণকে বিশেষরূপে বিমোহিত করিয়া রাখিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আশুতোষকে প্রাণেরশ্রদ্ধায় পূজা করিত। আশুতোষও তাহাদিগকে পরম প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে পরিশেষে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন ও শেষকাল পর্য্যন্ত আশুতোষের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদ্ধ ছিলেন।

আশুতোষ যখন প্রেসিডেন্সিতে প্রথম অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন তখনও স্বদেশীয় আন্দোলনে ছাত্র-জীবনে বা দেশমধ্যে এমন যুগান্তর উপস্থিত হয় নাই। ছাত্র-জীবনের মধ্যে এমন সৌহৃদ্য সহানুভূতির ভাব সমুদিত হয় নাই।

যখন সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রতি তৎকালের শিক্ষিত নেতাগণ সম্মিলিত হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে আন্দোলন উপস্থিত করেন, সেই সময় হইতে ছাত্র-জীবনে এদেশে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব ঘটে। যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বক্তাগণ বঙ্গের শিক্ষিত যুবক গণকে রাজনৈতিক মন্ত্রে উদ্বোধিত করিতেছিলেন, তখন বঙ্গের ছাত্রকুল সত্যই যেন নবজীবন লাভ করিয়া নবভাবে জাগরিত হইয়াছিল। তাহারও কিছুদিন পূর্ব্বে কেশব চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের উৎসাহে বঙ্গের ছাত্র-জীবনে নৈতিক ও ধর্ম্মভাব আনয়নের জন্য যখন প্রথম চেষ্টা করেন ও তজ্জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন

করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন, তখন এদেশে ছাত্র-জীবনে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। এই উভয় কালে উভয় ভাবের প্রভাবে বাস্তবিকই বঙ্গের তরুণ-জীবন একসময়ে প্রবলভাবে আলোড়িত উদ্বোধিত হইয়াছিল। প্রথমত ব্রাহ্ম-প্রভাবে ধর্ম্মভাবে নৈতিকভাবে বঙ্গীয় ছাত্র-জীবন যেমন সমুন্নত হইয়াছিল, তৎপরে রাজনৈতিক বাগ্মীগণের বক্তৃতা প্রভাবে জাতীয় ভাবের বিকাশ বিবর্দ্ধন ঘটে। তাহার ফলে ছাত্রগণের মধ্যে মৈত্রী সহানুভূতি ও একতা প্রভৃতি উচ্চভাবের বিকাশ সাধিত হয়।

সাধারণ ছাত্রগণের মধ্যে এই সকল মহৎ ভাবের আবির্ভাব ঘটে। সাহেবগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত, বিলাতী প্রভাবপূর্ণ প্রেসিডেন্সিতে এই সকল ভাব পঁহুছিতে পারে নাই—পঁহুছিবার সুযোগ সুবিধাও পায় নাই। প্রেসিডেন্সির বাবু ছাত্রগণ আশুতোষের সময় পর্য্যন্ত যে বাবু সেই বিলাসী বাবুই রহিয়াছিল। তাহারা সাধারণের সহিত বড় মিশিত না—দেশের সাধারণ ব্যাপারে তাহাদের প্রাণের বিশেষ অনুরাগ বা সহানুভূতিও ছিল না। তাহারা এক রকম 'আহেলী বিলাত' দেশী সাহেব রকমই ছিল। তখনও দেশময় এতো বি-এ, এম, এর ছাড়াছড়ি হয় নাই। তখনও বি-এ, এম-এ পাশ করিলে বেশ বড় চাকুরি পাইবার যথেষ্ট আশা সম্ভাবনা ছিল। তখনও গোলামগিরি দ্বারা বাঙ্গালী-জীবনের সার্থকতা সাধনের যথেষ্ট অবসর ছিল। বি-এ এম-এ পাশ করিয়া, বিবাহ ব্যাপারে

কন্যার পিতার ঘাড় ভাঙ্গিয়া অর্থ উপার্জ্জনের প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা ছিল। বি-এ এম-এ পাশ করিয়া পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া আসিলে গ্রামের লোক কাতারে কাতারে দেখিতে আসিত।

এমনি সময়ে আশুতোষ প্রেসিডেন্সির একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কেবল প্রেসিডেন্সি কলেজের বৈদেশিক বিকট আবহাওয়ার প্রাচুর্য্যে ছাত্র-জীবনে দেশীয়ভাব প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে নাই। ছাত্রগণের মধ্যে তেমন সহানুভূতি সম্প্রসারণের বা একত্ সাধনের সুযোগও ঘটে নাই। কাজেই আশুতোষ, বহুজীব সমাকুল অরণ্য মধ্যস্থ সিংহের ন্যায়, বহু ছাত্র বিশিষ্ট ক্লাসে একাকী একছত্রা হইয়া নিজের প্রভায় নিজে বিরাজ করিতেন। আশুতোষের সহিত বাবু ছাত্রগণ মিশিত না, আশুতোষও তাহাদের সহিত মিশিতেন না।

আশুতোষ সামান্য দ্বেষ ঈর্ষাদির বহু উর্দ্ধস্তরে বাল্যকাল হইতেই অবস্থিত ছিলেন। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের উপর তাঁহার কখন দ্বেষ হিংসা ছিল না। দ্বেষ ঈর্ষার বশে যে তিনি সমপাঠীগণের সহিত মিশিতেন না এমন নহে; দম্ভ অহঙ্কারও তাঁহার ছিল না। তজ্জন্য তিনি কাহাকেও কখন অবজ্ঞাও করিতেন না।

আশুতোষ, সত্যই ধ্যানমগ্ন তন্ময় যোগীপুরুষ ছিলেন। তিমি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাতেই ধ্যানমগ্ন যোগী জনের ন্যায় তন্ময় হইয়া রহিতেন। ছাত্র-অবস্থায় অধ্যয়ন

ব্যাপারে যথার্থ যোগীর ন্যায় মগ্ন হইয়া রহিতেন। সেই জন্যই কাহারও সহিত মিশিবার সময় সুযোগ বড় পাইতেন না। তাই তিনি নিজভাবে বিভোর হইয়া ক্লাশে প্রায়ই এক পাশে যেন আপন মনে আপনি রহিতেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে আশুতোষ, দেবদেব আশুতোষের ন্যায় সাদাসিধা সরল স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন। বাহ্য পোষাকের মধ্যে ছিল তাঁহার এক চায়না কোট আর এক চাদর, আর এক যোড়া জুতা। একসময়ে আশুতোষ চাদর ব্যবহারও ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আশুতোষ যখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র হইয়াছিলেন, তখন কলিকাতায় প্রথম ট্রাম চলিতে আরম্ভ হয়। ট্রাম তখন এরূপ ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে চলিত না। ঘোড়ায় ট্রাম টানিত। গ্রীষ্মকালে ট্রাম টানিতে টানিতে যে ঘোড়া মরিত, তাহাতে সাধারণ রাস্তায় যে কি বিকট দৃশ্যের অভিনয় হইত, তাহা এখনও অনেকের মনে অঙ্কিত রহিয়াছে। আশুতোষেরও কোমল হৃদয় সময়ে সময়ে সে বিকট দৃশ্য দর্শনে অভিভূত হইয়াছে; অনেকেরই প্রাণ বিগলিত হইয়াছে।

আশুতোষ প্রথম অবস্থায় ট্রামে চড়িয়া কলেজে আসিতেন। একদিন ট্রামে আসিতে তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। ট্রাম হইতে নামিবার সময় তাঁহার গায়ের চাদর হঠাৎ ট্রামে কিরূপে জড়াইয়া বাধিয়া যায়, তজ্জন্য নামিবার সময় তিনি পড়িয়া আঘাৎ পাইলেন।

যাহাহউক সে যাত্রা ধর্ম্মরূপী ভগবান আশুতোষকে রক্ষা করিলেন। এমন অবস্থায় এমন স্থলে প্রাণ বিয়োগের অথবা সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা।

যাহা হউক আশুতোষ সেবারে সে বিপদ হইতে ভগবানের কৃপায় উদ্ধার লাভ করিলেন। আশুতোষ সেই সময় হইতে চাদর ব্যবহার ত্যাগ করিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে কলেজে সমপাঠীদিগের নিকট বিশেষ উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল।

আশুতোষের দৃষ্টান্ত ধরিয়া বহু ছাত্র তখন চাদর ব্যবহার ছাড়িয়াছিল। চাদর ব্যবহার আমাদের জাতীয় হিসাবে সামাজিক-হিসাবে একটা চিরন্তন প্রথারূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। চাদর-ব্যবহার ত্যাগ করা, জাতীয়তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় বলিয়া অনেকে তখন আশুতোষকে ও চাদর-ত্যাগী ছাত্রগণকে উপহাস করিতে লাগিল। আশুতোষ তাহাতে দৃকপাতও করিতেন না।

আশুতোষের সময় হইতে, বোধ হয় আরও কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেও সমাজের বহু মান্তগণ্য ব্যক্তিগণ চাদরের ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃত পক্ষে জাতীয়তা ও সামাজিকতার পক্ষে হানিকর বলিয়াই সমাজের যাঁহারা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের লোক, তাঁহারা চাদর ত্যাগ অনুমোদন করেন না। পক্ষান্তরে উন্নতিশীল দল বলেন চাদর ব্যবহার নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। ইহাঁদের মতে বর্ত্তমান পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার একটা কারণ। চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য জাতি

সমূহ সেই কারণ অনুধাবন করিয়াই জাতীয় পোষাক পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় জাতির পোষাক পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতার চীনেম্যানদেরও পোষাক পরিচ্ছেদ কিছুকাল পূর্ব্বে যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা এখন তাহাতে প্রভূত পরিবর্ত্তন দেখিতে পায়। এখনকার চীনেম্যান সাজে সাজ্জায় পোষাকে পরিচ্ছদে ঠিক বিলাতী সাহেব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহাদিগকে সে পূর্ব্বের জুতা বার্ণিস-ওয়ালা চীনেম্যান বলিয়া সহজে চিনিতে পারা যায় না।

হিন্দু কখন আহারে ব্যবহারে, আচারে পরিচ্ছদে সহজে জাতীয়তা সামাজিকতা পরিত্যাগ করিতে চায় না। আশুতোষ জাতীয় ভাবকে উপেক্ষা করিয়া কখনই চাদর ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বিপদে পড়িয়া, বিপদের আশঙ্কায় অগত্যা কিছুদিনের জন্য চাদর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই তখনকার কোঁচানো ধূতি উড়ানী সজ্জায় সজ্জীভূত বাবুর দল তাঁহাকে চাদর নিবারিণী সভার সভ্য বলিয়া উপহাস করিত।

আশুতোষ চিরদিনই উপহাস বিদ্রুপের অতীত বীর্য্যবান পুরুষ। তিনি উপযুক্ত ও প্রয়োজন বলিয়া যাহা একবার বুঝিতেন বা ধরিতেন, তাহা সহজে—পরের কথার ভয়ে—পরিত্যাগ করিতেন না।

আশুতোষ ছাত্র-জীবনে চাদর বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্ম্ম-জীবনে তিনি কখনই জাতীয় ভাব সামাজিক প্রথাকে

অবহেলা করেন নাই—পরিত্যাগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার সৎসাহসের পরিচয় সর্ব্বজনবিদিত। তিনি সাহেব মহলে গতিবিধি করিবার কালেও অনেক সময় ধুতি চাদর লইয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালীর সাজে যাইতেন। তজ্জন্য কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না—কিছুতেই কুণ্ঠিত হইতেন না।

আশুতোষ বিদ্যায় বিজ্ঞতায় বৃদ্ধ হইলেও, বয়সে বড় বেশী হন নাই। কিন্তু আচারে ব্যবহারে—গৃহে সমাজে সর্ব্বত্রই যেন পরম হিন্দু সেকেলে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাজে থাকিতেন।

যেমন কথায় তেমনি কাজেও তিনি প্রকৃত বাঙালী ছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তিনি যেমন ইংরাজী কথা কহিতেন না, তেমনি বিশেষ আবশ্যক অনুসারে তিনি নিজের জাতীয় পোষাক ছাড়িতেন; বাধ্য হইয়াই—যেন তিনি অনিচ্ছায় বৈদেশিক পোষক পরিধান করিতেন।

আশুতোষ কেবল ফাঁকা মুখের ফাঁকা কথায় স্বদেশী বা স্বদেশভক্ত ছিলেন না। তিনি কেবল বক্তৃতায় জাতীয় বা স্বদেশী ভাব প্রচার করিতেন না। কাজে করিতেন।

অনেকেই জানেন আশুতোষ কখন বর্ত্তমানের অনুষ্ঠিত স্বদেশী সভায় গমন করেন নাই। তিনি 'তেমন সভায় বা রাজনৈতিক-সভায় কখন বক্তৃতাও প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে যে স্বদেশী-ভাব—স্বদেশের প্রতি—স্বজাতির প্রতি যে অনুরাগ ছিল, তাহা সত্যই অতুলনীয়। তবে

সে মহান ভাব তিনি মুখ ফুটিয়া বাহির করেন নাই—অথবা নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া কখনও জাহিরও করেন নাই।

আশুতোষ কাজে বা কথায় কখন ভণ্ড ছিলেন না। ভণ্ডামীকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। যে সকল লোক ভণ্ডামির ধ্বজা ধরিয়া আত্মগৌরব জাহির করিবার জন্য যত্ন চেষ্টা করিত, আশুতোষ তাহাদিগকে বিশেষ অশ্রদ্ধা করিতেন। যাহারা ভণ্ডামী জানিতেন না—ভণ্ডামীর ভানও জীবনে কখন প্রদর্শন করেন নাই, তাহাদিগকে তিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে এই জন্য তিনি পরম ভক্তির পাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাশয়দিগের প্রসঙ্গে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে সদাই মুক্তকণ্ঠ ছিলেন।

ঐ সকল ব্যক্তিগণ যে চরিত্র-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আশুতোষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এমন নহে। ইঁহাদের দ্বারা বঙ্গভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে বলিয়াও আশুতোষ তাঁহাদিগের প্রতি প্রাণের অনুরাগ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। আশুতোষ যখন তখন এই সকল মহাত্মাগণের প্রসঙ্গ ক্রমে যেন স্বতঃই কৃতজ্ঞ হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তিনি যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন বঙ্গের ঐ সকল বরেণ্য মহোদয় গণের পুস্তকাপাঠে যে বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে অনেক স্থলেই স্বীকার করিতেন।

বাঙ্গলা ভাষা যেন যথার্থই তাঁহার নিতান্ত প্রাণের অতি প্রিয় সামগ্রী ছিল। এ ভাব ছাত্র-জীবনে আশুতোষ লাভ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রাণের অনুরাগ যে কতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় বর্ত্তমানের বাঙ্গালী পদে পদে পাইয়া থাকে। সে কথা বলিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

একাদশ অধ্যায়।

আশুতোষ প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হইয়া যেন নবজীবন লাভ লাভ করিলেন। এখানকার বিশাল পুস্তকাগার—সেই পুস্তক-গারের বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নিচয় তাঁহার জ্ঞান-পিপাসু প্রাণে এক নবভাব নব আশার সঞ্চার করিল।

অগাধ সমুদ্র-সলিল বিহারী তিমি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইতে মহাসাগরে আগমন করিলে যেমন আনন্দিত হয়, পিঞ্জর-আবদ্ধ সিংহ বিশাল অরণ্যে আসিলে যেমন প্রাণের বিপুল উন্মুক্ততা অনুভব করে, আশুতোষ প্রেসিডেন্সির বিশাল পুস্তকাগার পাইয়া তেমনি পূর্ণ প্রাণের পুলক অনুভব করিতে লাগিলেন। আশুতোষ এই এক পাঠাগারের জন্যই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতি প্রাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন এই বিশাল লাইব্রেরি তাঁহার উন্নতির এক প্রধান কারণ।

যথার্থই বিশাল অরণ্যের সচ্ছন্দ-বিহারী সিংহ যেন এতদিন আঁধার কক্ষে আবদ্ধ রহিয়া মুক্তিলাভ করিল। আশুতোষের বিদ্যানুরাগী প্রাণ যেন এতকাল আঁধার নিভৃত কোণে আবদ্ধ থাকিয়া এতদিনে মুক্তিলাভ করিল। লাইব্রেরি দেখিয়া

আশুতোষের প্রাণ এমনই উথলিয়া পড়িল। আশুতোষ প্রাণের আবেগে এতদিন যে মহামন্ত্র সাধনের মহাক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন, যেন হঠাৎ সম্মুখে সেই মহাক্ষেত্রের দর্শন লাভ করিলেন। মরুভূমে নিপতিত পিপাসী প্রাণ যেন সহসা সুশীতল সলিল সমন্বিত সরসী-কূল লাভ করিল।

জ্ঞানগত বিদ্যাগত-প্রাণ আশুতোষ যেন এতকাল আঁধার আচ্ছন্ন শুষ্ক সংসারে অন্ধ ভাবে বিচরণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই সমুজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিতপরম রমণীয় নিকেতনে প্রবেশে অধিকার লাভ ঘটিল। আশুতোষের প্রাণ যাহা খুঁজিতেছিল, তাহাই লাভ করিল।—নিদাঘ-তপ্ত-চাতক প্রচুর বারিবর্ষণ লাভ করিল।

আশুতোষ ক্লাসে পাঠের সময় পাঠ সমাপনান্তে যতক্ষণ কলেজে থাকিতেন, ততক্ষণ নিভৃতে মন্ত্রসাধন-পরায়ণ সাধকের ন্যায় একমনে তন্ময় হইয়া বিশাল পুস্তকাগারের অগণ্য পুস্তক-রাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। তখন সত্যই তিনি আত্মহারা হইয়া বিভোর ভাবে কাল কর্ত্তন করিতেন। সময় সামগ্রীটার সত্ত্বা যেন আশুতোষের পক্ষে জগৎ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। সময় যে কখন তাঁহার কাছে আসিতেছে, কখন তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে তাহাও যেন আশুতোষের উপলব্ধি হইত না। এমনই আত্মহারা তন্ময় হইয়া আশুতোষ লাইব্রেরীর পুস্তক পাঠে নিরত হইতেন।

বহু জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু জাতীয় গ্রন্থ আশুতোষের প্রাণকে

বিভোর করিয়া রাখিত। আশুতোষের বুদ্ধি সর্ব্ববিষয়িনী—তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। সেই অপূর্ব্ব বুদ্ধি অসাধারণ প্রতিভার জ্ঞান-পীপাসা কোন বিদ্যাগারের বারি প্রদান করিতে পারে ?

তখনকার কালের তুলনায় প্রেসিডেন্সি-লাইব্রেরী অবশ্য খুব বড়ই ছিল। তখন যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ব্রীটনে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বহু সংখ্যক গ্রন্থই প্রেসিডেন্সিতে সংগৃহীত হইয়াছিল। আশুতোষ প্রথম ছাত্র-জীবনে যতটা তাঁহার সাধ্যের আয়ত্তাধীন, ততদূর পর্য্যন্ত প্রায় অনেক ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থ অধ্যয়নের সময় যে তাঁহাকে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে—আশুতোষ বিদ্যায় কেমন অনুরাগী—জ্ঞানের কি অপূর্ব্ব ভক্ত !

আশুতোষ এই সকল বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ পাঠের সময় এমনই চিন্তাশীল গবেষণা-পরায়ণ হইয়া আত্মনিয়োগ করিতেন, যে তখন তাঁহাকে দেখিয়া ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় বোধ হইত। তখন সত্যই তিনি বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইতেন।

আশুতোষের অনেক সমপাঠীর মুখে তাঁহার এই অধ্যয়ন ব্যাপারের কাহিনী শুনিয়া যথার্থই বিস্মিত হইতে হয়। এই সমপাঠী ব্যক্তিও আশুতোষের সহিত এক সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি আশুতোষের একটু উপরে পড়িতেন। ইনিও একজন 'ভালছেলে' ছিলেন। কয় বার

'স্কলারসিপ'ও লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সিতে পড়িয়াছিলেন। ইনি মুন্‌সেফ হইতে অবশেষে জেলার সেসন জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নিকট আশুতোষের অধ্যয়নে একনিষ্ঠা তন্ময়ত্ব সম্বন্ধে কথা আমরা বহুবার শুনিয়াছি। শুনিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছি।

ইনি একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—একটা গল্প কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। একটি লোক দাবা-খেলায় অত্যন্ত আসক্ত ছিল। সে দাবাখেলায় এমনই আত্মহারা বিভোর হইয়া পড়িত যে খেলিবার সময় তাহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। একবার খেলিবার সময় উহার ছেলেকে সাপে কামড়ায়। লোক আসিয়া সংবাদ দিল। কহিল—'তোমার ছেলেকে সাপে কামড়াইয়াছে।' প্রথমতঃ সে কিছুক্ষণ উত্তর করিল না। পরে কাণের কাছে চীৎকার করিয়া লোকে আবার কহিল। ততক্ষণ খেলিতে খেলিতে কহিল—'কিস্তি—কাদের সাপ'? আশুতোষকে পাঠের সময় ঠিক এমনি বাহ্য জ্ঞানহীন অবস্থায় দেখিয়াছি।'

আশুতোষ যথার্থই বিদ্যার বরপুত্র সরস্বতীর সাধক। আশুতোষ শিক্ষার পরম অনুরাগী। তিনি যথার্থই জ্ঞান অনুশীলনের জন্য—জ্ঞান প্রচারের জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। আশুতোষ অধ্যয়নের সময় একেবারেই বাহ্য-জ্ঞানহীন আত্মহারা হইয়া উঠিতেন।

এমন অধ্যয়ন-ব্রত ছাত্রের সম্মুখে বিশাল লাইব্রেরী যে

কি পরম উপাদেয় বলিয়া উপলব্ধি হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অনেকবারই বলা হইয়াছে—আশুতোষ গণিতের পরম অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন তখন সাধারণ পাঠ্য গণিত তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিত না। আশুতোষ কলেজে আসিয়া উচ্চ অঙ্কের গণিত-শাস্ত্র অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কলেজের প্রাঠ্য ও প্রেসিডেন্সির বিশাল লাইব্রেরীর গণিত সম্বন্ধীয় পুস্তক রাশি, তাঁহার গণিত-কৌতুহল-শিখায় ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিল। আশুতোষ উচ্চগণিত অনুশীলনের অবসর লাভ করিয়া পিপাসী-প্রাণের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন।

একে একে—ক্রমে ক্রমে তিনি বহু জটিল গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অধিগত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অভূতপূর্ব্ব গণিতাধিকার দেখিয়া মতিমান অধ্যাপক-কুল পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন।

গণিত-শাস্ত্র অতি জটিল ও কঠিন শাস্ত্র। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আয়ত্ত করিতে, যেমন মস্তিষ্কের আলোড়ন পরিশীলন প্রয়োজন, তেমনি কঠোর পরিশ্রম অধ্যবসায়ের সাধনা আবশ্যক। বাহ্য জড় জগতের বহু গুঢ়তত্ত্ব এই শাস্ত্র দ্বারা নির্দ্ধারিত ও মীমাংসিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব এই গণিত-শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। যদিও গণিত শাস্ত্র আলোচনার শ্রেষ্ঠ চরম ফল, এদেশে গণিত অনুশীলনে কোন দেশীয় ব্যক্তি আজিও লাভ করিতে পারেন

নাই, কিন্তু গণিতানুরাগ আশুতোষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি বিশেষ ছিল। প্রসিদ্ধ গণিত-বেত্তা পরাঙ্কপে প্রভৃতি দেশীয় মনস্বীগণই বা গণিত-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভের উপযুক্ত অবসর সুযোগ কৈ লাভ করিতে পারিলেন ?

আশুতোষ দেশের দৈন্য—জাতির হীনতা ভালই জানিতেন —বেশ বুঝিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রাকৃতিক গণিতানুরাগ তাঁহাকে পথ-ভ্রান্ত করিতে পারে নাই। তিনি গণিত শিক্ষার জন্য আন্তরিক সাধনা সাধিতে লাগিলেন। তিনি তজ্জন্য ধ্যান-রত হইয়া, সদাই অতি জটিল গণিতের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য প্রাণপণ সাধনা করিতে লাগিলেন।

তিনি ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার সহিত গণিতে উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। সে অদ্ভুত উন্নতি উৎকর্ষণের কথা শুনিলে সকলকেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়।

তিনি যখন এল, এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন এম, এ ক্লাসের পাঠ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণিত-বিদ্যা অনুশীলন করিতে লাগিলেন। আশুতোষ অল্পদিনেই প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই সেই এম, এ ক্লাসের অতি কঠিন ও জটিল অত্যুচ্চ গণিত-শাস্ত্র অধিগত করিয়া ফেলিলেন।

তিনি কলেজের পাঠাগারে দেখিলেন—প্রতীচ্য শিক্ষিত সমাজের বহু শ্রেষ্ঠ গণিত-শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু সাময়িক পত্র সজ্জিত রহিয়াছে। সে সকল পত্র দেখিয়া তাহাঁর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি একাগ্রচিত্তে ঐ সকল গণিত

শাস্ত্রীয় সাময়িক পত্র সমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। বোধ হয় আশুতোষের পূর্ব্বে কোন দেশীয় ছাত্রের মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় নাই। তিনি প্রথম হইতেই গণিত সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে স্বভাবতই ইচ্ছুক ছিলেন। সেই মৌলিক তত্ত্ব অনুশীলন করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন।

আশুতোষ গণিতের সকল বিষয়ই অনুশীলন করিতে বড় ভালবাসিতেন। গণিত শাস্ত্রের কোন বিভাগই তাঁহার অবহেলা বা অশ্রদ্ধার বিষয় ছিল না। কি বীজগণিত, কি জ্যামিতি, কি ত্রিকোনমিতি সকল বিভাগেই আশুতোষের ছাত্রকাল হইতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। যে সকল গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্র কলেজের পাঠাগারে আসিত, আশুতোষ সাগ্রহে সেগুলি অধ্যয়ন ও অনুশালন করিতেন।

একবার এইরূপ অধ্যয়নের সময় আশুতোষের মনে হইল—তিনি কোন মৌলিকতত্ত্ব সম্বলিত নূতন প্রবন্ধ বিলাতের কোন বিখ্যাত মাসিকপত্রে প্রকাশ করিবেন।

এই ভাবিয়া আশুতোষ ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি প্রতিজ্ঞার নূতন প্রমাণ একখানি বিখ্যাত গণিত-পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলেন।

গ্রেট ব্রীটনের মধ্যে গণিত অনুশীলনের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অতি বিখ্যাত। শুধু গ্রেট ব্রীটনই বা কেন—এখনকার সভ্য শিক্ষিত জগতের সকল গণিত অধ্যাপনার আলোচনার

বিদ্যাপীঠ হইতে কেম্ব্রিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি গণিত-আলোচনা গণিতের উৎকর্ষণ সম্বন্ধে অতিশয় অধিক—এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। গণিত-অনুরাগী গণিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুছাত্র বহু অধ্যাপক কেবল গণিত অনুশীলনের জন্যই কেম্ব্রিজ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে আগমন করেন।

এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানি বিখ্যাত গণিত সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্র প্রচারিত হয়। আশুতোষের ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার নূতন প্রমাণ তাহাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

যখন এই প্রবন্ধ উক্ত শ্রেষ্ঠ গণিত-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন আশুতোষ কলেজের ছাত্র। যে পত্রে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ হইলে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক পর্য্যন্ত আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই পত্রে আশুতোষের প্রবন্ধ গৌরবের সহিত প্রকাশিত হইল।

এইরূপ ব্যাপার তখনকার ছাত্র-সমাজের পক্ষে সত্যই এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব ব্যাপার। সাধারণ ছাত্রের পক্ষে এমন ঘটনা ঘটিলে—এমন শ্রেষ্ঠ বিলাতী পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, সে নিশ্চয়ই মহাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিত। সে হয়তো নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া দেশ আলোড়িত করিত—গগণ ফাটাইয়া ফেলিত। কিন্তু আশুতোষ চিরদিনই নির্ব্বিকার মহাপুরুষ। সুখে উচ্ছ্বসিত বা দুঃখে অবসন্ন হওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ

ব্যাপার ছিল। বিশেষতঃ তিনি জীবনের কোনকালেই সাধারণ ইতর প্রকৃতি ব্যক্তির ন্যায় আপনার প্রশংসা আপনি করিতেন না। আপনাকে কোন ব্যাপারে বড় করিয়া আপনি বলা কোন কালেই তাঁহার স্বভাব ছিল না।

বিলাতের এক অতি শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত পত্রে আশুতোষের নূতন গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল; কিন্তু এ কথা কখন বড় বেশী লোকে শুনিতেও পাইল না—জানিতেও পারিল না। অন্য সাধারণ ছাত্রের পক্ষে এইরূপ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিলে, হত তো কত ভাবে বক্তৃতার ঘন ঘটায় সে আকাশ ছাইয়া ফেলিত, অথবা সংবাদপত্রে কতই আন্দোলন আলোচনার ধূম উঠিত। কারণ তখন এদেশীয় ছাত্রের পক্ষে এরূপ ব্যাপার নিশ্চয়ই অতি অদ্ভুত অপূর্ব্ব বলিয়াই বিবেচিত হইত। যে সে পত্রিকা নহে—গণিতের লীলাক্ষেত্র স্বরূপ কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেষ্ঠ মুখপত্র—Cambridge messenger of Mathematics—যাঁহার নূতন মৌলিক প্রবন্ধ প্রকটন করে, সে ছাত্র নিতান্ত যে সে সাধারণ ছাত্র নহে। আনন্দ মোহন, পরাঞ্জপে বিলাতে যাইয়া বিখ্যাত রাঙলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আশুতোষ দেশে রহিয়া ঘরে বসিয়াও সেই প্রখ্যাতি সেই প্রতিষ্ঠায় সমঅধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি যদি কোন প্রতীচ্য দেশের শ্রেষ্ঠ সমাজের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতেন, তবে না জানি সভ্য শিক্ষিত জগতে কি হুল স্থূল

কাণ্ডই সাধিত করিতেন? তথাপি এই পতিত আঁধার-আচ্ছন্ন দেশ হইতেই তরুণবয়স্ক আশুতোষের অদ্ভূত প্রতিভাপ্রভা সুদূর পাশ্চাত্যে প্রবেশ লাভ করিল!

আমাদের মনে পড়ে সার আশুতোষ চৌধুরি বিলাত গমন করিয়া, তথাকার ছাত্র-সমাজের শ্রেষ্ঠ মুখপত্র স্বরূপ "ঈগল" নামক সাহিত্য-পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাহাতে দেশ বিদেশে তখন কেমন একটা আন্দোলনের উৎসাহ উচ্ছাস উঠিয়াছিল! সেই কথা লইয়া, তখন এদেশের বহু সংবাদ পত্রে বহু আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। সে ব্যাপার আজিও এদেশে অনেকেরই স্মৃতিপটে জাগরূক রহিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা এখানে উত্থাপন করিতে হইল। দুই আশুতোষই সেই সময়ের দুই উৎকৃষ্ট প্রধান ছাত্র ছিলেন। চৌধুরি আশুতোষ কৃষ্ণনগর কলেজের আর মুখোপাধ্যায় আশুতোষ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। চৌধুরি আশুতোষও প্রেসিডেন্সিতে পড়িয়া অবশেষে বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন ও কলিকাতা হাইকোর্টে কিরূপ কৃতীত্ব প্রদর্শন করেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

আমাদের আশুতোষ বিলাতে যান নাই—বিদেশেও গমন করেন নাই। দেশে থাকিয়াই সরস্বতীর সাধনায় মহাসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার বিদ্যাসাধনায় যে অদ্ভূত কৃতীত্ব-কীর্ত্তি তাহা না জানে কে? তিনি শিক্ষা-সম্বন্ধে এদেশে যে একটা

ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহা নিজ জীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্তে দূরীভূত করিয়াছিলেন।

আশুতোষের পূর্ব্বে এদেশে সাধারণতঃ একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বিলাতে না যাইলে, প্রতীচ্যের বিদ্যাপীঠে শিক্ষা না করিলে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানময়ী বিদ্যার সাধনা সফল হয় না। আর য়ুরোপ হইতে শিক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমন না করিলে, কেহ কি বিদ্যাক্ষেত্রে কি কর্ম্মক্ষেত্রে কোথাও বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বা কৃতীত্ব লাভ করিতে পারে না। তাই 'বিলাত প্রত্যাগত' শব্দটা একটা বিশেষ উপাধি-বিশেষণের ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি কেহ একখানি বাঙ্গলা উপন্যাস লিখিলে, তাঁহার নামের গোড়ায় 'বিলাত প্রত্যাগত' বিশেষণ যোগ করিলে যেন তাহার যোগ্যতা বিশেষরূপে বিবর্দ্ধিত হইত। অন্যপরে কা কথা কিছুদিন পূর্ব্বে স্বয়ং রবীন্দ্র নাথের পূর্ব্বেও কেহ কেহ 'বিলাত প্রত্যাগত' বিশেষণ প্রয়োগে কুণ্ঠা বোধ করিত না।

বিলাতে গমন বিলাতী শিক্ষা তখন এমনই সম্মানিত সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছিল; তখন অনেকে মনে করিত বিলাতযাত্রা না করিলে কিছুতেই শিক্ষার পূর্ণতা সাধিত হয় না। আশুতোষ নিজ শিক্ষার পূর্ণতা সাধনে—নিজ শিক্ষার দৃষ্টান্তে দেখাইয়াছেন সে ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। তিনি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন যে যথার্থ শিক্ষার্থী—যে প্রকৃতই বিদ্যাকে সাধনা

করিতে চায়, সে ইচ্ছা করিলে—যত্ন অধ্যবসায় অবলম্বন করিলে দেশে থাকিয়াই শিক্ষার শীর্ষদেশে আরোহণ করিতে পারে।

আশুতোষ দেশে থাকিয়া এমনই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন—এমনই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে এদেশীয়দিগের মধ্যে কোন ছাত্রই অদ্যাপি বিলাতে যাইয়া, য়ুরোপে বহুকাল কাটাইয়াও তাহা লাভ করিতে পারে নাই বলিলেও বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

আশুতোষ প্রেসিডেন্সি কলেজের বিশাল পুস্তকাগারের বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ কিছুদিনেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি চিরদিনই গণিতের উপাসক সাধক ছিলেন। গণিত সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সির লাইব্রেরীতে যত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ছিল, প্রায় সে সকলই তিনি অধ্যয়ন করিলেন। তাহাতে আশুতোষ এমনই কৃতীত্ব-লাভ করিলেন যে এলএ পড়িবার সময়, তাঁহার এমএর পাঠ্য-গণিত সমাধা হইয়াছিল।

গণিতের অনুশীলনে আশুতোষ বুঝিলেন যে ফরাসি ভাষা শিখিতে না পারিলে উচ্চ গণিত-অধ্যয়নের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। কারণ বহু গণিতের বড় বড় অধ্যাপক প্রায় ফরাসি জাতীয়। তাঁহাদের বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ফরাসি ভাষায় বিরচিত।

বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর লাপ্লাসের নাম শিক্ষিত-জগতে কে না জানে? ইঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ উচ্চ গণিত শাস্ত্রের আধার। তিনি মৌলিক গবেষণায় গণিত-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত

আছেন। বহু জটিল রহস্যপূর্ণ গণিতাঙ্কের অদ্ভুত সমাধান ইঁহার প্রণীত বহু উৎকৃষ্ট গণিত গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল উপাদেয় অপূর্ব্বগ্রন্থ ফরাসি ভাষায় লিখিত।

আশুতোষ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে করিলেন, ফরাসী ভাষা শিক্ষা না করিলে উচ্চ গণিত-শিক্ষায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। ফরাসী ভাষা শিক্ষা নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু ফরাসি শিখায় কে? ফরাসি ভাষার শিক্ষক অধ্যাপক দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আশুতোষের প্রবল পুরুষকারের সম্মুখে কোন বাধাবিঘ্নই তিষ্ঠিতে পারে না। আশুতোষ প্রবল পুরুষকারের আলয় পুরুষ-সিংহ।

পুরুষ সিংহ আশুতোষ সিংহ-বিক্রমে ফরাসি ও লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিনে তিনি ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিলেন।

আশুতোষ যখন যে বিষয় শিখিতে আরম্ভ করিতেন, তাহাই যেন তাঁহার পক্ষে খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইত। সিংহ যেমন ভক্ষণের পূর্ব্বে শিকার লইয়া খেলা করে, আশুতোষ তেমনি পাঠ্য-বিষয় লইয়া যেন খেলা করিতেন, যতক্ষণ না তাহা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতেন। এমনই ছিল তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-প্রতিভা যে যে কোনরূপ জটিল বা কঠিন বিষয় হউক না কেন, অধ্যয়নে তাহাঁর আনন্দ তুষ্টি ভিন্ন কখন কষ্ট বা বিরক্তি বোধ হইত না। পক্ষান্তরে অধ্যয়নের বিষয় যতই কঠিন যতই

জটিল হইত, তাহা আয়ত্ত করিতে আশুতোষের আনন্দ কৌতূহল যেন ততই বর্দ্ধিত হইত।

এই জ্ঞান-পীপাসা বিদ্যানুরাগ হইতে বুঝা যায়—আশুতোষ কর্ম্মক্ষেত্রে যেমন কর্ম্ম-যোগী ছিলেন, তেমনি জ্ঞান-ক্ষেত্রে জ্ঞান-যোগী ছিলেন। এমন অসাধারণ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সংসারে নিতান্তই দুর্ল্লভ। এই অসাধারণ প্রতিভার সহিত অসাধারণ কর্ম্মশক্তির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বঙ্গে যে কি অদ্ভূত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, হতভাগ্য বাঙ্গালী, অধঃপতিত বঙ্গ বড় দুর্ভাগ্যের পাপে তাহার চরম ফল উপভোগ করিবার অবসর লাভে বঞ্চিত রহিল! ভাগ্যহীনা বঙ্গজননীর ক্রোড় হইতে করালকাল অকালে কি সন্তান-রত্নই অপহরণ করিয়াছে!

আমরা বড় প্রাণের বেদনায় অল্পদিন পূর্ব্বে একজন বড় লোকের মুখে বড়ই দুঃখের কথা শুনিয়াছি। তিনি মর্ম্মাহত হইয়া বড় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—সে সোনার বাঙ্গালা আর সে বাঙ্গালা নাই—ভারতের সে বড় বাঙ্গালী আর সেই বড় বাঙ্গালী নাই—ধর্ম্মবিভাগে রাজা রামমোহন, কেশব চন্দ্র, বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে বাঙ্গালীকে যে সমুচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তেমন মহাপুরুষ আজ আর বঙ্গে কৈ? সুরেন্দ্রনাথ, লালমোহন, কালীচরণ প্রভৃতি বাগ্মীগণ কংগ্রেসাদি সভাস্থলে বক্তৃতার ছটায় যে বৈশিষ্ট, কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণদাস, শিশির কুমার, মনমোহন, আনন্দমোহন প্রভৃতি লেখক ও কর্ম্মীগণ কর্ম্মে ও লেখনী পরিচালনে রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে যে নেতৃত্বের সম্মান-ভূষণে ভূষিত করিয়া-ছিলেন, তেমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই বা বঙ্গদেশে আর কোথা? এই বলিয়া—এইরূপ চিন্তায় চিন্তান্বিত হইয়া বাঙ্গালী যখন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, তখন বঙ্গের বিদ্যাপীঠে কর্ম্মক্ষেত্রে আশুতোষ রূপ ভাস্কর সমুদিত হইয়া, হতাশ বাঙ্গালী-জীবনকে কি আশায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, সে প্রদীপ্ত প্রভাকর পূর্ণ প্রাখর্য্যে ভারতের মধ্যগগণ উদ্ভাসিত করিতে করিতেই করাল রাহু অকালে গ্রাস করিল!

আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী অপূর্ব্ব প্রতিভার কাহিনী শুনিতে শুনিতে সত্যই বিমুগ্ধ স্তম্ভিত হইতে হয়। অনেকে অবগত আছেন যে এমন অনেক ছেলে আছে যাহারা কেবল স্মৃতি-শক্তির ফলে বড় বড় পরীক্ষায় অতি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়। আশুতোষ কেবল স্মৃতিশক্তির বলে, কোন রকমে মুখস্থ করিয়া কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন না। পূর্ব্বেই আমরা বহুবার একথা বহুভাবে বলিয়াছি যে আশুতোষ যে বিষয়ে যে গ্রন্থ যখন অধ্যয়ন করিতেন, তখন তন্ন তন্ন করিয়া, বিশেষ আলোচনা অনুশীলন দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইয়া পাঠ করিতেন—তাহা একেবারে নিজস্ব রূপে আয়ত্তীকৃত করিতেন। ইহা অবশ্য তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-প্রাখর্য্যেরই পরিচয়—সূক্ষ্মচিন্তা গভীরগবেষণারই কথা। ইহা ব্যতীত তাঁহার যে কিরূপ অসাধরণ স্মৃতি-শক্তি ছিল, তাহারও পরিচয় অনেক ব্যাপারে অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে।

একটি কথা সাধারণত শুনিতে পাওয়া যায় এবং সে কথার মূলে কিছুই সত্য নাই এমনও নহে। কথাটি এই যে চিন্তাশক্তি যাহার প্রবল—বুঝিবার সামর্থ্য যাহার অধিক, স্মৃতিশক্তি—ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তুলনায় তাহার অল্প বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অনেকস্থলে এই নির্দ্দেশের বৈলক্ষণ্য বৈপরীত্য দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং আশুতোষ তাহার এক উজ্জ্বল নিদর্শন ছিলেন। আশুতোষের যেমন নূতন-তত্ত্ব—জটিল তত্ত্ব ভাবিবার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল, তেমনি যাহা একবার জানিয়া বুঝিয়া ধরিয়া লইতেন, তাহা বিশেষরূপে বহুকাল ধরিয়া রাখিতে পারিতেন। এদেশে বহু 'স্মৃতিধরের' কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, আশুতোষও নিজে সেইরূপ এক অদ্ভুত স্মৃতিধর ছিলেন।

আশুতোষের সাহিত্যে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তির কথা তাঁহার অল্প বয়সেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে একটি কথা প্রচারিত আছে। তিনি যে শ্রেণীতে—যখন পাঠ করিতেন, তখনই সেই অদ্ভুতশক্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহার শিক্ষক ও সহপাঠী সকলেই বিস্মিত বিমোহিত হইত।

তিনি যখন প্রেসিডেন্সিতে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন রবসন সাহেব তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল। তিনি ছাত্রগণকে মুখে মুখে পুস্তক বিশেষের গল্প বলিয়া যাইতেন। ছাত্রগণের আপন আপন ইংরাজীতে সেই সকল গল্প লিখিতে হইত।

একবার অধ্যাপক রবসনের এইরূপ একটি গল্প তিনি এমন সুন্দর ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন যে আশুতোষের লিখিত ইংরাজী সেই উৎকৃষ্ট পুস্তকের ইংরাজীর সহিত অনেকাংশে মিলিয়া গিয়াছিল। রবসন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; মনে করিলেন আশুতোষ মূল পুস্তক হইতে নকল করিয়া লিখিয়াছেন। অধ্যাপক রবসনকে বহু যত্নে বুঝাইয়া তাঁহার মনের ভ্রম দূর করিতে হইয়াছিল। সেই নবীন অবস্থায় আশুতোষের ইংরাজী এতই সুন্দর হইত।

আশুতোষ এলএ পড়িবার সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিলেন। টাইফইড জ্বরে তাঁহার জীবনাশা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছিল। বিশেষ চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া আবার দক্ষিণ হস্তের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট ভোগ করেন। এই সকল কারণে তাঁহার পাঠের বড় বিঘ্ন ঘটে।

এই সকল কারণে এল, এ পরীক্ষায় আশুতোষ তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু আশুতোষ যে বিদ্যার বরপুত্র! সকল বিদ্যাই যেন আশুতোষের পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধবিদ্যার স্বরূপ ছিল।

এল এ পড়িবার সময় আশুতোষের পাঠে বিশেষ বিঘ্ন ঘটায়, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ সেবারে তাহাঁকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু আশুতোষ পরীক্ষা দিবার জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এবং আন্তরিক বিশ্বাস করিতেন যে প্রকৃত বিদ্যা—যথার্থ বিদ্যার ফল যে জ্ঞান, তাহা

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার মধ্যে বিশেষ কিছু নাই। প্রকৃত বিদ্যা—যথার্থ জ্ঞান আপন মস্তিষ্কের সামগ্রী—মনের সম্পদ। পাশ করিলেই যে বিদ্যা বুদ্ধিতে চতুর্ভুজ হওয়া যায় এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না—তাঁহার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সেরূপ ধারণা থাকিতেই পারে না। তবে যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে পাশের ডিপ্লোমা কর্ম্মক্ষেত্রের পক্ষে বিশেষ বড় দারোয়ান। তাহাকে হাত না করিতে পারিলে, কর্ম্মক্ষেত্রের বড় জায়গায় সহজে ঘেঁসিবার উপায় নাই। নতুবা বিদ্যার জন্য আশুতোষের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাবান ছাত্রকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বা পরীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেট হাত করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে ছেলে এল এ পড়িতে পড়িতে এম এর পাঠ্য নিজেই অতি অল্পসময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে, তাহার আবার বিদ্যালয়ে পাঠের প্রয়োজনই বা কি, পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেটের দরকারই বা কি? আশুতোষের পক্ষে উনিভারসিটির প্রদত্ত বিদ্যার সার্টিফিকেট প্রাপ্তি আর আলোকদানের জন্য সূর্য্যের সার্টিফিকেট লাভ একই কথা।

আমরা হিন্দু—পূর্ব্বজন্মে—জন্মান্তরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের নিশ্চিত ধারণা জ্ঞান-ঋষি আশুতোষ কেবল এক জন্মে নহে—বহু জন্ম জন্মান্তরে বিদ্যায় জ্ঞানে—বিদ্যার ধ্যানে—বিদ্যার সাধনে বহু যোগ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

অনেকের অনেক বাধা আপত্তি সত্ত্বে আশুতোষ এল এ

পরীক্ষা দিলেন। শুনা যায় পরীক্ষার সকল প্রশ্ন তিনি সম্যক বা সুচারুরূপে লিখিতেও পারেন নাই। একটু বেশী লিখিতে লিখিতে আশুতোষের দক্ষিণ হস্ত অবশ হইয়া পড়িত—অসাড় হইয়া উঠিত। অসাড়হস্তে আশুতোষ বৈকালিক প্রশ্নের উত্তর সুচারুরূপে লিখিতে পারিলেন না। পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ যাইয়া তড়িত-যন্ত্র প্রয়োগে আশুতোষের হস্ত সবল করিলে, তিনি কোনরকমে আরও কিছু লিখিলেন।

অনেকেই মনে করিল, যেরূপ অবস্থায় আশুতোষ পরীক্ষা দিলেন, তাহাতে বিশেষ কৃতীত্বের সহিত পাশ করিতে পারিবেন না। আশুতোষের আত্মীয় স্বজন ও হিতৈষীগণ হতাশহৃদয়ে দিনের পর দিন গণিতে লাগিলেন। কেহই আর আশুতোষের পরীক্ষার কথা লইয়া, বিশেষ আন্দোলন আলোচনা করিতে সাহস করিলেন না। 'যাহা হয় হইবে' ভাবিয়া সকলে একরূপ নিরাশ হইয়া রহিলেন।

যথাসময়ে পরীক্ষা-ফল লইয়া গেজেট বাহির হইল। সকলে দেখিয়া মহা বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন! একি! যাহার পাশ হইবারই সম্ভাবনা ছিল না—যে অবস্থায় পরীক্ষা দিলে কোন ছেলেই প্রায় পাশ হইতে পারে না—অসাধারণ ছাত্র দুস্তর পরীক্ষা-সাগর সেই দশায় অনায়াসে অবহেলে পাশ হইলেন।

আশুতোষ শুধু যে সে ছেলের মত যে সে রকমে পাশ হন নাই। সে বারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল এ পরীক্ষায় আশুতোষ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন! অন্য ছাত্রের

পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের কথা বলিয়াই বিবেচিত হইত। আশুতোষের মত ছাত্রের পক্ষে ইহাতে গর্ব্বগৌরবের কিছুই নাই। কারণ তাঁহার মত অসাধারণ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের পক্ষে সাধারণ সংসারের সাধারণ কাজে বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য কিছুই নাই। তিনি যাহা সহজে সমাধা করিবেন তাহা অন্য সাধারণের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। সব্যসাচী যে লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়াছিালন, তাহাতে তাঁহার কষ্টও কিছু হয় নাই—তাহাতে তাঁহার অসাধ্যও কিছুই ছিল না।

আশুতোষ যাহা করিতেন, তাহা যেন সহজে সচ্ছন্দেই সমাধা করিতেন। আশুতোষ সত্যই যেন এ যুগের সত্যদর্শী সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বক্ষম, সর্ব্বসাধক ছিলেন। দেশের লোক তাঁহাকে তাহাই মনে করিত। তাই দেশ বড় আশা করিয়া বুক পাতিয়া বসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল—আশুতোষ কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া দেশের জন্য কত কি না জানি করিবেন। করাল কাল, অকালে বাঙ্গালীর সে সর্ব্বকর্ম্মী সব্যসাচীকে হরিয়া লইল! সুখ সৌভাগ্যের দৃশ্য আর দেখিতে দিল না?

আশুতোষ যেন সবই সাধনা করিতে পারিতেন। যদি তিনি মিলিটারী বিভাগে যাইতেন, তবে 'কমাণ্ডার' হইতেন। সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ম্মী—সকল সাধনার সাধক আশুতোষের সম্বন্ধে এমনি একটা সহজ সাধারণ বিশ্বাস দেশের লোকের হৃদয়ে—দেশের লোকেরই বা কেন—যে

আশুতোষকে দেখিয়াছে—জানিয়াছে—তাহারই হৃদয়ে আধিপত্য প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিত।

অসাধারণ পুরুষের—অদ্ভুত পুরুষকারের এই তো লক্ষণ। নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, ওয়াসিংটনকে দেখিয়া, যে দেখিতে জানে, সে গোড়া হইতেই দেখিয়া চিনিয়াছিল—এ ছেলে যে সে ছেলের দল নয়। আশুতোষকে দেখিয়া কেবল আশুতোষের পিতা-মাতা নয়—বাঙ্গালীর মধ্যে চক্ষুষ্মান যে, সেই বুঝিয়াছিল —আশুতোষ বড় সহজ ছেলে নয়।

আশুতোষ, নেপোলিয়ান, ওয়াশিংটন বা ওয়েলিংটনের মত খুব বড় কাজ করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি যে অভিশপ্ত বাঙ্গলা দেশে—পতিত বাঙ্গালী জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খুব বড় কাজ করিবার অবসর-ক্ষেত্রই বা তাঁহার জীবনে কোথায়?

বিদ্যাব্যাপারে—শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতীত্ব আশুতোষের পক্ষে অতি সহজ স্বভাবসিদ্ধ। আশুতোষ এল এ পরীক্ষায়, তেমন অবস্থা-বৈগুণ্যেও যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন, আমাদের মনে হয় সেটা অতি-মানব আশুতোষের পক্ষে কিছু বেশী বা বিশেষ কথা নয়। কিন্তু তাহাতেও অনেকেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এতদিনে এমন কঠিন রোগ-ভোগ করিয়া, লিখিবার হস্ত দক্ষিণ হস্তের ব্যাধি লইয়া তিনি যে এমন ভাবে এল এ পাশ করিলেন, তাহা অন্য ভাল ছেলের পক্ষে হইলেও বড় বিস্ময়ের কথা বৈকি। কিন্তু আশুতোষের পক্ষে

তাহা একেবারেই বিস্ময়ের বিষয় নয়। আশুতোষ যে স্বয়ং স্বতঃই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

আশুতোষ এল এ পাশ করিয়া বি এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এ পরীক্ষার বহু পাঠ্য পুস্তক তিনি পূর্ব্বেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বি এ পরীক্ষায় তিনি এ কোর্স লইয়াছিলেন। দর্শন তাহাতে একটি প্রধান বিষয় ছিল। তিনি দর্শন-শাস্ত্রে একশত নম্বরের মধ্যে ৯৬ নম্বর পাইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

তখন বিএ তে, হামিল্টন, রীড, বেইন, উবারওয়েগ প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ প্রতীচ্য দার্শনিকগণের গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ সমূহ অধ্যপনা ওঅনুশীলন হইত। তাহাতে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব (ontology) মানস-তত্ত্ব (Psychology) এবং নীতি-তত্ত্ব (Ethics) প্রভৃতি জটিল তত্ত্ব পড়িতে হইত। সে সকল বিষয় পড়িয়া আত্মগত করিতে হইত। আশুতোষ, দার্শনিক ক্ষেত্রে যে কিরূপ গভীর চিন্তাশীল ও কৃতী ছিলেন, তাহা এই পরীক্ষার ফলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

অনেকের বিশ্বাস যে আশুতোষ কেবল গণিত, বিজ্ঞানাদি বাহ্য ব্যাপারে অনুরাগী ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অধ্যাত্ম-ব্যাপারে অথবা মানসতত্ত্বে তিনি তেমন অনুরক্ত বা কৃতকার্য্য হন নাই। যাঁহারা ফিলসফিতে আশুতোষের এই কৃতীত্বের কথা অবগত আছেন, তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস নিশ্চয়ই বিদূরিত হইয়াছে।

আশুতোষ যে জড়ের অতীত—কেবল বুদ্ধি চিন্তা গভীর গবেষণার বিষয়ও বিশেষ রূপে বুঝিতে ও চিন্তা করিতে সমর্থ ছিলেন, তাহা এই একমাত্র দৃষ্টান্তে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

দর্শন শাস্ত্র বিশেষ দুরূহ ও জটিল শাস্ত্র। তাহা বিদ্যার্থী মাত্রেই জানে। এই জন্য তখন বহু ভাল ভাল ছাত্রও এমন কঠিন বিষয় লইয়া পরীক্ষা দিতে সাহস করিত না। যাহারা বিশেষ সাহসী হইয়া দর্শন বিষয় গ্রহণ করিয়া,—পরীক্ষা দিত, তাহারা অনেকেই পাশ হইতে পারিত না। যদিও কেহ কেহ কখন কখন পাশ হইত, কিন্তু এতো বেশী নম্বর পাইয়া এমন কৃতীত্বের সহিত কোন ছেলে কখনই পাশ হইতে পারে নাই। আশুতোষের কুশাগ্রবৎ ব্রাহ্মণ বুদ্ধি দার্শনিক গবেষণায়ও যে বিশেষ দক্ষ ছিল, তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ—এই একমাত্র ঘটনাতেই ভালরূপে পাওয়া যায়।

আশুতোষ কেবল যে দর্শনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিলেন, এমন নহে, মোট বি-এ পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান লাভ করিলেন। তাহাতে আশুতোষের আত্মীয় স্বজন তো বিশেষ আনন্দিত হইলেন; যাহারা আশুতোষকে ভালরূপে জানিত—চিনিত, তাহারা সকলেই পরম সুখী হইল।

যাহারা আশুতোষকে জানিত, তাহারা পূর্ব্ব দুই পরীক্ষায় এণ্ট্রান্সে ও এল এতে কেন যে তিনি প্রথম স্থান লাভ করিতে পারিলেন না, তাহাই মনে করিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত

হইয়াছিল। এমন অসাধারণ প্রতিভাবান ছাত্রকে ছাড়াইয়া যে অন্য কোন ছাত্র পরীক্ষার উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। তাই পূর্ব্বের দুই পরীক্ষায় আশুতোষের 'প্রথম' না হওয়ার জন্য তাহারা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিল। এবারে আশুতোষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ দর্শনে, সকলেই পরম আনন্দিত হইল।

বি-এ পরীক্ষায় আশুতোষ প্রথম হইয়াছিলেন। আবার দর্শন-বিভাগে যেমন সকল ছাত্রের অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া সকলের উপরে প্রথম স্থান পাইয়াছিলেন, তেমনি আরও অপর দুই বিষয়েও তিনি সকলের উপরে উঠিয়া সর্ব্ব-প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষার এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধি সফলতা কে কোথায় দেখিয়াছে?

আশুতোষ অতি ধীর সংযত পুরুষ বলিয়া চিরদিনই বিখ্যাত ছিলেন। তবে কখন কখন জ্ঞান-পীপাসায়—বিদ্যানুরাগে অধীর হইয়া, নিয়ম শৃঙ্খলার মিতাচার লঙ্ঘন করিয়া ফেলিতেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপ অধ্যয়নে অনিয়মের জন্য আশুতোষ কয়বার অতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর সেই কারণেই তিনি পূর্ব্ব দুই পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিতে পারেন নাই।

এবারে আশুতোষ বিশেষ সতর্ক হইলেন। স্বাস্থ্য

সম্বন্ধে আর তিনি উদাসীন রহিলেন না। নিয়ম বা সংযমকে তিনি আর উপেক্ষা অবহেলা করিয়া চলিতে পারিলেন না। এখন হইতে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই তিনি নিয়মিত ভাবে অধ্যয়নের বিধি-ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তদবধি আর কখন অধিক রাত্রি জাগিয়া লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতেন না। ডাক্তার পিতাও এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। আশুতোষ কেবল যে তাঁহার একারই প্রিয় সন্তান ছিলেন না। আশুতোষ দেশ-মাতৃকারও প্রাণের পুত্র ছিলেন। তাঁহার দ্বারা দেশের ও দশের যে খুব বড় কাজ সংসাধিত হইবে, এ বিশ্বাস সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানের আধার পিতা গঙ্গাপ্রসাদের ছিল,—আর ছিল তাহাদের সকলেরই যাহারা আশুতোষকে জানিত—আশুতোষের গুণ শক্তির সফলতা বুঝিতে পারিত।

প্রেসিডেন্সিতে তৎকালে আরও একখানি শ্রেষ্ঠ সামরিক পত্র বিলাত হইতে আসিত। যাহা সহজে সাধনীয় নহে, এমন বহু জটিল তত্ত্ব উহাতে প্রকাশিত হইত। কেবল ইংলণ্ডের নহে, সমগ্র য়ুরোপের বহু বহু জ্ঞানী মনীষা-সম্পন্ন পণ্ডিত ঐ পত্রে নিজ নিজ প্রশ্ন প্রেরণ করিতেন। তাঁহাদের কেহ প্রশ্ন পাঠাইতেন—কেহ বা উত্তর দিতেন। আশুতোষেরও ঐ পত্রে ঐরূপ প্রশ্ন প্রেরণ করিতে ঔৎসুক্য জন্মিল। সেই ঔৎসুক্যের বশে তিনি গণিত সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রবন্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী পত্রে প্রকাশিত হইয়া

ছিল। প্রবন্ধটি গবেষণায় গুরুত্বে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

গণিত-বিজ্ঞানাদি বহু বিষয়ে কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই আশুতোষের অপূর্ব্ব প্রতিভা খ্যাতি ছাত্র অবস্থা হইতেই প্রকটিত হইয়াছিল। যখন তিনি প্রেসিডেন্সির ছাত্র—তখনই অনেকে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় নিদর্শন পাইয়া বুঝিয়াছিলেন যে আশুতোষ সত্যই বিধাতার এক অসাধারণ সৃষ্টি।

বাস্তবিক আশুতোষ যে কেবল পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বড়—বা বিদ্যাপীঠের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বড় এমন নহে। তিনি সর্ব্ব-ক্ষেত্রে সর্ব্ব বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ—মহাপুরুষ ছিলেন। রায়চাঁদ প্রেম চাঁদ বৃত্তি তো বহু ছাত্রই লাভ করিয়াছে। এল এ, বি-এ, এম-এ পরীক্ষাতেও তো অনেক ছেলে শ্রেষ্ঠ হইয়া পাশ করিয়াছে। কিন্তু এমনটি—কি বিদ্যাক্ষেত্রে কি কর্ম্মক্ষেত্রে এমনটি—এমন ছেলে আর কে?

আশুতোষ, অধ্যয়নকাল হইতেই গ্রন্থ ও বহু প্রকারের পত্রিকাদি সংগ্রহের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। উচ্চশিক্ষার সময় তাঁহার পুস্তকাদি সংগ্রহের ব্যগ্রতা বিশষ বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এপক্ষে পিতা তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতে—অর্থ দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

আশুতোষের পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদও স্বয়ং মহা জ্ঞানপিপাসু বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে পিতা পুত্র উভয়ে যেন জ্ঞান লাভের জন্য, বিদ্যাপ্রচারের জন্য, তৎকালের সুশিক্ষাহীন সুপ্ত বঙ্গসমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পিতা যেমন পুত্রের উপযুক্ত, পুত্রও তেমনি পিতার উপযুক্ত। উভয়েই বিদ্যাপীঠে দাঁড়াইয়া ভারতীর সাধনায় বিভোর ছিলেন।

আশুতোষ, সেই পাঠ্যঅবস্থায় বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি সংগ্রহ করিলেন। ছাত্রঅবস্থায় তিনি যে সকল পুস্তকে স্বীয় পুস্তকাগার পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা বহু প্রবীণ কৃতবিদ্যের লাইব্রেরিতে পরিদৃষ্ট হয় না। সে সকল অধিকাংশই দর্শন গণিত ও বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তক। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের লীলাক্ষেত্র-স্বরূপ যে পুস্তকাগার ভবিষ্যতে বঙ্গের এতো বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহার সূত্রপাত এইরূপে আশুতোষের ছাত্র-জীবনেই ঘটিয়াছিল। এই পুস্তকাগারে যে জগতের কতই অমূল্য সম্পদ আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিশাল পুস্তকাগারের তুলনা বঙ্গে তো নাই-ই—বঙ্গের বাহিরে আছে কিনা তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এমন কি রাজকীয় লাইব্রেরীও কোন কোন গ্রন্থ-সম্পদে আশুতোষের এই লাইব্রেরীর সহিত সমতুল হইতে পারে না। একমাত্র এই পুস্তকাগার দেখিলেই

ইহার সংস্থাপক স্বত্বাধিকারী যে কত বড় বিদ্যানুরাগী জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আশুতোষ যে জ্ঞান-অর্জ্জনের জন্য—জ্ঞান প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা এক এই লাইব্রেরী দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যাহারা জ্ঞানের জন্য মানবজীবন ধারণ করে—একমাত্র জ্ঞানলাভ যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার তাহাদের প্রধান সহায়—শ্রেষ্ঠ সম্বল। এ কথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি—আবার বলিতেছি। কারণ আশুতোষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ—জ্ঞানলাভ—বিদ্যা অর্জ্জন।

আশুতোষকে জানিতে হইলে—তাঁহার জীবনী যথার্থ-ভাবে বুঝিতে হইলে—তাঁহার বিদ্যা-অর্জ্জনের—জ্ঞান শিক্ষার দিকটা ভালরূপে অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে হয়। আমাদের মনে হয় আশুতোষের বিখ্যাত বিদ্যাগারে যাইয়া একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাঁহার সংগৃহীত অমূল্য অতুল্য পুস্তকরাশি দেখিলেই বুঝা যায়—আশুতোষ কি ছিলেন—আর কত বড় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

একটা বড় দুঃখের কথা অনেক সময়ে এদেশে শুনিতে পাওয়া যায়। কথাটি অবশ্য সাধু-উক্তি—ঐ সাধু উক্তিতে সত্য সারত্ব যথেষ্ট আছে। সাধু কথায় উক্ত হইয়াছে যে 'বহু পণ্ডিত শকুনির ন্যায়।' শকুনি উড়িতে উড়িতে উর্দ্ধে উঠে। উর্দ্ধে উঠিয়া গগনের অতি উচ্চ দেশে গমন করিয়া

থাকে। আকাশের সেই সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে সে পরমানন্দে বিহার করিতে থাকে। যদিও এইরূপ অত্যুচ্চ প্রদেশে সে অনির্ব্বচনীয় পরম সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, কিন্তু তাহা হতভাগ্য শকুনির ভাগ্যে ঘটে না। সে যে নিতান্ত ভাগ্যহীন অপকৃষ্ট ঘৃণিত জীব! তাহার ভাগ্যে সেই সর্ব্বোচ্চ স্থানে—পরম পবিত্র প্রদেশে—পরম শান্তি-সুখ উপভোগ ঘটে না। যেখানে উঠিলে—যেস্থানে অবস্থান করিলে, মনে পরম পবিত্র ভাবের উদয় হইবে—যে স্থানে অবস্থান করিলে—জীবনে পরম শান্তি সম্ভোগ হইবে—মহাআনন্দ ঘটিবে, এমনই উর্দ্ধস্থিত সে স্থান! সেখানে সংসারের কোলাহল পঁহুছিতে পারে না—মর জগতের পাপ-তাপ যেন সেস্থানে যাইতে পারে না—এমনই উচ্চ স্বর্গ-সন্নিধানে সেই স্থান! এমনই পবিত্র স্থানে উর্দ্ধ স্তরে শকুনি উড়িতে উড়িতে গমন করে—এমনই স্থানে সে বিহার করে, কিন্তু প্রাণ থাকে তাহার অতি নিম্নস্থানে—নীচক্ষেত্রে। যেস্থানে মৃতপশুর দেহ নিক্ষিপ্ত মহা অপবিত্র কুৎসিৎ স্থান—অতি উচ্চ গগন-বিহারী—শকুনির সতৃষ্ণ দৃষ্টি, সেই স্থানে সতত নিবদ্ধ হইয়া থাকে। এমন উচ্চ—এমন পবিত্র স্থানে স্বর্গ সন্নিধানে রহিয়াও শকুনির লোলুপদৃষ্টি 'গো-ভাগাড়ে' থাকে। কেন এমন হয়? নিয়তি স্বভাবই তাহার একমাত্র কারণ। এই শকুনির সহিত তুলনা করিয়া সাধুগণ বলেন, বহু বিদ্বান পণ্ডিত ঐ

শকুনির সদৃশ হেয় ঘৃণিত। কেননা তাহারা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সামান্য বিষয় সম্পদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। তাহারা যতই জ্ঞান লাভ করুক না কেন—যে কোন বিদ্যাই অর্জ্জন করুক না কেন, তাহাদের মন—তাহাদের জ্ঞান চিন্তা সবই একমাত্র সামান্য বিষয়-ভোগ—আর সম্পদ-লাভের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন পড়িয়া শুনিয়া—শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া, যে বিষয় ভোগের ফল বর্ত্তমানে ভ্রম-মোহ মাত্র—পরিণামে শোক, অবসাদ অনুতাপ, অনুশোচনা তাহারই জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া মরে। উচ্চ গগনে রহিয়া, শকুনি যেমন 'গোভাগাড়ে' সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে, পণ্ডিত তেমনি শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া, গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াও তুচ্ছ বিষয় ভোগের জন্য লোলুপ হইয়া বেড়ায়।

এইরূপ পণ্ডিত প্রকৃত পণ্ডিত নহে। ইহারা কখনই প্রকৃত জ্ঞানী পদবাচ্য হইতে পারে না। পণ্ডিত কে? প্রকৃত জ্ঞানী কে? যে জ্ঞান-চর্চ্চার শেষ সীমায় যাইয়া, তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছে সেই প্রকৃত পণ্ডিত। 'পণ্ডিতঃ সমদর্শীন' পাণ্ডিত্য-লাভে যে দিব্যচক্ষু পাইয়াছে, তজ্জন্য যাহার সমত্ব বোধ হইয়াছে—সেই তো প্রকৃত পণ্ডিত। তাহার নিকট কামিনী কাঞ্চন যথার্থই অকিঞ্চিৎকর—লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে তাহার আর পার্থক্য বোধ থাকে না। কারণ সে যে পাপতাপময় পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে—সামান্য সংসার আশক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

অনেকে এই তত্ত্ব-কথার সূত্র ধরিয়া আধুনিক বহু মহাত্মনের

চরিত্র কথা বিচার বিশ্লেষণ করিতে চায়। তাহারা মনে করে গেরুয়া কাপড় পরিয়া লোটা কম্বল লইয়া না ঘুরিলে, অথবা দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করিলে সে কখন প্রকৃত বিদ্যার বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। তাহারা কথায় কথায় জনক ঋষির কথাও বলে, কিন্তু আপনাদের সমসাময়িক মহাপুরুষের চরিত্র কথা আলোচনা করিবার সময় সেই আসল কথাটা ভুলিয়া যায়।

আশুতোষ, বাহিরে যাহাই থাকুন—যে ভাবেই চলুন, অন্তরের অন্তস্তলে তিনি ত্যাগী মহাযোগী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বাস্তবিক অনাসক্ত যোগীর ন্যায় নিষ্কামভাবে বিষয় ভোগ করিতেন। কে না জানে আশুতোষের বিলাস-বিহীনতা —কে না জানে আশুতোষের আড়ম্বর-হীনতা?

এতো বড় হইয়া—গুণে মানে এতো বড় হইয়া—অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়া, আশুতোষ কেমন আড়ম্বরহীন নিরীহ জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহা একমাত্র আশুতোষের ন্যায় মহাজনেরই যোগ্য। আশুতোষ জীবনে কর্ম্মে—সংসারে চরিত্রে যথার্থই এক মহা আদর্শ-দণ্ড স্বরূপ। আশুতোষের অর্থ তুচ্ছ ভোগের জন্য অর্জ্জিত হয় নাই। জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য —জ্ঞান প্রচারের জন্যই প্রধানত আশুতোষের অর্থের সদ্ব্যবহার ঘটিয়াছে। আশুতোষ কেবল কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মযোগী ছিলেন না। বিদ্যাপীঠের মহাজ্ঞানযোগী ছিলেন—আশুতোষ।

আশুতোষ যে কেমন উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন—

কেমন পরম জ্ঞানযোগী ছিলেন, তাহার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার স্বগৃহের বিশাল গ্রন্থাগার। এই পবিত্র বিদ্যামন্দিরে বসিয়া, আশুতোষ যথার্থই সদাশিবের ন্যায়, জ্ঞান-যোগের গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন—সত্যই যেন যোগেশ্বর সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের কথা—আশুতোষের এই জ্ঞান সমাধি অবস্থার ফটো সাধারণে দেখিতে পায় নাই। তাহা হইলে জন সাধারণ বুঝিত—আশুতোষ কেমন জ্ঞান-ধ্যানে তন্ময় বিভোর হইয়া রহিতেন। না জানি সে কি অপূর্ব্ব চিত্র—অমানুষিক দৃশ্য !

আশুতোষ বাল্যকাল হইতেই বিদ্যায় বিভোর। যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়িতেন, তখন তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা—বিদ্যানুরাগ এতই প্রবল হইল যে স্বগৃহে নিজের আয়ত্তাধীনে পুস্তকাগার স্থাপন না করিয়া আর নিশ্চিন্ত রহিতে পারিলেন না। যে লাইব্রেরী পরিণামে জগতের অমূল্য অতুল্য গ্রন্থরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া এক মহাবিদ্যাপীঠ-রূপে পরিণত হইয়াছে, আশুতোষের ছাত্র অবস্থায় এইরূপে তাহার মৌলিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমে প্রায় বিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আশুতোষ এই নিজস্ব পুস্তকাগার স্থাপন করেন। তখন আশুতোষের ছাত্র-জীবন। তখন আশুতোষ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই—কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেও পারেন নাই। সুতরাং ইহা অতি সহজেই অনুমেয় যে পিতৃদত্ত অর্থেই আশুতোষ নিজগৃহে নিজ পুস্তকাগার স্থাপন করেন। পিতা

ডাক্তারকুলের শিরোভূষণ, গঙ্গাপ্রসাদ নিজেও যে কিরূপ বিদ্যানুরাগী ছিলেন, আর সেই মহাপ্রাণ মহাত্মা পুত্রগত-প্রাণ পুত্রের সৎ ও উচ্চ শিক্ষার জন্য কতদূর যত্নবান ও আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাহা এই একমাত্র নিদর্শনেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এদেশের কোন পিতা পুত্রের শিক্ষাকল্পে এমন অকাতরে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন? এই মহৎ দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ধনী পিতার পক্ষেই অনুসরণীয় নয় কি? যিনি সন্তানকে শিখাইবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছুক ও উৎসুক, তাঁহার পক্ষেই গঙ্গাপ্রসাদের এই মহৎ পন্থা ধারণ করিয়া চলা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কেবল জন্মদান করিয়া, অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিপালন করিলেই, সন্তানের প্রতি পিতার প্রকৃত মহৎ কর্ত্তব্য সাধন করা হয় না। পুত্রকে যেমন জীবিত রাখিতে হয়, তাহার সুখস্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতার সহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়, তেমনি তাহার মানসিক উন্নতি অভিব্যক্তির প্রতি সযত্নে সতর্কে পর্য্যবেক্ষণ তত্ত্বাবধান রাখাও জন্মদাতা জনকের অতি প্রধান পরম পবিত্র কর্ত্তব্য। যে পিতা এই মহৎ কার্য্য সাধনে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হন, তাঁহার বিবেক-বুদ্ধির কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নিশ্চয়ই বিশেষ অপচয় অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে। পুত্রের শিক্ষার জন্য এমন অনুরাগ আগ্রহ এক অতি উজ্জ্বল শুভ দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত অন্ধ মূঢ় মৃতকল্প সমাজের পক্ষে স্বর্গ সুধার ন্যায় নিশ্চয়ই কল্যাণকর।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আশুতোষ বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। অতঃপর এম-এ পড়িবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। আশুতোষ কোন বিষয়ে এম-এ দিবেন, তাহা বিবেচনার কথা হইল। আশুতোষ যে সর্ব্ব বিষয়ে সুনিপুণ সুদক্ষ ছিলেন। তিনি যে বিষয় ধরিতেন, তাহাতেই সিদ্ধি সাফল্য লাভ যেন তাঁহার পক্ষে অতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-প্রভা সর্ব্ব দিকে সর্ব্ব বিভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিশাল বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

আশুতোষ কিসে এম-এ দিবেন? কিসেই বা না দিতে পারেন? তিনি সত্যই বিদ্যারণ্যের সিংহ ছিলেন। সিংহের শিকার লইয়া খেলার মত, তিনি শিক্ষার বিষয় লইয়া আনন্দ ক্রীড়ায় রত হইতেন।

বি-এ অধ্যয়নের সময় আশুতোষ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা (ষ্টুডেণ্টশিপ) দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই পরীক্ষাও দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। দুই বিভাগই আশুতোষের করায়ত্তের মধ্যস্থিত। দুইএর মধ্যে যে কোনটিতে পরীক্ষা দিয়া তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। বাস্তবিক আমরা যতদূর জানি তাহাতে আশুতোষ কি যে জানিতেন আর কি যে না জানিতেন তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

যে ছাত্র বি-এ পড়িবার সময় ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষার জ্ঞাতব্য

পাঠ্য পুস্তক আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার পক্ষে এম এর পাঠ্য কোন ক্রমেই কঠিন বলিয়া গণ্য বা বিবেচিত হইতে পারে না।

আশুতোষ কোন বিষয় ধরিয়া এম এর জন্য প্রস্তত হইবেন তাহা এক সমস্যার কথা হইলেও আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নয়। যে ছেলে একপক্ষে গণিত-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, পক্ষান্তরে সাহিত্য দর্শনে পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে, তাহার পক্ষে যে কোন বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব বা কঠিন ব্যাপার নহে।

আশুতোষ পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষা দিবেন বলিয়া প্রস্তত হইয়াছিলেন। গণিতের ন্যায় সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ও ব্যুৎপত্তি ছিল।

তখনই ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, তাহার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। সেই কথা ধরিয়া তখন এমন কি এখনও পর্য্যন্ত অনেকে আশুতোষের একটু নিন্দা করিয়া থাকেন।

সেই সময় কলিকাতার মধ্যে দেশীয়গণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত দুটি কলেজ বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান, অপরটি আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতাগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত সিটি

কলেজ। এই সিটি কলেজে হাইকোর্টের তাৎকালিক প্রধান বিচারপতি স্যর রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে বাঙ্গালীর কৃতীত্ব কথা উল্লেখ করিয়া জাতীয় প্রসংশায় সভাস্থল আন্দোলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বিশেষ কথা ছিল—বাঙ্গালী যথেষ্ট ক্ষমবান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালী যেরূপ বড় বড় কলেজ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে উচ্চ শিক্ষার ভার আর গভর্ণমেণ্টকে বহিবার বড় দরকার হইবে না। সক্ষম বাঙ্গালী এখন সে ভার নিজের ঘাড়ে লইয়া বেশ ভালরূপেই বহিতে পারিবে। স্যর রমেশ চন্দ্রের এই কথা বহু সংবাদপত্রে আলোচিত হইতে লাগিল।

কথাটা লইয়া বাঙ্গালী মহলে ও ইংরাজ মহলে বেশ একটু আন্দোলন উঠিল। বাঙ্গালী খুব উৎসাহিত উৎফুল্ল হইয়া স্ফীত হইল। বহু বাঙ্গালী বাবু আকাশে অট্টালিকা তুলিয়া ভাবিতে লাগিলেন—আমরা এতদিনে নিশ্চয়ই মানুষ হইয়াছি।

আশুতোষ চিরদিনই মিছা আত্ম গর্ব্বের 'হাম বড়াই' এর বিরোধী। তিনি কি ব্যক্তিগত ভাবে কি জাতিগত ভাবে—কোন ভাবেই মিছা আত্মস্পর্দ্ধা আপনার বড়াই করিতে ভালবাসিতেন না; প্রকৃত কর্ম্মবীরের ন্যায় তিনি জীবনের কোন কালেই ফাঁকা মুখের ফাঁকা কথায়, অসার ক্লাক ফেরুপাল দলের মত, বৃথা চীৎকারে আকাশ ফাটাইতে পারিতেন না—অপরে সে দৃষ্টান্ত দেখাইলেও তাহা আন্তরিক ভালবাসিতেন না।

সার রমেশচন্দ্র অবশ্য জাতীয় উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্যই ঐরূপ কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। সেই কথা লইয়া বিশেষ হৈ চৈ এর উত্তরোল নীরব কর্ম্মী আশুতোষের আদৌ ভাল লাগিল না। তিনি ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য মনস্থ করিলেন।

তখন 'ষ্টেটসম্যান সংবাদ পত্রের বিশেষ প্রসার প্রতিপত্তি। সুবিখ্যাত লেখক নাইট সাহেব তখন এই পত্রের সম্পাদক। নাইট সাহেবের কথা এখনও অনেকেরই স্মৃতিপটে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি অনেক বিষয়েই ভারতের হিতকর কার্য্যের পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছিলেন। তাহার নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনায় কর্ত্তৃপক্ষও বিচলিত ব্যতিবস্ত হইতেন। বর্দ্ধমান মকর্দ্দমায় তাঁহার সমালোচনা-কথা আজিও অনেকের মনে বিশেষরূপ জাগ্রত রহিয়াছে।

নির্ভীক আশুতোষ নাইটের নিকট সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। নাইট নিজ সংবাদপত্র 'ষ্টেটসম্যানে' আশুতোষের প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সাগ্রহে তাহাঁকে আশ্বাস দান করিলেন। আশুতোষ প্রতিবাদ করিলেন—শিক্ষা-ব্যাপারে আমাদের আজিও এমন কোন কৃতীত্ব ঘটে নাই, যাহাতে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের সক্ষম-হস্ত হইতে অনায়াসে উচ্চ শিক্ষার দুর্ব্বহ ভার কাড়িয়া লইতে পারি।'

এ, এম সাক্ষরে আশুতোষের প্রতিবাদ প্রবন্ধ ষ্টেটসম্যানে বাহির হইল। সুপ্ত সংঘে বিদীর্ণ বোমার ন্যায় আশুতোষের প্রবন্ধ ফুটিয়া পড়িল। এমন কথা কে লিখিল? দেশ মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলন তরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠিল। অনেকের সন্দেহের দৃষ্টি—অনেক বড় বড় লেখকের উপর নিপতিত হইল। আশুতোষ তখন কলেজের সাধারণ ছাত্র। এমন যুক্তি জ্ঞানপূর্ণ, গবেষণাময় প্রবন্ধ কোন চিন্তাশীল সুলেখকের হস্ত হইতে বাহির হইল? কথাটা লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা অনেক বড় বড় মহলে চলিতে লাগিল। কেহ কিছুই সহজে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। এমন লেখা যে ছাত্র আশুতোষ লিখিবেন একথা অনেকের মনেই স্থান পাইল না। আশুতোষের অধ্যাপক সূক্ষ্মদর্শী রো সাহেব কেবল তাহা ধরিয়া ফেলিলেন।

আশুতোষের প্রতিবাদ এমনই গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল যে তনকার বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ ইংরাজী লেখক ব্যারিষ্টার অধ্যাপক স্বর্গীয় এন ঘোষ (নগেন্দ্রনাথ ঘোষ) ইহার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইলেন। ঘোষ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'নেশন' নামক পত্র তখন দেশ মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার লেখার ন্যায়পরতা সত্যানুসন্ধিৎসা, যুক্তি বিচারে গভীরতা, তদুপরি লেখার সৌন্দর্য্যে অনেকেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি ছোটলাট পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া, নিজ সভাক্ষেত্রে তাহার গুণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এন ঘোষের মত ইংরাজী

ভাষায় সুলেখক বঙ্গে তখন বড় কেহ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেভরেণ্ড লালবিহারী দে'র পরে এমন সুন্দর ইংরাজী অতি অল্প বাঙ্গালীর হাত হইতে বাহির হইয়াছে। ঘোষ মহাশয় বিলাতের বিখ্যাত দার্শনিক মার্টিনোর ছাত্র ছিলেন। ইংরাজী লেখা দেখিয়া অনেকে বাঙ্গালীর মার্টিনো বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছিল।

এহেন বিখ্যাত লেখক অধ্যাপক সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ছাত্র আশুতোষের প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বীয় বিখ্যাত পত্র 'নেশনে' তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছাত্র আশুতোষ ও প্রবীণ সুদক্ষ লেখক নগেন্দ্রনাথের মধ্যে বাদ প্রতিবাদের তরঙ্গ-তুফান উচ্ছসিত হইয়া, তৎকালের সংবাদপত্রের ক্ষেত্র কিছুকাল আলোড়িত করিয়াছিল। তখন অনেকে মনে করিয়াছিল সর্ব্বদিকে সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রিয় কোন খয়ের খাঁ 'ষ্টেটসম্যানে' প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আশুতোষ যে উচ্চশিক্ষার হিত কামনায় ঐ সকল প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা তখন অনেকেই বুঝিতে পারে নাই—ধরিতেও পারে নাই।

আশুতোষ ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সির ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন রো সাহেব।

আশুতোষ, নিজ বিদ্যাবুদ্ধির বলে চিরদিনই সকল শিক্ষকের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যখন নিম্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখনও তথাকার শিক্ষকগণ তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। তাঁহাকে ছাত্ররূপে পাইয়া সেই সকল শিক্ষক মহা গৌরব অনুভব করিতেন। আবার তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখনও বড় বড় বিলাতী অধ্যাপক তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারাও আশুতোষকে ছাত্ররূপে পাইয়া আপনাদিগকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেন। অধ্যাপক রো ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া আশুতোষের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন——নিশ্চয়রূপেই জানিয়াছিলেন——আশুতোষ ইংরাজী সাহিত্যেও বিএ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম হইবেন। একই সময়ে এক সঙ্গে দুই প্রধান পরীক্ষা দিতে অধ্যাপক রো বারবার নিষেধ করিতে লাগিলেন—তাহা হইলে আশুতোষ প্রথম হইতে পারিবেন না। অগত্যা সেবারে আর আশুতোষের ইংরাজী সাহিত্যে এমএ পরীক্ষা দেওয়া হইল না। পরবৎসর তিনি অগত্যা গনিত শাস্ত্রে এমএ পরীক্ষা দিলেন—অনায়াসে শ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণও হইলেন। সেবারে এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় পুরস্কারস্বরূপ সুবর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন।

এই সুবর্ণপদক লাভ করিয়া বহু ছাত্র স্ফীতহৃদয়ে কতই গর্ব্ব করিয়া থাকে। কোন কোন ছাত্র এমন পুরস্কার পাইলে

সময়ে অসময়ে ব্যবহার করিয়া আপনাদের পৌরুষগর্ব্ব প্রচার করিয়া বেড়ায়, এমন দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে।

আশুতোষকে কেহ কখন এমনভাব কোথাও প্রচার করিতে দেখে নাই! একবার উপহাস ছলে এই পুরস্কার পদকের প্রসঙ্গ উত্থাপনে আশুতোষ নাকি বলিয়াছিলেন যে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া শিশুকালে পদক ঝুলাইব। আশুতোষ সে সকল পুরস্কারের দ্রব্য কোন সাধারণ স্থলে ব্যবহার করিতেন না। 'মাএর দেওয়া মোটা কাপড় মোটা চাদরে' তিনি লাট-দরবার রাজা উজিরের মজলিশ জয় করিয়া আসিতেন। তিনি যেন নিতান্ত নাচারে পড়িয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে জজের পোষাক আর কনভোকেসনে ভাইস চানসলারের সম্মানারের পোষাক পরিধান করিতেন। তাহাও যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে করিতেন।

কে না জানে বাঙ্গলার সে কথা? বুদ্ধ দেবের দেহাবশিষ্ট লইবার জন্য বঙ্গের লাটসাহেব বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে পরম সমাদরে আহ্বান করেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রসেসনে বিশেষ জাঁক জমকের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া লাট ভবন হইতে সেই পরম পবিত্র ভাগ আনয়ন করেন। সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী আশুতোষ বৌদ্ধ সঙ্ঘের সর্ব্বাগ্রনী হইয়া লাট-দত্ত সেই মহৎ উপহার গ্রহণ করেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে সঙ্ঘনেতা রূপে আসিয়াছিলেন। তৎকালে আশুতোষ প্রকৃত আর্য্য সন্তানের ন্যায় বিশুদ্ধ চেল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। অন্য লোক হইলে হয় তো উজ্জল রাজকীয়

পরিচ্ছদে মহাড়ম্বরে সজ্জীভূত হইয়া, এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। আড়ম্বরহীন আশুতোষ—যথার্থ ঘটনা উপযোগী পরিচ্ছদই ব্যবহার করিয়াছিলেন। একথা অনেকেই জানেন।

এমন আড়ম্বরহীন ভাব আশুতোষের সর্ব্বস্থলে পরিদৃষ্ট হইত। আশুতোষ বহু পরীক্ষায় বহু স্থবর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন, যাহা এপর্য্যন্ত এদেশের কোন ছাত্রই লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু তজ্জন্য কেহ কখন আশুতোষের গর্ব্বস্ফীতির পরিচয় পাইয়াছে কি?

আশুতোষ অতি জটিল আইন পরীক্ষায়ও উপর্য্যুপরি তিনবার স্থবর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুআইন, মুসলমানআইন অতি কঠিন আইন। বিশেষতঃ হিন্দু ছাত্রের পক্ষে মুসলমান শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, মুসলমানআইন নিশ্চয়ই অতি কঠিন ব্যাপার। আশুতোষ নিজের অসাধারণ প্রতিভা বলে তেমন বিরুদ্ধ ব্যাপার মুসলমান-আইনের পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

হিন্দুআইন, মুসলমানআইন ছাড়া বিষয়-সম্বন্ধীয় আইন বিশেষ জটিল—অতীব কঠিন নিশ্চয়ই। বিষয় হস্তান্তর বিধান (Transfer of property act) নিশ্চয়ই অতীব দুরূহ। আশুতোষ যখন আইন অধ্যয়ন করেন, ব্যারিষ্টার কে এম চট্টোপাধ্যায় উক্ত আইন অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই জটিল আইনে আশুতোষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও

অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার অধ্যাপক বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আশুতোষ এই ত্রিবিধ কঠিন আইনের তিন পরীক্ষাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি উপর্য্যুপরি তিন বারই স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইলেন। এদেশের কোন ছাত্র এমনভাবে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—কোন ছেলেই বা এতো স্বর্ণ পদক পুরস্কার পাইয়াছে?

আশুতোষের এ সকল অদ্ভূত অপূর্ব্ব কৃতীত্বের কথা কে কখন আশুতোষের কথায় বা কার্য্যে জানিতে পারিয়াছে? এস, পি সিংহ, মণ্ট্রিও, আমীর আলি, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কে এম চাটার্জ্জি প্রভৃতি অসাধারণ কৃতবিদ্য অধ্যাপকগণ যাহার অদ্ভুত অধ্যয়নে অপূর্ব্ব শিক্ষায় বিমোহিত হইয়াছেন, সে ছেলের তুলনা কেবল কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন, জগতের বোধ হয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই পরিদৃষ্ট হয় না। আশুতোষ যথার্থ ই শিক্ষা পরীক্ষা লইয়া যেন বালকের খেলা খেলিতেন। সকল পরীক্ষাই, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই যেন আশুতোষের অসাধারণ বুদ্ধি প্রতিভার পক্ষে সামান্য ছেলেখেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় কে দেখিয়াছে?

আশুতোষের বুদ্ধির এতই তীক্ষ্ণতা, এমনই গভীরতা ছিল যে তিনি এক সঙ্গে দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা দিয়াছিলেন—এক সঙ্গে দুই সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ ষ্টুডেণ্টসিপ ও ইংরাজী সাহিত্যে এমএ পরীক্ষার

জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে এমএ আর বিজ্ঞান-বিভাগে ষ্টুডেণ্টসিপ গ্রহণ করিয়া একাদিক্রমে একপক্ষ কাল ধরিয়া পরীক্ষা দিলেন। উভয় পরীক্ষাতেই অদ্ভুত কৃতকার্য্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

আশুতোষ যথাসময়ে দিবা ৯টার সময়, আহার করিয়া পরীক্ষা দিবার জন্য গমন করিতেন। পরীক্ষার অতি জটিল অতি কঠিন প্রশ্ন সমূহের উত্তর লিখিয়া গৃহে ফিরিতেন। যেমন পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় তেমনি পরীক্ষা হইতে ফিরিবার সময় আশুতোষের একই ভাব—সমান প্রশান্ত ভাব।

আশুতোষের বদন সদাই প্রসন্ন সদাই প্রফুল্ল। সদাই প্রশান্ত অদ্ভুতবীর্য্য তেজস্বিতার আধার স্বরূপ, তৎসহ অপূর্ব্ব প্রতিভাপূর্ণ চক্ষুদ্বয় সদাই আশুতোষকে মানবকুলে এক অসাধারণ আদর্শ দৃষ্টান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আশুতোষের ম্লানমুখ—কাম ক্রোধাদি ঋপুকুল কর্ত্তৃক উত্তেজিত বদন মণ্ডল—বোধ হয় তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় অন্তরঙ্গগণও কখন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। আশুতোষের বদনের গাম্ভীর্য্য প্রশান্ত ভাব দেখিয়া তাঁহার মানস ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির তরঙ্গ উচ্ছাস কেহ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিত না। দৈহিক লক্ষণতত্ত্ব (phreno logy) ও মনতত্ত্বর (Psychology) সিদ্ধান্ত সকল আশুতোষের প্রশান্ত প্রতিমূর্ত্তির নিকট পরাভূত হইয়া পড়িত।

সকল মহাপুরুষের ন্যায় আশুতোষের মূর্ত্তি সদাই একভাবাপন্ন রহিত। 'ক্ষণং রুষ্টং ক্ষণং তুষ্টং' ভাব আশুতোষের জীবনে

কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। আশুতোষ সত্যই বিগতভী—স্থিতিধী—দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু মহাপুরুষ ছিলেন।

এমন দুই উৎকট সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা একসঙ্গে দিয়া একাদিক্রমে পঞ্চদশ দিবস ব্যাপিয়া পরীক্ষা-সংগ্রামে যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী বীর বিজয়-মাল্য ধারণ করিলেন। আশুতোষ শুধু নরব্যাঘ্র ছিলেন না—আশুতোষ লৌহ-মানব (ironman) ছিলেন। অবসাদ কাহাকে বলে আশুতোষের দৃঢ় হৃদয় কখনই তাহা জানিত না। এত বড় দুইটী পরীক্ষা দিয়া আশুতোষ অবসন্ন হইলেন না। কি অদ্ভূত—কি অপূর্ব্ব—আশুতোষের মস্তিষ্কের প্রভা—কেমন অসাধারণ অমানুষিক তাঁহার হৃদয়ের বীর্য্য-প্রতিভা!

আশুতোষ বিজ্ঞান বিভাগে অনায়াসে ষ্টুডেণ্টসিপের পরীক্ষা পারাবার পার হইলেন। তৎপরে আবার সহিত্য ও কলা বিভাগে ষ্টুডেণ্টসিপের পরীক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। আত্ম শক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী আশুতোষ জানিতেন বিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তির নিকট অতি তুচ্ছ।

আশুতোষ সাহিত্য বিভাগে ষ্টুডেণ্টসিপ দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যথাকালে আবেদন করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ, আশুতোষের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন, তাঁহাকে পুনরায় সাহিত্য-বিভাগে ষ্টুডেণ্টসিপ দিতে আর অনুমতি প্রদান করিলেন না। এই কথা লইয়া তৎকালে একটু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় কোন কোন দেশীয়

সংবাদপত্র কর্ত্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে একটা বিকট অবিচার বলিয়া প্রতিকুল সমালোচনা করিয়াছিল। বাস্তবিকই অনেকের চক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের, অসাধারণ ছাত্র আশুতোষের প্রতি এ বিচার অন্যায় অবিচার বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছিল।

আশুতোষ দ্বিতীয়বার নূতন বিষয় লইয়া আর ষ্টুডেন্টসিপ পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। তাহাতে আশুতোষ নিজে হউন বা নাই হউন, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ যথার্থই মর্ম্মাহত হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষ এ কার্য্য করিয়া ভাল করেন নাই, অনেকে মনেও করিতে লাগিলেন—কেহ কেহ প্রকাশ্যে আন্দোলন আলোচনাও করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

আশুতোষকে সেবারে আবার ষ্টুডেন্টসিপ দিতে অনুমতি দিলে, শিক্ষা-জগৎ সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিত। আশুতোষ শিক্ষা জগতের এক অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তিনি যখন যে ক্ষেত্রেই উদিত হইতেন, সেই প্রদেশই উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিতেন।

আশুতোষ যে দ্বিতীয় বারেও ষ্টুডেন্টসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পুরস্কার লাভ করিতেন, তাহাতে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিলেন একই ছাত্র বারবার পুরস্কার লইবে, অন্য ছাত্র বঞ্চিত রহিবে ইহা ঠিক ন্যায় সঙ্গত নহে। অন্য ছাত্রের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত না হইলেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ বিচার আশুতোষের মত অসাধারণ ছাত্রের পক্ষে ন্যায় যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। আশুতোষকে দ্বিতীয় বার

ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করিলে, নিশ্চয়ই শিক্ষাক্ষেত্রে এক অতি অদ্ভুত অত্যুজ্জ্বল আদর্শ দৃষ্টান্ত শিক্ষিত সমুন্নত জগতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এই একই মাত্র কারণ যুক্তি ধরিয়া, অন্য সর্ব্বপ্রকার বিবেক বিবেচনার যুক্তি ছাড়িয়া, আশুতোষকে পুনরায় পরীক্ষার অনুমতি প্রদান করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য ছিল। এ কথা অনেকেই তখনও বলিয়াছেন—এখনও পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন।

আশুতোষ বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য যেমন স্বভাবত অনুরক্ত ছিলেন, তেমনি সেই সাধনার জন্য বিশেষ ভাবে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় লেবরিটারিতে রহিয়া, বিজ্ঞানের জটিলতত্ত্ব, সূক্ষ্মরহস্য বুঝিয়া লইয়া পূর্ণাঙ্গে অধিগত করিয়া লইতেন। বিদ্যায় বিশেষরূপে অধিকার লাভ করিতে আশুতোষের যেমন কোন বেগ বা কষ্ট পাইতে হইত না, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেও তাঁহার যেন কোনরূপ কৃচ্ছ্র কাঠিন্য উপলব্ধি করিতে হইত না। তৎকালের বহু শ্রেষ্ঠ মনস্বী ব্যক্তিও আশুতোষের এই পরীক্ষা-ব্যাপারকে যথার্থই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা বলিয়াই আশঙ্কা করিতেন। তাঁহারা অনেকেই জানিতেন না—বুঝিতেনও না যে আশুতোষের ন্যায় অদ্ভুত কর্ম্মা ছাত্রের পক্ষে এরূপ পরীক্ষা-ব্যাপার একটা আনন্দের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আশুতোষের এই অদ্ভুত পরীক্ষা প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া মনস্বী ডাক্তার মহেন্দ্র লাল

সরকারও নাকি বলিয়াছিলেন—'ছেলেটা পরীক্ষা দিতে দিতে মারা পড়বে দেখছি।'

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল, বাঙ্গালী জাতির এক মহৎ গৌরব নিশান। তখন বাঙ্গালী ডাক্তার কুলে তিনি এবং জগবন্ধু বসু দুই সর্ব্ব প্রথম এম, ডি, হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিয়া—এলোপাথিক চিকিৎসা পরিত্যাগ করেন ও তৎপরিবর্ত্তে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার বিহারী লাল ভাদুড়ী ও ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রতিভা-শালী চিকিৎসকগণ একযোগে এদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করিয়া, ডাক্তার হানিমানের অপূর্ব্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞান লইয়া এদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলালের 'হোমিওপ্যাথি' সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, গবেষণা প্রতীচ্য বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি গ্রন্থে 'ডাক্তার সরকারের সিদ্ধান্ত ও অভিমত' বলিয়া সমাদরে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ও কৃতী ছিলেন, তেমনি সাধারণ বিদ্যা জ্ঞান সম্বন্ধে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশেষত জড়-বিজ্ঞানে তাঁহার প্রভূত অনুরাগ ছিল।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল তখন বাঙ্গালী-সমাজের একজন অত্যুজ্জল রত্ন বিশেষ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তিনি যেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন, তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য রামকৃষ্ণ দেবের অনুরাগের পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি এদেশে বহু শুভকার্য্য অনুষ্ঠানের অন্যতম অগ্রণী নেতা ছিলেন। ভক্তচূড়ামণি মনস্বী প্রবর শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় যখন নব্য বঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করেন, তখন তদীয় সভা সমিতি আদি বহু অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষণ ডাক্তার সরকারও করিয়াছিলেন। ফলতঃ যেমন জড়-বিজ্ঞানে তেমনি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে—উভয় বিষয়েই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিশেষ অনুরাগ আসক্তি ছিল।

জড় বিজ্ঞানে ডাক্তার সরকারের যেমন অনুরাগ ব্যুৎপত্তি ছিল, তেমনি স্বদেশের লোক যাহাতে সে বিষয়ে বিশেষ আসক্তি ও উন্নতি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রাণপণে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান প্রচার তাঁহার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ছিল।

সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাক্তার সরকার বহুবাজার ষ্ট্রীটে বিখ্যাত বিজ্ঞানপীঠ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকারের তীক্ষ্ন দৃষ্টি সহজে আশুতোষের অসাধারণ বিজ্ঞান অনুরাগ ও বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তির উপর নিপতিত হইল। তিনি স্বীয় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দিবার জন্য সাদরে আশুতোষকে আহ্বান করিলেন। আশুতোষের বিজ্ঞানভক্ত প্রাণ ইহাই চাহিতেছিল। যাহাতে দেশের মধ্যে বিজ্ঞান বিশেষরূপে প্রচারিত হয়, যাহাতে স্বজাতি বিজ্ঞানের

অনুশীলনে স্বীয় জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার জন্য আশুতোষের জীবনেও প্রবল আকাঙ্খা ছিল। এক্ষণে সেই সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বিজ্ঞান উপাসক আশুতোষের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আশুতোষ একান্ত মনে ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-মন্দিরে যোগদান করিলেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত এই বিখ্যাত বিজ্ঞান-পীঠে আশুতোষ যোগদান করিয়া বহু উন্নতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

আশুতোষ ছাত্র জীবনে বিলাতের বিখ্যাত পত্রে উপর্য্যুপরি গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে তাঁহার সহিত বিলাতের দুই প্রধান অধ্যাপক ও সম্পাদকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহারা ভারতীয়ছাত্র আশুতোষের অদ্ভুত মৌলিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ও প্রভাবে আশুতোষ বিলাতের দুই প্রধান সভার সভ্য হন।

ইহাঁদের মধ্যে একজনের নাম গ্লেসায়ার, আর এক জনের নাম কেলি। গ্লেসায়ার কেম্ব্রিজে বিখ্যাত গণিত সম্বন্ধীয় পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং কেলি কেম্ব্রিজে গণিত শাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। গ্লেসায়ারের প্রভাবে আশুতোষ বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সভার সভ্য হইয়া এফ, আর, এ, এস (F. R. A. S.) আর কেলির প্রভাবে এডিনবরা রয়াল সোসাইটির সভ্য হইয়া এফ,আর, এস, ই, (F. R. S. E.) উপাধি লাভ করেন। অশুতোষের পূর্ব্বে এদেশীয় কোন ছাত্র

এমন শ্রেষ্ঠ প্রতীচ্য উপাধি ভূষণে ভূষিত হইতে পারে নাই। ইহা অবশ্য আশুতোষের বিশেষ কৃতিত্বের কথা বলিতে হইবে। কারণ বহু বিজ্ঞ বৃদ্ধ বহু চেষ্টা করিয়াও, সহজে ঐ দুই পণ্ডিত সমাকুল সভার সভ্য হইতে পারে না। কিন্তু আশুতোষ ছাত্র জীবনে অতি তরুণ বয়সে নিজ অসাধারণ প্রতিভার ফলে সভ্য শিক্ষিত জগতের দুই শ্রেষ্ঠ বিদ্বর্জ্জন সভার সভ্য হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাতে আশুতোষের পক্ষে গণিত সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা আলোচনার যেমন সুবিধা ঘটিয়াছিল, তেমনি শিক্ষিত জগতে তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ সমূহ প্রচারেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

আশুতোষ্ যখন বি এ পড়েন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ পরীক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে আশুতোষ বিশেষ ব্যথিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ বোম্বাই প্রদেশের জনেক বিখ্যাত ধনী বণিক। ইনি যেমন ধনী ও মানী ছিলেন, তেমনি বদান্য-তায় ও দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-ছিলেন। বিশষত বিদ্যায় উৎসাহদান তাঁহার মহৎ জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা যাহাতে উৎসাহ লাভ করিয়া, বিশেষ উন্নত হয়, তজ্জন্য তাঁহার হৃদয়ে একান্ত যত্ন ও আগ্রহ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন

তাঁহার জীবনের প্রধান এক উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নানারূপ চিন্তা ও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অবশেষে কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষরূপ অর্থ সাহায্য করিতে মনস্থ করিলেন। তদর্থে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দুইলক্ষ টাকা প্রদান করিলেন ও যাহাতে উচ্চ শিক্ষাকল্পে—বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণকর উন্নতিসাধক বিশেষ কার্য্যে উক্ত অর্থ ভাণ্ডার হইতে সাহায্য দান ঘটে, এমন বিধান নির্দ্ধারণ করেন। ঐ দুই লক্ষ টাকার বার্ষিক সুদ দশহাজার টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়া এক নূতন পরীক্ষার সৃষ্টি করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এম-এ পরীক্ষারও পরে আরও একটি অতি উচ্চ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন। ঐ পরীক্ষার নাম হইল রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ বৃত্তি বা ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা। যে উৎকৃষ্ট ছাত্র এই সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সেই উক্ত দশহাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ পাইবে। বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ বিধান বিধিবদ্ধ করিলেন।

রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ পরীক্ষা স্থাপন কাল হইতে এই বিধান অনুসারে কার্য্য হইয়া আসিতেছিল। যে ছাত্র ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিত, সেই দশহাজার টাকা পাইত।

আশুতোষ জানিতেন ঐ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-অর্থই তাঁহার করায়ত্ত,

উহা তাঁহারই অধিকারগত। কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিলেন ঐ পরীক্ষা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হউক। পরীক্ষায় যে পুরস্কার বর্ষে বর্ষে দেওয়া হয় তাহাদ্বারা একটি ভাল ছেলে বিলাতে পাঠান হউক। সেখানে যাইয়া, সে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুক। সেই সকল শিক্ষিত বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ দ্বারা দেশের উন্নতি প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

আশুতোষ ইহাতে বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আশুতোষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—ষ্টুডেণ্টসিপ বৃত্তি তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন। পুরস্কারের অর্থের জন্য নিশ্চয়ই আশুতোষের আগ্রহ ছিল না। আশুতোষ চিরদিনই অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন। অর্থে লোভ থাকিলে, উপার্জ্জনের বিশাল পন্থা—অতি প্রশস্ত দ্বার শ্রেষ্ঠ ওকালতির পসার প্রতিপত্তি তিনি অনায়াসে পায়ে ঠেলিতেন না।

অর্থের জন্য নয়, একটা আদর্শ-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা-প্রথা দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবে আশুতোষের বিদ্যানুরাগী প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। আর একটা কথা আশুতোষের মনে জাগিয়া তাঁহার প্রাণকে আঘাত করিল। দেশের লোক যে বিদ্যার সার্থকতা সাধিতে বিদেশে যাইবে—বিলাতে না যাইলে শিক্ষার শেষস্তরে উঠিতে পারিবে না—এ কেমন বিকট ব্যাপার—উৎকট কথা! কথাটা আশুতোষের প্রাণে বড় বাজিল। আশুতোষের বিরাট বিশাল হৃদয়ে কথাটা

একেবারেই সহ্য হইল না। বিদেশে গমন না করিয়া—দেশে বসিয়া যে কোন উচ্চ শিক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের সাধনা হইবে না ইহা বিদ্যায় এক নিষ্ঠ সাধক স্বদেশগত প্রাণ আশুতোষের প্রাণে কিছুতেই সহ্য হইল না। আশুতোষের প্রাণে নিশ্চয়ই প্রাচীন ভারতের সেই শিক্ষা-কাহিনী হৃদয় মথিত করিয়া উদ্ভাসিত হইল। নালান্দার সেই বিশ্ববিদ্যালয়, সেই উপনিষদ যুগের, শঙ্কর যুগের উচ্চ বিদ্যা অনুশীলনের কথা—যখন কত দেশ বিদেশ হইতে কত ছাত্র শিক্ষার শীর্ষদেশ লাভের জন্য এই শিক্ষা কেন্দ্র ভারতে আগমন করিত, সেই করুণ-কাহিনীর ক্রন্দন আশুতোষের প্রাণকে আকুল করিল। এই ভারত হইতে জ্ঞানালোক সংগ্রহ করিয়া, তাহার নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতি সভ্য সমুন্নত জগতে বিকীর্ণ করিতে কত বিদ্যাব্রত সরস্বতীর সেবক ভারতে আসিত! বিদ্যাব্রত, দেশগত আশুতোষের প্রাণ বিগলিত হইল। শ্রেষ্ঠ বিদ্যার কেন্দ্রস্থান ভারত উচ্চ বিদ্যালাভের জন্য পরের দুয়ারে ভিখারী হইবে? যে প্রতীচ্য বিদ্যার জন্য ভারতের নিকট মহাঋণে আবদ্ধ, সেই ভারত ভিক্ষাভাণ্ড ধারণ করিয়া বিদেশে ছুটিবে? দেশ হইতে তবে কি উচ্চ শিক্ষার উপায়—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-অনুশীলনের পন্থা উচ্ছিন্ন হইবে!

বিদ্যারণ্যের দুর্জ্জয় সিংহের প্রাণ ব্যথিত হইল—হৃদয় আলোড়িত হইল! আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—আশুতোষ। দেশের এ অপমান আর সহিতে পারিলেন না

—আশুতোষ। বিদ্যারণ্যের সিংহ ভীম রবে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। আশুতোষ অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া—বিশ্ববিদ্যালয়ের সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। আশুতোষের সে প্রতিবাদ পুস্তিকা পাঠ করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আসন টলিল—কর্ত্তৃপক্ষের মত পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহারা বুঝিলেন—সত্যই তো ভারত হইতে উচ্চজ্ঞান বিদ্যার অনুশীলন উঠিয়া যাইবে—তাহার দ্বার রুদ্ধ হইবে, ইহা নিতান্তই অসহ্য—যথার্থই অতি বিগর্হিত ব্যাপার। ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষার প্রথা রহিয়া গেল।

কয় বৎসর হইলে এই পরীক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। সেই টাকা হইতে মৌলিকতত্ত্ব গবেষণা আলোচনার জন্য বৃত্তি সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতেও আশুতোষের কৃতীত্ব-কীর্ত্তি কত, তাহা পরে আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যাহাহউক আশুতোষের প্রতিবাদ-পুস্তিকা প্রভূত ফল প্রসব করিল। তাঁহারই অকাট্য যুক্তি ও ওজস্বিতাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে সকলেই বিস্মিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন এমন উৎকৃষ্ট যুক্তিযুক্ত প্রবন্ধ কে প্রকটন করিল?

পুস্তকস্থ প্রবন্ধের নিম্নে কাহারও নাম স্বাক্ষর ছিল না। প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে—একটা কাল্পনিক নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বিবেচনা করিলেন, আশুতোষ তখন অল্পবয়স্ক যুবক ছাত্র বলিয়া নিজের নাম পুস্তকে প্রকাশ করেন

নাই। পাছে ছেলেমানুষের লেখা বলিয়া উপেক্ষিত হয় এইজন্য আশুতোষ নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। ইহা ঠিক নয়—কারণ আশুতোষ বয়সে নবীন হইলেও জ্ঞান বুদ্ধিতে মহা প্রবীণ-পণ্ডিত ছিলেন। একথা আশুতোষ নিজেও বুঝিতেন—অপরেও বেশ বুঝিত। যাহা হউক—নাম থাকুক আর নাই থাকুক—আশুতোষের লেখার ফল ফলিল। ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষার প্রথা বজায় রহিল। তবে ভাবভঙ্গীতে একটু পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের মতি পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশুতোষ পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি উৎসাহভরে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ বৃত্তি পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পরবৎসর এই পরীক্ষায় আশুতোষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি দশ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন। এই টাকায় আশুতোষ বহু উৎকৃষ্ট উপাদেয় পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।—সেই সকল গ্রন্থে নিজ পাঠাগার পরিশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আশুতোষ বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত যান নাই। জ্ঞান বিদ্যার লীলাক্ষেত্র—ভারতীর কাম্য-কানন ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষার্থী শিক্ষাসাধন করিতে বিদেশে যাইবে, ইহা তাঁহার প্রাণে বিষকণ্টক বিদ্ধ করিত। আশুতোষ নিজেও বিদ্যা-তপস্যার অনুষ্ঠানে বৈদেশিক তীর্থে যান নাই, অপরকে যাইতে দিতে

অন্তরে ভালবাসিতেন না। জ্ঞান বিদ্যায় আপনার দেশকে আবার জাগাইবেন—আবার সভ্য-জগতের শীর্ষস্থানীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই ছিল আশুতোষের-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরম উদ্দেশ্য। তিনি নিজ জীবনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তে দেখাইয়াছিলেন, ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলে ভারতের ছাত্র দেশে থাকিয়া—ঘরে সাধনা করিয়া বীণাপাণির কি অসাধ্য-সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। বিদ্যা-সাধনার এই নিগূঢ় তত্ত্ব এই যুগের ভারতবাসীকে নিজ দৃষ্টান্তে দেখাইবার জন্য যেন আশুতোষ এদেশে আসিয়াছিলেন।

ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে শিক্ষার্থী ছাত্রকে বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাবে এই কারণেই আশুতোষ বিশেষ আপত্তি ও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কেবল যে পুরস্কারের দশ হাজার টাকাটা নিজে লাভ করিবেন, সে উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। আশুতোষ স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য কখন কোনরূপ আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই—করিতে ভালও বাসিতেন না।

আশুতোষ এক বৎসরেই সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বিজ্ঞানে ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও পুরস্কার স্বরূপ দশ হাজার টাকা লাভ করিলেন। পুনরায় সাহিত্যাদি বিভাগে ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি

করায় আশুতোষ সে অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইবার অবসর পাইলেন না।

ছাত্রঅবস্থায় আশুতোষ যেমন বিলাতের বিখ্যাত পত্র সমূহে নিজের গভীর গবেষণা পূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ সমূহ প্রেরণ করিয়া অল্প বয়সে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তেমন এদেশে 'এসিয়াসিক সোসাইয়াটির সভ্য হইয়া, এই পণ্ডিত সভার মুখপত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশে উহাকে বিখ্যাত করিয়া তুলিলেন। এদিকে ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-সভার কর্ম্মক্ষেত্রকেও বিশেষ উন্নত ও পুষ্টি সাধিত করিতে লাগিলেন। তরুণবয়সে আশুতোষের এই সকল কৃতীত্ব দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে অনায়াসেই অদ্ভুত-কর্ম্মা বলিয়া অবধারণ করিল।

আশুতোষ ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বি-এল পরীক্ষা দিলেন। তাহাতেও অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইলেন।

বি-এল পরীক্ষার জন্য তিনি কিছুদিন সিটিকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার-প্রবর লর্ড সিংহ উক্ত কলেজের আইনের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আশুতোষের ন্যায় ছাত্র পাইয়া, আইনের গভীর মর্ম্মব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আশুতোষ তাহাঁর অধ্যাপনায় পরম প্রীত হইলেন। আশুতোষ অবশেষে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন 'সিংহ সাহেবের আইন অধ্যাপনার ক্ষমতা অতি অদ্ভুত।'

আশুতোষ বি-এল পাশ করিলেন, যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন পরীক্ষা পাইলেন না বলিয়াই বি-এল পরীক্ষা দিলেন। যেন

আইনের মধ্যে নূতন তত্ত্ব কি আছে—তাহা জানিবার জন্য—তাহাতে জানিবার বুঝিবার যে গূঢ়তত্ত্ব আছে তাহাই জানিয়া বুঝিয়া লইবার জন্যই আশুতোষ বি-এল পড়িলেন—বি-এল পরীক্ষা দিলেন। নতুবা ওকালতি করিবেন বলিয়া—ওকালতি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবেন বলিয়া, তিনি বি-এল পরীক্ষা দেন নাই।

আমরা বার বার বলিয়াছি—এবং তাহাই আমাদের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস—যে জ্ঞান উপার্জ্জন আশুতোষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল—অর্থ উপার্জ্জন নহে। তবে যে আশুতোষ অর্থ উপার্জ্জনে জীবনকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সে কেবল জ্ঞান-অর্জ্জনের উপায় হইবে—সহায়তা করিবে বলিয়া। বিদ্যা অর্জ্জনই ছিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য—চরম উদ্দেশ্য। আর অর্থ উপার্জ্জন ছিল তাহার সাধন হেতু—উপায় মাত্র। যাহাতে নিজের পক্ষে—নিজ জাতির পক্ষে জ্ঞান-মন্দিরের দ্বার সুলভ সুপ্রশস্ত হয়, তাহাই ছিল আশুতোষের জীবনের উদ্দেশ্য—আশুতোষের কর্ম্মের উদ্দেশ্য—আশুতোষের অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য।

প্রধানতঃ ব্যবহার-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য আশুতোষ বি-এল পড়িতেন। ব্যবহার শাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্ম অধিগত করিয়াই তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আইনের সূক্ষ্ম মর্ম্মের মূল ধরিয়াই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে—ওকালতি ও জজীয়তী কার্য্যে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেন। আইনের মধ্যে সমাজ-তত্ত্বের

জটিল ভাব, গুঢ়মর্ম্ম নিহিত আছে—তাহাই তিনি স্বীয় চিন্তা গবেষণা প্রয়োগে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছিলেন—এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সেইরূপেই তাহা ব্যবহার ও প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

আশুতোষ সরস্বতী—সত্যই সরস্বতী ছিলেন। সকল বিদ্যাই আশুতোষের করায়ত্ত হইয়াছিল। তবে গণিতের গভীর গবেষণায় তাঁহার প্রাণের আনন্দ-তরঙ্গ যেন স্বতঃই উচ্ছসিত হইয়া উঠিত।

গণিতে যে তাঁহার অনুরাগ ছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটী প্রসিদ্ধ কথার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। সেই সময়ের ভাইস চান্সেলার সুবিখ্যাত ইলবার্ট সাহেব কনভোকেশন সভায় শতমুখে আশুতোষের সেই কৃতকার্য্যতার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

আশুতোষ জানিয়াছিলেন যে ফরাসি ভাষা শিক্ষা না করিলে উচ্চ গণিত শিক্ষার পক্ষে সুবিধা বা সুযোগ হয় না। সে জন্য তিনি প্রাণপণ যত্নে ফরাসি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে লাপলাসের জটিল গণিতাঙ্ক বুঝিবার পক্ষে তাঁহার বিশেষ সুবিধা ঘটে। তিনি ঐ বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিতের বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠে উৎসুক হইলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে কেম্ব্রিজের গণিত অধ্যাপক কেলি সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। কেলি উত্তরে বলিয়াছিলেন 'উক্তগ্রন্থ অধ্যাপনার লোক কেম্ব্রিজেও অল্প।'

এখানকার গণিত অধ্যাপক বুথও উহা পড়াইতে পারিলেন

না। আশুতোষ নিজেই একান্ত আগ্রহ ও অধ্যবসায়ে অধ্যয়ন করিয়া উহা নিজায়ত্ত করেন।

আশুতোষ, গ্রন্থকীট ছিলেন। যেখানে ভাল ভাল পুস্তক নিলাম হইত, আশুতোষ সেই স্থানেই উপস্থিত হইতেন। একবার নীলামে পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য আশুতোষ গমন করেন। তথায় দুই খানি খুব উচ্চ অঙ্গের গণিত গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ ছিল। আশুতোষ সেই গ্রন্থ দুইখানি ক্রয় করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলেন। তৎকালের হাইকোর্টের জজ ওকেনেলি সাহেবও ঐ পুস্তক দুইখানি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি নিলাম-কারী সাহেবকে বলেন যে যত টাকায় হউক ঐ পুস্তকদুইখানি ডাকিবে, সকলের উপর তাঁহার 'ডাক' রহিল। আশুতোষ একশত, দেড়শত মুদ্রা পর্য্যন্ত পুস্তক দুইখানির জন্য ডাকিয়া-ছিলেন। জষ্টিস ওকেনেলির নীলাম ডাক সিদ্ধ হইল। কিন্তু পরে তিনি বিস্মিত হইলেন, ঐ অত্যুচ্চ গণিত-গ্রন্থ অধ্যয়নের পাঠকই বা এদেশে কে—ক্রেতাই বা কে? জষ্টিস ওকেনলি জানিলেন—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক হাইকোর্টের নবীন উকিল ঐ গ্রন্থ দুইখানির গ্রাহক। ওকেনেলি পরম প্রীত হইলেন। আশুতোষকে স্বগৃহে ডাকাইয়া ওকেনেলি পুস্তক দুইখানি তাঁহাকে উপহার দিলেন।

গণিতে আশুতোষের যেমন অদ্ভুত অনুরাগ ছিল, তাহাতে তিনি তেমনি সুফল সিদ্ধিও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এম-এ পাশ করিয়াই গণিত শাস্ত্রে এম-এর পরীক্ষক পদ পাইয়া-

ছিলেন। যদিও বহু আত্মাভিমানী পাণ্ডিত্যের ধ্বজাধারী এ সম্বন্ধে তাঁহার বিপক্ষতা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদ প্রতিপক্ষতা বিফল হইয়াছিল। অধিক কি—আশুতোষ গণিতে এমনই কৃতীত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত গণিত-প্রবন্ধ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আশুতোষের পক্ষে ইহা বিশেষ কথা না হইলেও এদেশীয় ছাত্রের পক্ষে নিশ্চয়ই বিশেষ গৌরবের কথা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আশুতোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গৌরব-নিশান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাপীঠে আশুতোষের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যাহাঁরা তৎকালের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন, তাহাঁদের মন, আশুতোষের শিক্ষাগুণে স্বতঃই মুগ্ধ হইল। শিক্ষারণ্যে আশুতোষের ন্যায় সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল! বিদ্যা-আকরের এমন অমূল্যরত্ন নিজ ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিতে, শিক্ষানেতাগণের প্রাণে আগ্রহ বাসনা স্বতঃই উথলিয়া উঠিল।

সার আলফ্রেড ক্রফট্ তখন এদেশে শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিচালক ডাইরেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। ক্রফট্ গুণের আদর জানিতেন। আশুতোষের শিক্ষা গুণের পৃষ্ঠ-পোষণ করিতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা স্বতঃই উদ্বোধিত হইল। কি করিয়া তিনি আশুতোষকে—আশুতোষের বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান দক্ষতাকে—নিজক্ষেত্রে নিয়োজিত পরিচালিত করিবেন, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই চিন্তা সার আলফ্রেডের মনে

বিশেষ প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিল। সার আলফে্রডের স্তায় উপযুক্ত শিক্ষা-নেতা শিক্ষাপরিচালকের পক্ষে ইহা অবশ্য বিশেষ সমীচীন কার্য্যই হইয়াছি। বিদ্যা আকবের এমন মুকুট মণি বুঝিয়া পাইয়া যিনি শিক্ষার পরিচালক, তিনি কিরূপে অবহেলে পরিত্যাগ করিবেন? আলফে্রড নিজে পরম বিদ্বান —বিদ্যায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বিদ্যায়র অনুরাগে অনুরক্ত পুরুষের প্রাণ যে কিরূপ তন্ময়—বিদ্যায় কিরূপ বিভোর হয়, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। আলফে্রড বেশ জানিতেন যে বিদ্যমদে যে মত্ত—যে জ্ঞান-পথের পাগল, বিষয় সম্পদ, অর্থ ঐশ্বর্য্য তাহার পক্ষে যে কতটা তুচ্ছ তাহা পণ্ডিত আলফে্রডের মত বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি না বুঝিলে আর বুঝিবে কে? জহুরী যে, কেবল সেই জহর চিনে। ঝুটা সাচ্চায়—প্রভেদ কি —কেবল সেই জহরতওয়ালাই সমজাইতে পারে।

আশুতোষের ন্যায় সাচ্চা জহরত, জহুরী আলফে্রডের চক্ষে সহজেই ধরা পড়িল। আলফে্রড স্থির করিলেন এই অমূল্য পরশমণিতে স্বীয় শিক্ষাক্ষেত্র বিভূষিত করিবেন। আশুতোষকে চিনিয়া বুঝিয়া যদি আলফে্রডের ন্যায় ব্যক্তি না ধরিবেন, তবে আর শিক্ষার সম্মান, বিদ্যার গৌরব কে করিবে? আলফ্রেড, বিদ্যার সম্মান বাড়াইবার জন্য— নিজ শিক্ষাবিভাগ সুন্দররূপে সাজাইবার জন্যই—আশুতোষকে সাদরে আহ্বান করিলেন।

আশুতোষ, জ্ঞান ভাণ্ডারের মহারত্ন। জ্ঞান ক্ষেত্রই তাঁহার

প্রাণের প্রিয়নিকেতন। তাহার বাহিরে অবস্থান করিতে, আশুতোষের জ্ঞান-পীপাসু প্রাণ কখনই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আশুতোষ, উৎফুল্ল প্রাণে সার আলফ্রেডের সাদর আহ্বানে কর্ণপাত করিলেন।

শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানীয় বঙ্গের তাৎকালীক শিক্ষা বিধাতা সার আলফ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুকুট-মণি আশুতোষকে সাদরে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন।

আলফ্রেড, আশুতোষের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। আশুতোষ শিক্ষা বিভাগে উচ্চ কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তবে কয়েকটি সর্ত্ত উপস্থিত করিয়া আশুতোষ কর্ম্মভার লইতে স্বীকার করিলেন।

আশুতোষ কহিলেন—উচ্চ শিক্ষাবিভাগে যেরূপ উচ্চ বেতন-হার নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগে বিলাত প্রত্যাগত উচ্চ কর্ম্মচারীগণ যেরূপ উচ্চ হারে বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহার বেতনও সেইরূপ নিয়মে সেইরূপ হারে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। আর তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজেই রাখিতে হইবে।'

সার আলফ্রেড আশুতোষের কথায় বিস্মিত হইলেন। এমন অল্পবয়স্ক ছাত্র, বাঙ্গলা দেশের সামান্য বাঙ্গালী ছাত্র এতো টাকা মাহিনার আশা পাইয়াও, তাহাতে পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হইল না, ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। সার আলফ্রেড, আশু-

তোষকে প্রথমেই দুই শত পঞ্চাশ টাকা বেতন প্রদান করিতে চাহিলেন। এতো টাকা বেতন একটা সামান্য বাঙ্গালীর পক্ষে —বাঙ্গালী-জীবনের পক্ষে প্রচুর, এমন কি অপরিমিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সার আলফ্রেড বিলাতবাসী সাহেব। তিনি আশুতোষের মাসিক মাহিনা সম্বন্ধে আর অধিক কি ধারণা করিতে পারেন? যাহারা সাধারণতঃ বাঙ্গালী জীবনের দাম অতি সামান্যই মনে করে—বাঙ্গালীর ব্যয় ভূষণাদি অতি অল্প বলিয়াই যাহাদের ধারণা, তাহারা আড়াই শ' টাকা মাস-মাহিনা আশুতোষের পক্ষে যথেষ্টই হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে বৈ কি। তাহারা গোড়া হইতে এদেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া আইসে—ভারতবাসীর আবার শিক্ষা দীক্ষাই কি—তাহাদের জীবনের দামই বা কি—সংসারের খরচই বা কি! একশত টাকাই তাহাদের পক্ষে প্রচুর। তদুপরি দুইশত টাকা ভারতবাসীর পক্ষে সোণায় সোহাগা। এই সোণায় সোহাগা আশুতোষের মত কোহিনুরকে ভুলাইতে পারিল না। আশুতোষ আড়াই শত টাকার চাকুরী গ্রহণ স্বীকার করিলেন না। আলফ্রেড কহিলেন—এই বেতন-ভার ভারত সেক্রেটারির হাতে। এখন এই টাকায় স্বীকার কর। পরে দেখা যাইবে। আর চাকুরী করিতে হইলে যেখানে বলিবে সেইখানে যাইতে হইবে। আমরাও তো যাই।

আশুতোষ, নিজে কখনই অর্থগ্রাহী ছিলেন না। তাহাঁর পক্ষে টাকার দাম বড় বেশী ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি

আশুতোষের নিকট অর্থের যদি কোন মুল্য থাকিত, তবে তাহা সাধারণের পক্ষে যাহা বিপরীত ভাব সেইভাবে—অর্থাৎ 'উপায়, ভাবে, 'উপেয়' ভাবে কখনই নয়। আশুতোষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাকে বড় কাজে লাগাইয়া টাকার সার্থকতা সাধন করিবার জন্য; নতুবা যক্ষের ন্যায় তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য নহে।

আশুতোষ, জাতীয় মর্য্যাদা বেশ জানিতেন। প্রথমাবধি—ছাত্রজীবন হইতেই তিনি বর্ণবিভাগের পার্থক্য—সাদা কালোর প্রভেদ—হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই নীচ ঘৃণিত পার্থক্য ভাব বিদূরিত করিয়া, জাতীয়-সম্মান সংবর্দ্ধিত করা আশুতোষের শ্রেষ্ঠ জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ছিল।

আশুতোষের অপূর্ব্ব তেজস্বিতা—তাঁহার আত্মসম্মানবোধ, জাতীয় সম্মানবোধ একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। আলফ্রেডের প্রস্তাবিত বেতন প্রসঙ্গ আশুতোষের পক্ষে আত্মমর্য্যাদার পরিপন্থী বলিয়া বোধ হইল। তিনি সগর্ব্বে সার আলফ্রেডের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

সার আলফ্রেডের সাহেবীগর্ব্বে দারুণ আঘাত লাগিল। আশুতোষের প্রত্যাখ্যান তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। আলফ্রেড ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—'তবে তুমি কি করিবে? আশু-তোষ কহিলেন 'চাকুরী না হয়, হাইকোর্টে ওকালতি করিব।'

সার আলফ্রেড আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন

—'সেখানে অনেক উকিল আছে। হাইকোর্টে আর উকিলের স্থানও নাই দরকারও হইবে না।'

সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হইলেন। আশুতোষ গর্জ্জিয়া কহিলেন—'আমি চাকুরি করিতে চাই না। অধ্যাপকের কর্ম্মে আমার দরকার নাই।'

আশুতোষ, তেজোগর্ব্ব বাক্যে এই কথাগুলি স্যর আলফ্রেডকে শুনাইয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। সার আলফ্রেড স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বিস্ময় ও ক্রোধ যুগপৎ তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। আলফ্রেড মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তাইতো কালা ভারবাসী—বিশেষত একজন সাধারণ বাঙ্গালী ছাত্র—তাহার পক্ষে এমন নির্ভীক তেজস্বিতা কি বড় সহজ কথা? ইহা নিশ্চয়ই বড় দম্ভের ভাব।

শিক্ষাবিভাগের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা আশুতোষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন—বিরূপ হইয়া রহিলেন। নির্ভীক আশুতোষ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

আশুতোষ সত্যই আত্মতৃপ্ত ছিলেন। তিনি অন্তরে জানিতেন—ভোগের জন্য—টাকার জন্য তিনি জগতে আসেন নাই। তিনি যে জন্য জগতে আসিয়াছেন—যে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য—জ্ঞান প্রচারের জন্য—তিনি জগতে আসিয়াছেন—তাহা যেখানে সেখানে যে সে অবস্থায় তিনি সাধন করিতে পারিবেন। এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাই আশুতোষ সদাই নির্ভীক তেজস্বী জ্ঞানসাধক

জ্ঞানের উপাসক ঋষিকুল-সম্ভূত ব্রাহ্মণের ন্যায় চিরজীবন যথার্থ ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাই তিনি সার আলফ্রেডের ন্যায় শিক্ষা-নেতা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তার কর্ম্ম-প্রদানের ভিক্ষা অনায়াসে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আশুতোষ শিক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে স্বতঃই ইচ্ছুক ছিলেন। কারণ তাহাতে তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য সফল হইত। ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ। আশুতোষ যে বিদ্যাপীঠে আত্মনিয়োগ করিবেন—শিক্ষা সেবায় সকল সাধনা সমর্পণ করিবেন, জীবনের উন্মেষ মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার স্বভাব ধর্ম্ম হইয়াছিল।

আশুতোষ, বহু বিভাগে বহু জাতীয় কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু এক বিদ্যা-বিভাগ ভিন্ন আর সকল বিষয়ই যেন তাঁহার পক্ষে স্বভাববিরূদ্ধ ধর্ম্মবিরূদ্ধ ব্যাপাররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

আশুতোষ হাইকোর্টে কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্ম্মে—লাটসভার কর্ম্মে কিছুকাল আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশুতোষকে যে জানিয়াছে—আশুতোষের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া যে জানিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই সূক্ষ্মদর্শী মানব-তত্ত্ববিৎ হইলে, নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে যে ঐ সকল কার্য্য আশুতোষের পক্ষে যেন স্বভাব ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্টিত বিশাল বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে কার্য্য,

অথবা এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য, আশুতোষের পক্ষে— মিউনিসিপালিটির কার্য্য অথবা লাটসভার কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির কার্য্য বলিয়াই উপলব্ধ হইত। উভয়জাতীয় কার্য্যই কর্ম্মবীর আশুতোষের নিকট পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু প্রথমোক্ত কার্য্য যেন তাঁহার নিজস্ব—নিজ স্বভাবধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম, আর শেষোক্ত কর্ম্ম যেন পরকীয়—পরধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ যাহাতে বিদ্যা-অনুশীলন— জ্ঞান চর্চ্চার অবসর বা সুবিধা ঘটে না, তাহা যেন স্বতঃই আশুতোষের রুচি-বিরুদ্ধ ছিল।

রুচি-বিরুদ্ধ হইলেও, আশুতোষ যে কার্য্যের ভার স্বীয় স্কন্ধে ধারণ বা বহন করিতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃষ্টভাবে সাধন না করিয়া কখনই পরিত্যাগ করিতেন না। কর্ম্মের সমাধান সম্বন্ধে তাঁহার এমনই পবিত্র ভাব—এতই কর্ত্তব্য পরায়ণতা ছিল যে বেশ ভাবিয়া বুঝিয়া তিনি যে কার্য্যের ভার একবার হাতে লইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধন না করিয়া কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেন না। রাজনীতি সম্বন্ধীয় কার্য্য বোধ হয় তাঁহার ঠিক স্বভাবসঙ্গত কর্ম্ম ছিল না। তথাপি তাহার কর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে এমনই একটা অসাধারণ শক্তি ছিল, আর সে সম্বন্ধে জনসাধারণের এমনই একটা বিশ্বাস ছিল যে আশুতোষ কর্ণধার হইলে, এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন এতদিন আরও বহুদূর অগ্রসর হইত এবং উহা অন্তত অন্যরূপ সাফল্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। তাই সূক্ষ্ম সমালোচক, ডিপার

সুবিখ্যাত 'ক্যাপিটাল' পত্রে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আশুতোষের তুলনা করিয়া, আশুতোষেরই কর্ম্মকৃতীত্বের সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন—তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। ডিচার বলিয়াছেন :—"In the practical affairs of life Gandhi was a child compared with the most famous Vicechancellar of the Calcutta University. The guzerattee saint had not the genius for rule, the most eruditious comprising all the humamanities which marked the Bengalee jurrist and educationalist as a man among men." অর্থাৎ জীবনের যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে এই সর্ব্বজনবিদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সালের সহিত তুলনায় গান্ধি শিশু বিশেষ। গুজরাটী সাধুর কার্য্য সাধনক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইয়া ফুটে নাই। কিন্তু অগাধ জ্ঞান বিদ্যা মনুষ্যত্বের সর্ব্বদিককে ধারণ করিয়া, এই ব্যবহারতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বঙ্গবাসীকে মানুষের মধ্যে একজন মানুষের মত-মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। গান্ধীর রাজনৈতিক-চাতুর্য্য স্বভাব-সঙ্গত ছিল না, কিন্তু আশুতোষের পক্ষে উহা পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল।

ভারতের অদ্বিতীয় কৃতী সন্তান মহাত্মা গান্ধীর সহিত তুলনায় যিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভে সমর্থ, তাঁহার তুল্য কর্ম্মবীর কর্ম্মযোগী আর কে হইতে পারে ?

আশুতোষের প্রাণ জ্ঞানগত হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে কঠোর

কর্ম্মবীরের তুল্য ছিল। এইতো মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির এক প্রকৃষ্ট জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই তো অতি মানবের (Superman) এক উজ্জ্বল আদর্শ-উদাহরণ। এমন সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বদিক প্রসারী প্রতিভাশক্তিকে মানবিক কর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ শিখরভূমি ভিন্ন আর কি বলিব?

আশুতোষের কার্য্যের কৃতীত্ব কীর্ত্তি প্রধানতঃ বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশাল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। বিদ্যাপীঠ—শিক্ষাক্ষেত্র অবশ্য তাঁহার প্রাণের সামগ্রী ছিল। সুতরাং তাঁহার কৃতীত্বের কার্য্য কুশলতার অনুসন্ধান করিতে হইলে, সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হয়। জজীয়তী তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হইলেও উহার আহ্বান, বিদ্যাক্ষেত্রের আহ্বান হইতে আশুতোষের পক্ষে যেন স্বতঃই অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

কর্ম্মের দিক দিয়া আশুতোষকে বুঝিতে হইলে, কর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব একটু বুঝিয়া লইতে হয়। আমরা তাই এখানে সেই তত্ত্ব একটু আলোচনা করিব। আশুতোষ একাধারে জ্ঞানযোগী কর্ম্মযোগী—বাঙ্গালী জীবনের আদর্শ পুরুষ। হেন আদর্শ পুরুষের জীবনের সূক্ষ্মমর্ম্ম বাঙ্গালী মাত্রেরই বুঝিয়া লওয়া —সমাজনেতা মাত্রেরই জাতীয়-জীবনকে সেই প্রকৃষ্ট পন্থায় পরিচালনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আশুতোষের ধাতুগত চরিত্র-কথা আমরা পরে বলিব। এখন কেবল তাঁহার জীবনের কর্ম্ম কথা

সেই কর্ম্মের মর্ম্মকথা একটু আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃতি যেন স্বয়ং আশুতোষের দেহ হৃদয় দুইই কঠোর বজ্র আর নবনীতসম সুকোমল কুসুমের সম্মিলনে হাতে গড়াইয়া, তৈয়ারি করিয়াছিলেন। যেন পতিত বাঙ্গালীর উদ্ধার সাধনের জন্যই এমন অপূর্ব্ব কর্ম্মী পুরুষকে, আদর্শ দৃষ্টান্ত রূপে মোহাচ্ছন্ন অন্ধ পঙ্গু সমাজে ভগবান স্বয়ং কৃপা করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আশুতোষ সত্যই অক্লান্ত কর্ম্মা ছিলেন। তিনি যেন জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবসাদ ক্লান্তি কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। অত বড় বিরাট দেহভার লইয়া তিনি কখন ঘামিতে ঘামিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কার্য্য করেন নাই। এক দেখিয়াছি কর্ম্মবীর 'বঙ্গবাসী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগীন্দ্রচন্দ্র বসুকে বিরাট বপু ধরিয়া বিনা অবসাদে অবিরাম কর্ম্মভার ধারণ করিতে, আর দেখিয়াছি বিশাল দেহধারী আশুতোষকে অনায়াসে অম্লানবদনে সতেজ সবল দেহে অতি প্রকাণ্ড অতি মহান কর্ম্মভার বহন করিতে। যে দেহভার লইয়া বাঙ্গালী তাকিয়া ঠেশ দিয়া ভাঙিয়া পড়ে, কোনরকমে টানা পাখার নীচে আলবোলায় অধর লাগাইয়া, অর্দ্ধনিমীলীত নেত্রে স্বর্গের আরাম উপভোগ করিতে করিতে মানবজীবনের সিদ্ধি সাফল্য লাভে কৃতকৃতার্থ হয়, সেই দেহ-ভার বহন করিয়া বিরাট পুরুষ আশুতোষ অবহেলে বাম অঙ্গুলিতে কর্ম্ম-গিরিভার ধারণ করিয়া

ছিলেন। ধন্য আশুতোষের দেহ—ধন্য তাঁহার হৃদয়—ধন্য তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—'Prophetes are not regarded in their own time মহাপুরুষ আপনার যুগে সম্মান পান না।' এ প্রবাদকে আশুতোষ নিজ জীবনের সফল দৃষ্টান্তে ভুলসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আশুতোষের বাহিরের কার্য্যের মধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য, ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার কার্য্য, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কার্য্য, এই কয়টাই সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কার্য্য। এই কয়টাকে বাহিরের কার্য্য এইজন্য বলি যে ঐগুলি তাঁহার বাঁধাবাঁধি কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে যাহাকে আধুনিক ভাষায় 'ডিউটি' (duty) বলে পরিগণিত হয় নাই। নতুবা ইহাতে কোনরূপ আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না বলিয়া যে এগুলাকে বাহিরের কার্য্য বলিতেছি তাহা নহে। আশুতোষ যাহা ধরিতেন—যে কার্য্যের ভার স্কন্ধে ধারণ করিতেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে পরম পবিত্র কর্ত্তব্য (sacred duty) বলিয়া অবধারিত হইত।

কতবারই বলিয়াছি—বারবারই বলিতেছি, আশুতোষ 'টাকার মানুষ' ছিলেন না—টাকার জন্য তিনি জন্মেন নাই—টাকা রোজগারের জন্যও তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে আত্ম-নিয়োগ করেন নাই। বিদ্যার্থী জ্ঞানযোগী আশুতোষ জ্ঞান-লাভের জন্য জ্ঞান প্রচারেয় জন্যই—আপন আদর্শে পতিত মানব সমাজকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবার জন্যই অধোপতিত সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই 'ডুমরাও' মামলা লইয়া বলিয়া-ছিলেন—'এই শেষ আর না।' আশুতোষের এই কথায় বেশ

বুঝা যায়—আর আদালতের কার্য্যে—মামলা মোকর্দ্দমার কার্য্যে আশুতোষ কখনই আত্মনিয়োগ করিবেন না বলিয়াই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

আশুতোষ ভোগের জন্য—বিলাস বৈভব উপভোগের জন্য কখনই অর্থের আকাঙ্খা করেন নাই—কোন লৌকিক বা সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই। কেবল জ্ঞান অর্জ্জনের ও জ্ঞান প্রচারের সুবিধার জন্যই তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। যখন আশুতোষ বুঝিলেন, 'ডুমরাও' মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিয়া, তাঁহার যে অর্থলাভ হইবে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণের চরম উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে, তখন আর সে চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবেন না, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। তাই মুক্ত কণ্ঠে সকলের সমক্ষে বলিয়াছিলেন—'এই শেষ'।

আশুতোষ অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনের শেষভাগে তিনি জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধার জন্যই এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যে, ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার কার্য্যে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

ইংরাজ রাজ ভারতের প্রাচ্য বিদ্যার বিস্তার ও উৎকর্ষণ সম্বন্ধে যত প্রকার আয়তন অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই 'এসিয়াটিক সোসাইটি' এক অতি শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভা সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী

ছিলেন, তৎকালের স্থপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত প্রবর সার উইলিয়ম জোন্স। এই সভা বহুকাল পর্য্যন্ত কেবল বৈদেশিক য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। তৎপরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার উইলসনের প্রস্তাব অনুসারে কতিপয় এদেশীয় পণ্ডিত ঐ সভায় প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়া-ছিলেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে রামকমল সেন মহাশয় বিদ্যা বুদ্ধিতে বঙ্গ-দেশের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৩০ সালে উক্ত সভার প্রকৃতিবিজ্ঞান (Naturl science) বিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত বিভাগের একজন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি পরবর্ত্তী আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত সমিতির সহকারী সভাপতি ভাবে ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদক ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন।

যেমন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আশুতোষের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তেমনি বঙ্গীয় প্রথম ও প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র আশুতোষের অসাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের কৃতীত্বে বিশেষ মোহিত ইয়াছিলেন। তিনি আশুতোষকে নিজের প্রিয়কর্ম্মক্ষেত্রে 'এসিয়াটিক সোসাইটিতে' গ্রহণ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন।

১৮৮৫ সালের ৫ই মে তারিখে উক্ত বিখ্যাত সভায় রাজা

রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় আশুতোষকে সভ্যপদের জন্য প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব পরম সমাদরে ও সসম্মানে গৃহীত হইল। আশুতোষ তদবধি উক্ত বিখ্যাত সমিতির ও তাহার মুখপত্র স্বরূপ পত্রিকার উন্নতি কল্পে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন। আশুতোষের সেই আন্তরিক যত্ন শ্রমের ফল যে কত উচ্চ তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আশুতোষের প্রকটিত উচ্চ গণিত সম্বন্ধীয় মৌলিক প্রবন্ধ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই বিশেষ কৃতীত্বের কথা। আশুতোষ উক্ত সভার প্রেসিডেণ্টও হইয়াছিলেন যাহা অন্য ভারতবাসী আর হয় নাই।

আশুতোষের মূল্যবান জীবন কর্ম্মক্ষেত্রে দুই প্রধান কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল—এক হাইকোর্টে ওকালতি আর জজিয়তী—অপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য। প্রথমোক্ত কার্য্য, তিনি অর্থের জন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আশুতোষ বিবাহিত সংসারী ব্যক্তি। তাঁহার স্ত্রী পুত্র, কন্যা, যামাতা সবই ছিল। গৃহাশ্রমীর যেমন থাকিতে হয় তেমনি অতিথি কুটুম্ব আশ্রিত অভ্যাগত আত্মীয় স্বজনও ছিল। তদুপরি কৃতী হিন্দুর অনুষ্ঠেয় দুর্গোৎসব, পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কলাপ সবই ছিল। আশুতোষের অর্থ চাই বৈ কি। তিনি বিরাগী উদাসীন সন্ন্যাসী নহেন। হিন্দু গৃহীর যাহা পালনীয় কর্ত্তব্য তাহা তিনি পূর্ণভাবে প্রকৃষ্টরূপেই পালন করিতেন। আশুতোষ অর্থ উপার্জ্জন ত্যাগ করিবেন কিরূপে? আশুতোষ

যদি সাহেবীআনা ধরিয়া সাহেবী মেজাজের লোক হইয়া সাহেবী চালে চলিতেন, তবে তিনি যেরূপ বিদ্যাব্রত পুরুষ ছিলেন, তাহাতে বোধ হয় বিবাহ না করিয়া চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করিতেন ও জ্ঞান-সমাধিতে চির জীবন নিমগ্ন রহিতে পারিতেন। আশুতোষ যে মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন। হিন্দুজীবনে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-জীবনে বিবাহ যে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র সংস্কার তাহা তিনি জানিতেন, আরও জানিতেন —ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞানে ভালই বুঝিতেন 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র-পিণ্ডং প্রয়োজনঃ' পুত্রের প্রদত্ত পিণ্ড প্রয়োজন, আর সেই জন্যই বিবাহিত পত্নীর পাণিগ্রহণ প্রয়োজন। নতুবা জ্ঞানযোগী আশুতোষের জগতে এক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। আশুতোষ যথার্থই জানিতেন—

' নহি জ্ঞানেন সদৃশ পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

ব্রাহ্মণ হইয়া—ব্রাহ্মণের জ্ঞানপিপাসু প্রাণ পাইয়া, আশুতোষ অর্থকরী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে কেবল যুগ প্রভাবের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। ঋষি-কুলের যোগ-ভ্রষ্ট আশুতোষ কালোপযোগী জ্ঞান সাধন ও জ্ঞান প্রচারের জন্যই আবার আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন।

উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে আশুতোষের কার্য্য অর্থের জন্যই নির্দ্ধারিত ছিল। সাধারণে মনে করে উহাই আশুতোষের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। এই ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

হাইকোর্টের কার্য্য অধিক সময় সাপেক্ষ, অধিক পরিশ্রম

সাপেক্ষ হইলেও, উহা কখনই আশুতোষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যই ছিল না—জ্ঞানই আশুতোষের জীবনের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। কারণ সেই কার্য্যই ছিল—আশুতোষের প্রাণের পরম প্রিয় কার্য্য—অন্তরাত্মার অন্তস্তলের কার্য্য। যে কার্য্যের জন্য আশুতোষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি তিল তিল করিয়া নিজ মহামূল্যবান দেহ প্রাণ ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যা সাধন—বিদ্যা সমাধান কার্য্যই তাঁহার জীবন-যজ্ঞ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের পরম পবিত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানেই আশুতোষ আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই কার্য্যকে তাঁহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিব না তো আর কোন কার্য্যকে বলিব?

আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সর্ব্ববিষয়িনী বিদ্যা, দেশের বহু কর্ম্মক্ষেত্রে বহুশ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এমন প্রাণের আগ্রহের সহিত, অন্তরাত্মার একান্ত অনুরাগের সহিত নিশ্চয়ই আর কোন কার্য্যই তাঁহা কর্ত্তৃক অবলম্বিত বা সংসাধিত হয় নাই, ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কর্ম্ম জীবন।

যে বৎসর আশুতোষ বি এল পাশ করিলেন, সেই বৎসর তাঁহার জীবনের এক বিশেষ সময়—বাঙ্গালীর পক্ষেও এক বিশেষ কাল বলিতে হইবে। বি এল পাশের ফলই বাঙ্গালী জীবনের পক্ষে ওকালতি। এই ওকালতি ব্যবসায় বাঙ্গালীর পক্ষে এক অপূর্ব্ব জিনিস। এদেশের জন্য প্রতীচ্য প্রতিষ্ঠান হইতে যত সামগ্রী আমদানী হইয়াছে, তন্মধ্যে এই বি এল পাশের ডিপ্লোমা একটা অতি অপূর্ব্ব চিজ—অদ্ভুত মোহ মদিরা মাথা দিল্লিকা লাড্ডু!

এই বি এল পাশের দুয়ার দিয়া ভারতবাসী, গোলকধামের কতই না মধুর দৃশ্য দর্শন করে! বি এল গোলক ধাঁধা পার হইয়া, পাশকারী যে সে স্বয়ং নিমিলীতনেত্রে স্বর্গ হইতে সমাগত পুষ্পক-রথের আশা করে—সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়, তাহার পিতামাতা পুত্রের অনুগামী হইবার জন্য কটিবন্ধন করে—তাহার ভাবী শ্বশুরকুল পর্য্যন্ত চতুর্ভুজ হইয়া আনন্দে বাহু তুলিয়া নাচিতে থাকে। অন্ততঃ আশুতোষের সময় পর্য্যন্তও বি এল পাশের এমনই একটা মোহিনী শক্তি ছিল; আজকাল অবশ্য দেশের হাওয়া বেশ

বদলাইয়াছে। সেই মাথায় সামলা মোটা চেইন ধারী-বি এল বাবুকে আর সহজে জুড়িগাড়ি হাঁকাইয়া আদালতে যাইতে বড় দেখা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে এক বিষাদক্লিষ্ট হতাশ-হৃদয় ভগ্নোদ্যম দৃশ্য দেখিয়া, দর্শকের প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

আশুতোষের সময়ে বি, এল, এর দাম খুব বেশী ছিল। হাইকোর্টের জজীয়তি স্বাতি নক্ষত্রের বারি—কালা আদমীর ভাগ্যে একমাত্র এই বি এল এর সার্টিফিকেটই সংগ্রহ করিতে পারিত। আশুতোষ, প্রফুল্ল প্রাণে বি এল পরীক্ষা দিলেন কিনা —প্রফুল্ল প্রাণে বি এল পাশের ডিপ্লোমা গ্রহণ করিলেন কিনা তাহা ভগবানই জানেন। তবে আমাদের বিশ্বাস – যাহারা আশুতোষকে ভালরূপে জানিত বা চিনিত তাহাদেরও অন্তরের নিশ্চিত ধারণা যে বি, এল এর ডিপ্লোমা তাঁহার প্রাণের পক্ষে কিছুতেই প্রবল পীপাসায় শান্তিবারি হয় নাই। যাহাতে গভীর বিদ্যা অনুশীলনের ক্ষেত্র নাই—যাহাতে সে সুবিধা সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা বিরল—সে ব্যবসা কখনই বিদ্যা-ধ্যান বিদ্যা-জ্ঞান বিদ্যা-ব্রত আশুতোষের প্রাণের সামগ্রী হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রসার প্রতিপত্তি সম্পন্ন ওকালতির বিশাল উন্মুক্ত দুয়ার সম্মুখে দেখিয়া, আশুতোষ সার আলফ্রেডের নিকট যাইতেন না। সার আলফ্রেডের প্রস্তাব অশুতোষের নিকট অপ্রীতিকর হয় নাই—হইতেও পারে না। কারণ—আশুতোষের অন্তরাত্মা যাহা চায়, বিদ্যা অনুশীলন, জ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা সুযোগ প্রদ বিদ্যাপীঠের কার্য্য প্রদানের জন্যই আলফ্রেড আশুতোষের

দিকে বরাভয়প্রদ হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। আলফ্রেড, যাহা কৃষ্ণকায় (Oily and greezy) তেলচক্‌চকে বাঙ্গালী বাবুর পক্ষে পরম অনুগ্রহের দান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, জ্ঞানদৃপ্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ-প্রাণ তাহা অবহেলে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিল। শিক্ষাক্ষেত্রের ভাগ্য বিধাতা আশুতোষের প্রতি বাম হইলেন। সে ভাবটুকু আর আলফ্রেড কখনই ভুলিতে পারেন নাই।

আশুতোষের জ্ঞানদীপাসু প্রাণ ওকালতি ব্যবসা ভাল বাসে নাই—বাসিতে পারে না। কিন্তু একটা বড় প্রলোভন —ব্যবসায়ে স্বাধীনতার প্রলোভন—আশুতোষের স্বাধীনচেতা প্রাণকে সবলে আকর্ষণ করিল।

আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বি-এল পাশ করিয়া আগষ্ট মাসেই ওকালতি আরম্ভ করিলেন। আশুতোষ আইনে—ব্যবহারিক বিধানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাই উপরি উপরি কয়টা আইনের পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া—স্বর্ণ পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাই ওকালতি আরম্ভ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই "ডক্টর অব্‌ ল" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

আইন একটা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে যত বিজ্ঞান আছে তন্মধ্যে ব্যবহার শাস্ত্র—(আইন কানুন) একটা প্রধান বিজ্ঞান নিশ্চয়ই। কারণ আইনের ভিত্তি—

আইনের বিজ্ঞানতত্ত্ব (Jurisprudence) সমাজতত্ত্ব নীতি তত্ত্বের (Sociology—Ethics) উপর প্রতিষ্ঠিত। মানব-সমাজ, শিক্ষা সভ্যতায় যত সমুন্নত হয়, তাহার নীতিতত্ত্ব ততই জটিল ও সূক্ষ্ম হইয়া উঠে। নীতিতত্ত্ব সূক্ষ্ম জটিল হইলে, সমাজের ব্যবহার বিধানও তদ্রূপ হইয়া থাকে। আধুনিক প্রতীচ্য আইন-বিধান যে নীতি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার মূলভিত্তি সাধারণত হিতবাদ (Utiliterianism) —যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকের হিত বা সুখ সংঘটিত হয় (Greatest Good of the Greatest number) সেই নীতি সূত্রই যুক্তিযুক্ত সমীচীন বিধান। বেন্থাম, মিল প্রমুখ হিতবাদী দার্শনিকগণ এই নীতি সূত্র ধরিয়া ব্যবহার বিজ্ঞানের (Jurisprudence) ভিত্তি গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে এই নীতি সূত্রই এখন সমুন্নত জাতির ব্যবহার শাস্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। সুতরাং মানবের মূল নীতিতত্ত্ব বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইলে, মানস-তত্ত্বের (Psychology) পরীক্ষা পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। সুতরাং আইন বিজ্ঞান যেমন জটিল-তত্ত্ব, তেমনি জ্ঞান গবেষণায় অতি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান তত্ত্ব সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা ও অনুশীলন্ করিতে আশুতোষ নিশ্চয়ই প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিতেন।

ব্যবহার-বিজ্ঞানের পরিচর্য্যায় আনন্দ পাইলেও, ব্যবসা হিসাবে আশুতোষ ওকালতি কার্য্যে তেমন তৃপ্তি তেমন শান্তি

সুখ উপভোগ করিতে বোধ হয় সমর্থ হন নাই। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে বিচার আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্বের দিক দিয়া ব্যবহার শাস্ত্রের অনুশীলনে মানব-তত্ত্ব সম্বন্ধেঅতি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের পরিচর্য্যা ঘটে। কিন্তু সে ভাবে ব্যবহার-তত্ত্বকে কয়জন আইন ব্যবসায়ী ব্যবহারজীবী ব্যবহার করিয়া থাকে? আশুতোষ তাহা করিতেন—করিবার ক্ষমতা ধরিতেন। তাহার পরিচয় তাঁহার জজীয়তীতে প্রকটিত হইয়াছিল।

আইন ব্যবসায়—ওকালতির অব্যবহার বা অপব্যবহারের জন্য অনেক সময় অনেক স্থলে হেয় ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছে সত্য। কিন্তু উহার সুব্যবহারে সমাজের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সমাজ-ক্ষেত্রে 'ক্ষমতাই সত্ব' 'might is right—সেস্থলে ব্যবহার বিধানের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই নাই। কিন্তু যে সমাজে ন্যায়, নীতি, সত্য সততা লোক সঙ্ঘকে সংযত ও নিয়মিত করে, তথায় আইনের তুলাদণ্ড ভিন্ন সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা দুর্নীতি দমনের উপায়ন্তর আর কি আছে—অপর কি বা হইতে পারে?

ব্যবসা হিসাবে, উপার্জ্জনের উপায় বলিয়া না হউক, জীবনকে দাসত্বের দুয়ারে বিক্রয় না করিয়া, আজি কালিকার গোলামগিরির কসাইখানায় আত্মমর্য্যাদাকে বলি না দিয়া— স্বাধীন জীবন যাপনের সুগম পন্থারূপে আর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান

চর্চ্চার উপায় রূপে ওকালতি আশুতোষের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল।

আশুতোষ, ওকালতির কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী পণ্ডিত কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্ববাদী সম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়ের নিকট শিক্ষানবীসরূপে (articled clerk) কার্য্য আরম্ভ করিলেন। যথার্থই মণিকাঞ্চনে সম্মিলন ঘটিল।

রাসবিহারী ঘোষ, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় আইন সম্বন্ধে যে কিরূপ দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা এখন আর বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গলার তো কথাই নাই, বাঙ্গলার বাহিরেও বহু বড় বড় মামলা মোকর্দ্দমার কার্য্যে, রাসবিহারীর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা লাভের জন্য যে লোকে কিরূপ লালাইত হইত, তাহা আজিও বহু ভারতবাসীর প্রাণে অতি দৃঢ়রূপে গ্রথিত রহিয়াছে।

যেমন রাসবিহারী, আইনে মহাপণ্ডিত, তেমনি আশুতোষ বহু জ্ঞানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রাখর্য্যে এক বিরাট পুরুষ। এমন দুই বিরাট পুরুষের একই কর্ম্মক্ষেত্রে একই কার্য্যে সহযোগ নিশ্চয়ই মণিকাঞ্চন সম্মিলন।

রাসবিহারী, আশুতোষকে পাইয়া, সত্যই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। রাসবিহারী যখন আশুতোষকে শিক্ষার্থী ভাবে প্রাপ্ত হইলেন, তখন আরও কয়জন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী তাঁহার নিকট কার্য্য শিক্ষা করিতেছিলেন। ঐ সকল বিশিষ্ট

ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বর্ত্তমান হাইকোর্টের সুধীর গম্ভীর সার নলিনীরঞ্জন বোধহয় অন্যতম।

ওকালতি অর্থকরী শক্তিসম্পদপ্রদায়িনী ব্যবসায় বলিয়া উহার একটা বিশিষ্ট মোহ-মদিরা এখন এদেশে খুব খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। তাহা হইলেও তখন আশুতোষের সময়ে ইহার প্রতি ত্যাগশীল ব্রাহ্মণহৃদয়ের একটা বিকট বিতৃষ্ণা ফল্গুসলিল প্রবাহের মত একটু একটু বহিতেছিল। আশুতোষের জ্ঞান-মার্গী ব্রাহ্মণপ্রাণ, ওকালতিকে বিশেষ ভালবাসার সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। নিতান্ত নাচারে পড়িয়া আশুতোষ যেন উহা জীবনের ব্রত না হউক অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে উহার মহৎভাবকে তিনি অবজ্ঞা করেন নাই। উহাতে যে উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ ভাব অনুশীলনের অবসর আছে তাহাও স্বীকার করিতেন।

ওকালতী আশুতোষের প্রাণের প্রিয় সামগ্রী না হইলেও উহা তাঁহার ঘৃণার বা বিবেকবিরুদ্ধ ব্যবসায় নহে। যাহা বিবেক এমন কি বিবেচনার বিরুদ্ধ—যাহা প্রাণের ঘৃণার সামগ্রী তাহা আশুতোষ কখনই অবলম্বনদণ্ডরূপে গ্রহণ করিতেন না।

ওকালতি ব্যবসায় সভ্যসমাজের পক্ষে প্রয়োজন বৈ কি। আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিবৃতি মোকর্দ্দমায় প্রয়োগ করিয়া, প্রকৃত অবস্থা বা ঘটনার মর্ম্ম ধর্ম্মাধিকরণকে বুঝাইয়া দেওয়া, উকিলের এক শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ব্যবহারজীবী আইন ব্যবসায়ী না থাকিলে সমাজের সে কর্ত্তব্য সাধিত হইতে পারে না।

সুতরাং ওকালতী ব্যবসা সামাজিক হিসাবে উন্নত সভ্য সমাজের পক্ষে যে একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খুন জখম, জাল জুয়াচুরি, চুরি ডাকাতি আজিও সকল সমাজেই আছে। এখনও মর্ত্তে স্বর্গের আবির্ভাব ঘটে নাই—অদূর ভবিষ্যতে যে ঘটিবে সে আশাও নাই— মেলিরিজম (melirism) যাহাই বলুক না কেন। সত্য ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই রাজশাসন চলিয়াছে—সুতরাং আইনও চলিয়াছে—আদালতও চলিয়াছে। কলিতে যে চলিবে না সে বিশ্বাস কাহাকেও প্রাণে পোষণ করিতে দেখি না—বৈষ্ণব কবি যতই চীৎকারে বলুন না কেন—"ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।"

ওকালতি ব্যবসাটা ঠিক বিবেকঅনুমোদিত হইতে পারে কিনা এ কথার উত্তরে একবার ধর্ম্মপ্রাণ নীতিপরায়ণ খ্রীষ্টান উকিল কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—'ওকালতি বিবেক-অনুমোদিত না হইবে কেন? ওকালতিতে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যার পোষকতাই বা করিতে হইবে কেন? মক্কেল যাহা বলিতেছে, তাহা মিথ্যা বলিয়া ধরিবার আমার কি কারণ আছে—যখন মানুষের মনের ভাব, কার্য্যের গতি—অবস্থার গতি এক ভগবান ভিন্ন সাধারণ মানুষ কখন বুঝিতে পারে না? হইতে পারে তাহার কথাই সত্য—আমার ধারণা ভুল। তবে তাহার পক্ষ সমর্থন না করিব কেন? আইনের সূক্ষ্ম ভাব গূঢ় মর্ম্ম মামলার অবস্থায় প্রয়োগ করাই উকিলের পাণ্ডিত্য, তাহাই তো উকিলের পবিত্র কর্ত্তব্য।

আশুতোষ, উচ্চ হৃদয়ের উচ্চ ভাব লইয়াই, বিবেকের তীক্ষ্ণ কষ্টিপাথরে মাজিয়া ঘষিয়াই অবশ্য ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ওকালতী ব্যবসা সম্বন্ধে আশুতোষের এই আন্তরিক ভাব, যে তাঁহাকে ভালরূপে বুঝিয়া লইয়াছিল, সেই অবগত ছিল। এ সম্বন্ধে আশুতোষের জনেক পরিচিত ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছেন—'ওকালতি ব্যবসায়কে তুচ্ছ করা একটা ফ্যাসান। আর বাহিরের লোকেরা যে পরিমাণ ইহাকে তুচ্ছ করে, উকীলেরা তার চেয়ে শতগুণ বেশী করে। এইতো সেদিন একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারজীবী হইয়াও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ উকিলদিগকে Licenced freebooter বলিয়া উপহাস করিয়াছেন।

একদিন আমিও খুব ক্ষোভের সহিত সার আশুতোষের কাছে এ ব্যবসায়ের নিকৃষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই দিন তাঁহার একটা উচ্ছ্বাস দেখিয়াছিলাম। তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় আমাকে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাতে আমি খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলাম যে ওকালতি ব্যবসায়কে তিনি কতটা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। আর দশজনের মত তিনি গতানুগতিক ভাবে ওকালতি করিতে যান নাই, ওকালতিকে তিনি একটা বড় ও মহৎ কাজ বলিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার ভিতর চরিত্র মাহাত্ম্য বিকাশের যথেষ্ট অবসর আছে বলিয়াই তিনি এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে বলিয়াছেন, যে

আমরা আমাদের নিজেদের চরিত্রের দোষে ব্যবসায়ের ঘাড়ে চাপাই—আসলে ব্যবসায়ের ভিতর কিছুই অগৌরব নাই। অগৌরব হয় ব্যবসায়ীর চরিত্র গুণে।

ব্যবহার ব্যবসায় সম্বন্ধে এমনি একটা অতি মহান পবিত্র ভাব আশুতোষ হৃদয়ে পোষণ করিতেন। বাস্তবিক আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষই দেখিয়াছি ঋষিকল্প সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ও বহুকাল সেই ব্যবসায়ে থাকিয়া অতি মহান পরম আদর্শ পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছেন। কৈ তাঁহার ওকালতি ব্যবসায় সম্বন্ধে কে কি কথা বলিতে পারে? কে কি সন্দেহের কথাই তুলিতে পারে? যাঁহাকে দেখিলে দর্শকের নয়ন মন পবিত্র হইত, যাঁহার সহিত আলাপ করিলে, আলাপকারী আপনাকে সশরীরে স্বর্গে অবস্থিত বলিয়া মনে করিত, সেই দেবতুল্য মহাপুরুষ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন ও কৃতীত্বের সহিত পরিচালনা করিয়া ব্যবহার-ব্যবসায়ের গৌরব যে কি পরিমাণে সংবর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন এ দেশের কে না জানে—কে ভুলিতে পারে?

সার গুরুদাস প্রমুখ যে সকল পূত চরিত মহাত্মাগণ ওকালতি করিয়া, বাঙ্গলার বারকে মহা গৌরব-ভূষণে বিভূষিত করিয়াছিলেন, আশুতোষও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম একজন—একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। আশুতোষ যথার্থ বাঙ্গলা-

বারের নৈতিক হিসাবে এক সৎশিক্ষার আদর্শ উকিল ছিলেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছিলেন—আমাদের চরিত্রের দোষ ব্যবসায়ের ঘাড়ে চাপাই—আসলে ব্যবসায়ের কিছুই অগৌরব নাই, অগৌরব হয় ব্যবসায়ীর চরিত্র গুণে।

এদেশে অবশ্য এমন উকিল মোক্তারও অনেক আছে, যাহারা বহু পুলিস কর্ম্মের সুদক্ষকৃতীকর্ম্মীকেও কার্য্যগুণে চরিত্রগুণে পরাস্থ করিয়া থাকে। কিন্তু গুরুদাস, আশুতোষ প্রভৃতি ব্যবহার জীবীগণ কি উজ্জ্বল ভাবে সুন্দর রূপে, তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেশের চক্ষে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষ কিছুকাল রাসবিহারী ঘোষের নিকট আইন ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া বিশেষ কৃতী হইয়া উঠিলেন। তৎপরে তিনি নিজেই বড় বড় মোকদ্দমার ভার লইয়া চালাইতে লাগিলেন।

সকল অসাধারণ মনস্বী মহাপুরুষের ন্যায় আশুতোষেরও একটা বিশেষ গুণ এই ছিল যে তিনি যে কোন কার্য্য ধরিতেন, তাহারই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা গুঢ়-মর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া তাহার সাধনা করিতেন। আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আশুতোষ আইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সুক্ষমর্ম্ম বুঝিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সেই গুঢ়তত্ত্ব সূক্ষ্ম মর্ম্ম অধিগত করিবার জন্য, আশুতোষ কেবল এদেশীয় আইন বিধান কেন, বৈদেশিক প্রতীচ্য ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন অনুশীলন করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

প্রতীচ্য জগতে গ্রীস ও রোম সভ্যতার দুই আদিম ক্ষেত্র।

গ্রীস দার্শনিক বিভাগে যেমন প্রাচীন য়ুরোপের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, রোমও তেমনি আইন-বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। প্রতীচ্য জগতের সকল ব্যবহার শাস্ত্রের মূলভিত্তি এই রোমীয় আইন-বিধান। এই আইন-বিধানকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক প্রতীচ্য জগতের সকল আইন-বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে। আশুতোষ ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আইনের মৌলিক ভিত্তি—মূলস্থত্র পর্য্যন্ত অনুশীলন করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্য জগতে, আধুনিক আমেরিকা, আইন অনুশীলনে সভ্যজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আমেরিকায় অধুনা আইনের যেরূপ অনুশীলন পরিচর্চ্চা হয়, এরূপ এখন আর কোথাও হয় না। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বক্তা বর্ক—সেই কথার উল্লেখ করিয়া আমেরিকার স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছিলেন। আমেরিকার বিচারকগণ, আইনের মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিয়া বিচার কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রচলিত নজীর ধরিয়া কোনরূপ বিচার নিষ্পত্তি করেন না।

আশুতোষের সত্যানুসন্ধিৎসু প্রাণ বিচারের এই পন্থাই প্রকৃষ্ট ববিয়া অবধারণ করিল। আশুতোষ, আমেরিকার আইন ও তথাকার নজির বিশেষ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

আইন অধ্যয়ন করিয়া ও আইন ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, আশুতোষ অল্পকালের মধ্যে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়া উঠিলেন। তিনি এতই কৃতী হইলেন যে অল্পকাল মধ্যেই

ডি এল পরীক্ষা প্রদান করিলেন ও তাহাতে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইয়া, 'ডক্টর অব ল' উপাধি লাভে সমর্থ হইলেন। যে সময়ে আশুতোষ এই পরীক্ষা প্রদান করেন, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সভ্য হইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার নিম্নস্থ ছিলেন, সেই সকল ব্যক্তির নিকট পরীক্ষা দিতে তিনি কিছু মাত্র লজ্জা কুণ্ঠা বা হীনতা মনে করেন নাই। আশুতোষ জানিতেন যে প্রকৃত বিদ্যা কখনই ক্ষেত্র বা পাত্রের পার্থক্য ধরিয়া জ্ঞানের বিচার করে না। আশুতোষ—জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় যে বিশেষ কৃতী ব্যুৎপন্ন ছিলেন, জগতের যে কোন বিদ্যার পরীক্ষায় অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন এ ধারণা আশুতোষকে যে জানিত যে বুঝিত তাহারই হৃদয়ে সহজেই দৃঢ়রূপে বদ্ধমুল হইত। এমনই গম্ভীর—এতই অসাধারণ ছিল আশুতোষের বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি। আবার কর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে, মনে হইত আশুতোষ সাধনা সমাধান করিতে না পারিতেন এমন কর্ম্মই নাই। এক কথায় আশুতোষ যে কি ছিলেন আর কি না ছিলেন—কি পারিতেন—কি না পারিতেন তাহা বুঝিয়া লইবার সাধ্য তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনেরও ছিলনা—এমনই অদ্ভুত জটিল রহস্যময় সেই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষের জীবন। বর্ত্তমান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন—"আশুতোষ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" অমরা বলি—কেবল আমরা কেন—আমাদের সঙ্গে অনেকেই বলিবেন—আশুতোষ শুধু ভারতের নয়—শুধু

আসিয়ারও নয়—আশুতোষ সমগ্র জগতের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—আশুতোষের জীবন এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্ভুত অপূর্ব্ব জীবন! যদি জ্ঞান বিদ্যার চক্ষু দিয়া মানবজীবনকে পরীক্ষা করা যায়, তবে আশুতোষের অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব অত্যদ্ভুত ব্যুৎপত্তি কে অস্বীকার করিতে পারে? জগতের জীবনী-ইতিহাস যেমন স্বীয় হৃদয়ে সযত্নে মহাপুরুষের মহৎ জীবনী-হার গাঁথিয়া রাখিয়াছে, তেমনি তৎসহ আশুতোষ-জীবনীও নিশ্চয়ই গ্রথিত রাখিবে। আশুতোষ, জন্মভূমি ভারতের উদ্ধার সাধন নাই করুন—উদ্ধারের সূক্ষ্ম পন্থা তিনি স্বীয় জীবনে ও কার্য্যে নিশ্চয়ই দেখাইয়া গিয়াছেন। বিদ্যার যে ছক তিনি আঁকিয়া জাতির চক্ষে ধরিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের একান্ত স্মরণীয় গন্তব্য উদ্ধারের উপায়-পন্থা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? পতিত অভিশপ্ত ভারতবাসী বলিয়া আধুনিক সভ্য সমুন্নত জগৎ যাহাই বলুক, ভারতের কোন হতভাগ্য পাতকী আশুতোষের মহান মহত্ত্ব বিশাল বিরাটত্ব অস্বীকার করিতে পারে?

আশুতোষ দীর্ঘজীবী হন নাই—হইতে পারেন না। জগতের সকল মহাপুরুষই বিশ্ব-বিধাতার বিশ্বরাজ্যের একটা কোন বিশেষ কার্য্যভার লইয়া জগতে অবতীর্ণ হন। সেই কার্য্য যত সত্বর হয় সমাধা করিয়া অথবা তাহার ভিত্তি পত্তন করিয়াই তাঁহারা উচ্চধামে প্রস্থান করেন। তাঁহারা সাধারণ মাটীর মানুষের মত মাটীতে পড়িয়া জীবনের ভোগ-বিড়ম্বনার ভার বোঝা দীর্ঘ দুঃসহ জীবনে কখনই বহন করেন না। আশুতোষ

করিবেন কেন? আশুতোষ চলিয়া গিয়াছেন—পথ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এদেশবাসী সেই শ্রেষ্ঠ পবিত্র বিদ্যাপন্থা ধরিয়া চলিতে পারিলেই, আশুতোষের আগমন সার্থক—তাহাদেরও জীবন সফল। নতুবা সকলই পণ্ড—সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি।

আশুতোষ সকল বিষয়ে সুদক্ষ—সকল ক্ষেত্রে সুকৃতী ছিলেন। বিধাতা সত্যই যেন আশুতোষকে সকল বিদ্যার অধিকারী—সকল কর্ম্মের কর্ম্মী করিয়া আদর্শ পুরুষরূপে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। আদর্শের সার্থকতা কিসে, তাহা অন্ধ মূঢ় জাতি বুঝিবে কি?

আশুতোষ যাহা ধরিতেন, তাহাতেই অচিরে সফলতা লাভ করিতেন—কৃতার্থ হইতেন। তিনি যেন সর্ব্বক্ষেত্রেই সাফল্যের শুভ লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া, ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন দেশকে জ্ঞানের মহান তত্ত্ব, কর্ম্মের রহস্য জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে আসিয়াছিলেন।

আশুতোষ অল্পকালেই ওকালতি ব্যবসায়ে বিশেষ কৃতীত্ব লাভ করিলেন। আইনের গূঢ় মর্ম্ম ব্যাখ্যায়—সেই ব্যাখ্যা মোকর্দ্দমায় প্রয়োগ-চাতুর্য্যে, মামলা সম্বন্ধে গভীর যুক্তি তর্কে, ও বক্তৃতার ভাষা ও ভাবের ওজস্বিতায় তিনি অল্পকালেই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে অসাধারণ কৃতীত্বলাভ করিলেন। শ্রেষ্ঠ-ব্যবহারজীবীরূপে তাঁহার যশ-প্রভা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। যখন এই ব্যবসায় পূর্ণতালাভ করিয়া, আশুতোষের অর্থাগমের

পথ অতিশয় প্রশস্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তি বিশেষরূপে বিবর্দ্ধিত হইল—তৎপূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আশুতোষের উপর নিপতিত হইয়াছিল। আশুতোষকে হাইকোর্টের জজীয়তী কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য এখন কর্ত্তৃপক্ষ উৎসুক হইলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছায় যখন আশুতোষ ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় হইতে হাইকোর্টের বিচারআসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার বহু মক্কেল। মোকর্দ্দমার ব্রীফে তাঁহার উকিলের বাক্স ভরপুর। জজীয়তী পদ গ্রহণ করিয়া আশুতোষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। যখন তিনি জজ হইলেন, তখন তাঁহার ওকালতির আয় প্রায় মাসিক দশ হাজার টাকা। একি সহজ আয়! সহজ ক্ষতি!

পঞ্চদশ অধ্যায়।

আশুতোষ জজ হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশের অধিক হয় নাই। আশুতোষ যে সময়ে—যে বয়সে শিক্ষায় ও কর্ম্মে অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালীজীবনের গৌরব শিখরে সমুন্নত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান যুগে একমাত্র আশুতোষের পক্ষেই সম্ভব। আশুতোষ তেজস্বী ব্রাহ্মণ-বীর্য্য-রূপী। তিনি কখন বিদেশে যান নাই—বিদেশী হাবভাব ধারণ করেন নাই। বিদেশে গমন না করিয়া বিলাতী সাধনা না সাধিয়া, দেশে রহিয়া ঘরে বসিয়া, বাঙ্গালী যে কত বড় হইতে পারে,—বিদ্যাপীঠে কর্ম্মক্ষেত্রে কতদূর উন্নতির উচ্চ চূড়ায় উঠিতে পারে, তাহা নিজের জীবনে দেখাইয়া, হীন ও দীন বাঙ্গালী জীবনকে ধন্য করিয়াছেন। আশুতোষকে এখন হতভাগ্য আমরা কি চিনিব না? আমাদের মত পতিত জাতির পক্ষে এই প্রবচনটি 'সিদ্ধ মহাপুরুষরা কখন আপনার কালে আপনার দেশে সম্মান সমাদর পান না—prophets are not regarded in their own time and own country—যেমন খাটে এমন আর কোথাও নয়।

আশুতোষের জীবনের সার্থকতা সফলতার জীবন্তদৃষ্টান্ত যেন হিন্দুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—হে হতভাগ্য

হিন্দু, তুমি সুপ্ত সিংহ, জাগ্রত হও। গুঢ় বিদ্যাসাধনার গুঢ় তত্ত্ব যে তোমারই গৃহের অভ্যন্তরে—তোমারই হৃদয়কন্দরে নিহিত রহিয়াছে। সাধনা কর—অনুশীলন কর, তুমি যে যথার্থই বিদ্যারূপিণী বীণাপাণির বরপুত্র। বিদ্যাক্ষেত্রে তোমার সাফল্য সুনিশ্চিত। সে জন্য তোমায় আর বিদেশে ছুটিতে হইবে কেন?' একথা আশুতোষের বিদ্যাব্রত সফল জীবন যেন জলদগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়া, নিদ্রিত বঙ্গবাণীর নির্জ্জীব অবসাদগ্রস্ত প্রাণকে জাগরিত করিতেছে। আশুতোষের কর্ম্ম জীবন যেন কঠোর বজ্রনির্ঘোষে শুনাইতেছে—'অলস অসাড় বাঙ্গালী—'উঠো, জাগো সবলেএকবার উত্থিত হইয়া দাঁড়াও! বজ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়াও—আবার লৌহ-মানব—iron man সাজিয়া রুদ্র মূর্ত্তিতে দাঁড়াও—কর্ম্মযোগী হইয়া, এই মহান জীবনের আদর্শ দৃষ্টান্তে কেবল দেশার্থে বিদ্যার্থে নিষ্কাম কর্ম্মীরূপে কর্ম্ম সাধনা কর। সিদ্ধি তোমার করায়ত্ত অতি নিশ্চিত।

আশুতোষের মহান জীবনী এই মহদ্বাণী—কর্ম্মের এই মহৎ গীতি উদাত্তস্বরে বিঘোষিত করিতেছে। নিদ্রা ভাঙিয়া চৈতন্য লাভ করিলেই সুপ্ত বাঙ্গালী তাহা শুনিবে—শুনিলেই ধন্য কৃত কৃতার্থ হইবে।

আশুতোষ যখন বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের মহা সম্মান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হন,তখন ভারতে এক অতি বিষম—অতি কঠোর যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তখন সহৃদয় লাট রীপণ ভারত হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থান অধিকার

করিয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া বসিয়াছেন, কুটবুদ্ধি রাজনৈতিক লর্ড কর্জ্জন। লর্ড কর্জ্জন ভারতের ভাগ্যতরীর কর্ণধার হইয়া কিরূপ শাসনপ্রণালী লইয়া ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

রাজনৈতিকক্ষেত্রে ভারতবাসী যাহাতে এক হইতে না পারে, ভারতের বহুভাষার ভাষী, বহু ধর্ম্ম অবলম্বী বহু জাতি এক ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যাহাতে একটা প্রবল জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে না পারে, তাহাই ছিল—তাঁহার কূটরাজনীতির সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য।

ঐতিহাসিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে ধর্ম্ম প্রভাব, রাজনৈতিক ও ভৌগিলিক অবস্থিতি, অতীত পুরাবৃত্তের আদর্শ প্রভৃতির ন্যায় ভাষাও জাতীয়জীবন গঠনের এক বিশেষ প্রবল উপাদান। বহু ভাবে অনুপ্রাণিত বহুমুখী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা সমাজকে এক এক বিরাট বিশাল জাতিতে পরিণত করাই আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবন গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়; এবং বৈদেশিক বিধর্ম্মী জাতির অধীনে রহিয়াও ভারতের বহু ধর্ম্মপন্থী বহু জাতি রাজনীতি-ক্ষেত্রে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, একটা প্রবল বিরাট জাতি রূপে গড়িয়া উঠিতেছিল, লর্ড কর্জ্জনের কুটনীতি ভারতের সেই বিশাল জাতীয়তার অট্টালিকা ভাঙিবার জন্য খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। লাট কর্জ্জন, নিজ অভিসন্ধি সাধনের জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তিনি

এদেশে আসিয়াছিলেন—ভারতের উদীয়মান বলবান জাতীয় জীবনকে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য—গড়িবার জন্য নহে। জাতীয় ভাষা পাছে এক হইয়া দেশ মধ্যে কোনরূপ একতা আনয়ন করে এতটুকু তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। তাই তিনি বিদ্যালয়ে প্রচলিত সাধারণ পাঠ্য গ্রন্থ যাহাতে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় লিখিত হয়—স্থানীয় ভাষা তাহাতে ব্যবহৃত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধানত সেইরূপ গূঢ়উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বৈদেশিক পুস্তক ব্যবসাদারদিগের পৃষ্ঠপোষণ করিতে, দেশীয় গ্রন্থকার, দেশীয় পুস্তকবিক্রেতা ব্যবসায়ী বর্গকে নিরুৎসাহ বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে, কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

লর্ড কর্জ্জন বুঝিলেন, উচ্চশিক্ষা প্রতীচ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক অন্ধভারতবাসীর চক্ষু ফুটাইয়া দিতেছে, সেই শিক্ষা ক্ষেত্রের দুয়ার কিসে ভারতবাসীর পক্ষে চিররুদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন। তিনি এদেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিকূলে এক আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তজ্জন্য ভারত কাউন্সিলে এদেশের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে এক উৎকট আইনের প্রস্তাব করিলেন।

এই সময় মারহাট্টা দেশীয় মহামনস্বী অসাধারণ প্রতিভা-শালী পুরুষ গোখলে, উক্ত সভার একজন অতি দক্ষ দেশীয় সভ্য ছিলেন। তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী, তেমনি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি জীবনে অর্থের প্রতি বা ভোগ বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি মহামতি

তিলকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ রহিয়াও, ইংরাজ-রাজের বা ইংরাজ রাজনীতির উগ্র বিপক্ষ বৈরী ছিলেন না। পক্ষান্তরে যাহাতে স্বদেশের কল্যাণ উন্নতি সংসাধিত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ অক্লান্ত যত্ন করিতেন। মহাপ্রাণ গোখলে জাতীয় কল্যাণ কামনায় ভোগ-বিলাস বর্জ্জন করিয়া ত্যাগ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই আদর্শ পুরুষ কংগ্রেসের জাতীয় সভায় বহু বার বহু গবেষণা-পূর্ণ উপদেশ মূলক বক্তৃতায় সভ্যমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। লাটসভার বজেট সমালোচনায় ইনি অসাধারণ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মন্তব্য পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। তখন কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় বহু ব্যক্তি, বহু সংবাদপত্র পর্য্যন্ত তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার আলোচনা করিয়া এমনও বলিয়াছিল যে গোখলে বিলাতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যদি কোন দলে যোগদান করিবার অবসর বা সুযোগ লাভ করিতে পারিতেন, তবে বহু ব্যাপারে সেই দলের জয় আশা বিশেষ সফলতা সম্পন্ন হইয়া উঠিত। এমনই অসাধারণ কৃতী পুরুষ ছিলেন মহামতি গোখলে। এই অসাধারণ প্রতিভার সহিত ভারতের কাউন্সিলে সম্মিলিত হইল আর এক অদ্ভুত প্রতিভা—আশুতোষের প্রতিভা।

উচ্চশিক্ষাই বর্ত্তমান ভারতের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়াছে। এই শিক্ষাই উত্তেজিত হইয়া, বৈদেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছে। এই শিক্ষাই প্রবল হইয়া কালে ইংরাজ রাজ শক্তির মূলোচ্ছেদ করিতে পারে। সুতরাং এখনই

ইহার ধ্বংস সাধন আবশ্যক। আর ইহাকে বাড়িতে দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে।

এইরূপ চিন্তায় অধীর হইয়া, রাজনীতিবিশারদ লাট কর্জ্জন ভারতের উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। বাস্তবিক ইহা লাট কর্জ্জনের নিতান্তই ভ্রান্ত-ধারণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কেননা শিক্ষিত সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রেই বুঝে যে ইংরাজ-শাসনে ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এখনও তদ্বারা বহু শুভকর উন্নতি সাধিত হইতেও পারে। বহু শিক্ষিত ভারতবাসীর বিশ্বাস এই যে ভারত ও ব্রীটনের মধ্যে বিদ্বেষভাব বিদূরিত হইয়া, সহানুভূতি সম্মিলনের ভাব জন্মিয়া, উভয় দেশ উভয় জাতি একীভূত হইলে, জগতের প্রভূত মঙ্গল উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে। জগতে যে একটা সাম্য ও মৈত্রীভাব আনয়ন—জ্ঞান বিজ্ঞান বিবর্দ্ধন—শান্তি সুখ সম্প্রসারণ চেষ্টা চলিতেছে, তৎপক্ষে বিশেষ দ্রুত উন্নতি ঘটিতে পারে। ভারত ও ব্রীটনের কেন—সকল সভ্য সমুন্নত জাতির মৈত্রী সাম্য সহানুভূতির ক্ষেত্রে সম্মিলন জগতের পক্ষে সেই তো মর্ত্তে স্বর্গ সংস্থাপন। লর্ড কর্জ্জন বিরাট সাম্রাজ্যবাদী—প্রীতির ভাব—সাম্য মৈত্রীর ভাব তাঁহার মত রাজনৈতিকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

কুট-ব্রীটিশরাজনৈতিকের অন্তরের কামনা ভারতকে একেবারে ব্রীটনের পদতলে চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে

নিষ্পেষিত করিয়া হৃদয়ের রক্ত শোষণ। মহাপ্রাণ সদাশয় শাসনকর্তা লর্ড রীপণ, ব্রীটন ও ভারতকে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য যে সদ্ভাব সহানুভূতির বীজ বপন করিয়াছিলেন, লর্ড কর্জ্জনের কঠোর নীতি তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল।

* * * *

উচ্চ অঙ্গের প্রতীচ্যশিক্ষা যে নব্যভারতের প্রাণে অনুরাগের পরিবর্ত্তে কেবল বিকট বিরাগের উৎপাদন ও পরিপোষণ করিতেছে কর্জ্জনের উর্ব্বর মস্তিষ্কে এই বিষম ধারণাই পরিস্ফুরিত হইল। তিনি চারিদিকে ভারতবাসীর অভ্যুত্থানের বিভীষিকা-সঙ্কুল দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্থির বুঝিলেন, ইহার মূলীভূত এক প্রধান কারণ উচ্চ শিক্ষা।

এই উচ্চ শিক্ষা ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া, লাট কর্জ্জন অগ্নি-যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তখন তাহার প্রতিকূলে যে কয়জন প্রতিভাবান কৃতী ভারতবাসী দাঁড়াইলেন, তন্মধ্যে মতিমান গোখলে ও মনস্বী আশুতোষ দুইজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

এদেশীয় বিদ্যাপীঠে আশুতোষ তৎকালের এক গৌরব নিশান। অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি তৎসহ শিক্ষাক্ষেত্রের গভীর অভিজ্ঞতা সম্মিলিত হইয়া,আশুতোষকে বিদ্যা-ব্যাপারে এক মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছিল। এই মহাশক্তি যে পক্ষে নিয়োজিত

হইবে, তাহাই জয়যুক্ত ও যাহার বিপক্ষে নিয়োজিত হইবে, তাহাই বিজিত হইবে, এ ধারণা ভারতবাসীগণের অন্তরে বাহিরে অনেকেই প্রাণে প্রাণে পোষণ করিয়াছিল।

আশুতোষ প্রচণ্ড প্রতাপে কর্জ্জনের শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইন বিধানের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কর্জ্জন স্বয়ং ও তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গ সকলেই বেশ বুঝিয়া লইলেন—আশুতোষকে। লর্ড কর্জ্জনও বুঝিলেন—আরও অনেকে বুঝিল—এ দুর্জ্জয় সিংহ বড় সহজ সামগ্রী নয়।

লর্ড কর্জ্জন আশুতোষের অসাধারণ শক্তি উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় রাজকীয়শক্তি সহ সংযোগ করিতে বিশেষ উৎসুক হইলেন। লাট কর্জ্জন মনে করিলেন কোন উপায়ে রাজ-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া আশুতোষকে আপনার দলে আকর্ষণ করিতে পারিলে একটা বিরাট লাভ। তিনি সাগ্রহ-হৃদয়ে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হাইকোর্টে বিচারপতির পদ শূন্য হইল। বিশিষ্ট মানবজ্ঞ কর্জ্জন এ সুযোগ বিশেষ আগ্রহের সহিত ধারণ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দৃষ্টি আশুতোষে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে এই সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, তিনি উৎসুক হৃদয়ে তাহা ধারণ করিলেন। আশুতোষকে হাইকোর্টের জজীয়তী পদে অভিষিক্ত করিলেন।

বঙ্গভূমি, প্রথমাবধি আশুতোষের অপূর্ব্ব বিদ্যার গভীরতায়

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, কর্ম্মের দক্ষতায় বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিল। নব্যবঙ্গ আশা করিয়াছিল আশুতোষ, নিশ্চয়ই আত্মহারা হইবেন—আপনাকে ভুলিবেন—আপনাকে ভুলিয়া মহাপ্রাণপণে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন—আপনাকে উৎসর্গ করিবেন। বড় আশায় ছাই পড়িল—বড় সাধে বজ্রাঘাত হইল!

অনেকে নিরাশ হইল। হতাশ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল—সোণার বাঙ্গলা সত্যই আশুতোষের ন্যায় মহারত্ন হারাইয়া পথের কাঙ্গালিনী হইল।

অনেকে মনে করিল—আশুতোষ রাজকীয়শক্তির সহিত সম্মিলিত হইলেন—রাজকীয় দলে মিশিয়া গেলেন। আশুতোষ আর সে আশুতোষ রহিলেন না—আর সে আশুতোষ রহিতে পারিবেন না।

যখন হাইকোর্টের বিচারে সুরেন্দ্রনাথের জেল হয়, তখন বঙ্গদেশ যেন ভীষণ ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হইয়াছিল। দেশ মধ্যে এক প্রবল আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গ উচ্ছাস উচ্ছসিত হইয়াছিল। আশুতোষের পাঞ্চজন্য একবার সেই জাতীয় উচ্ছাসের কালে বজ্রনির্ঘোষে নিনাদিত হইয়াছিল। দেশ মনে করিয়াছিল, বঙ্গের সব্যসাচী সেই শঙ্খধ্বনি নিয়তই নির্ঘোষিত করিয়া, সুপ্ত জাতীয়জীবনকে জাগ্রত জীবন্ত করিয়া তুলিবেন। সাধে বাধ পড়িল!

এ কি হইল! আশুতোষ—দুৰ্জ্জয়সিংহ আশুতোষ, কৰ্জ্জন দলভুক্ত হইলেন—রাজার দুয়ারে সামান্য স্বার্থের ভিখারী হইয়া, একটা তুচ্ছ ধামাধরা খয়েরখাঁ হইলেন। অনেকে এই ভাবিয়া আশুতোষের আশা ত্যাগ করিল।

প্রবল অগ্নিকে কে ভস্মে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে? প্রচণ্ড অগ্নিশিখাকে কেই বা নিচের দিকে নামাইয়া রাখিতে পারে? "অধঃকৃত স্যাপি তনূ্যন পাতো অধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব।"

আগুনকে নীচের দিকে লইতে চেষ্টা করিলেও, তাহার শিখা কখনই নীচের দিকে যাইবে না—আগুনের শিখা উচ্চের প্রতি ধাবিত হইবেই হইবে।

আশুতোষ রাজকীয় কার্য্যে—যে সে কার্য্য নয়—খুব বড় কার্য্য—সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের বিচারকের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন। আর্থিক হিসাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কোথায় মাসিক প্রায় দশ হাজার টাকা আর কোথায় মাসে পাঁচ হাজারের অধিক নয়। আশুতোষ অর্থের মায়া মোহ ত্যাগ করিয়া, জজীয়তীপদ গ্রহণ করিলেন। কেন এমন করিলেন? একথা অনেকে জিজ্ঞাসা করে—এ সম্বন্ধে বিচার বিতর্কও করিয়া থাকে। আশুতোষের যদি যথার্থ তেজস্বিতা—প্রকৃত ব্রহ্মতেজ থাকিত—তবে পরাধীনতারতার চাকুরী গ্রহণ করিবেন কেন? এ কথার প্রকৃত

উত্তর আশুতোষ স্বয়ংই মুখে দিন বা না দিন, জীবনে কার্য্যে দিয়া গিয়াছেন।

একটা বড় কাজ করিবার জন্য যে আশুতোষ পতিত বঙ্গ-দেশে অভিশপ্ত বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—প্রতিবাদেরও অবসর নাই। আর সেই বড় কাজের দ্বারা যাহাতে নিজের দেশ নিজের জাতি বাড়িয়া উঠিতে পারে, সেইটাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

আশুতোষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি গোড়া হইতেই ভালরূপেই বুঝিয়া-ছিল যে রাজকীয়শক্তির সহিত স্বীয়শক্তি সম্যকরূপে সম্মিলিত না করিলে, কখনই এই কালে এই অবস্থায় সে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না। তিনি বৃথা নিস্ফল হুজুগ লইয়া কাজ করিতে জানিতেন না—ভালও বাসিতেন না। অসাধারণ কর্ম্মবীর আশুতোষ জানিতেন—বেশ ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন যে মন্ত্র-গুপ্তি সিদ্ধি সাফল্য লাভের প্রধান উপায়। তাই কোনকালেই কেহ তাঁহাকে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিতে দেখে নাই—শোনেও নাই। নীরব কর্ম্মযোগীর ন্যায় আশুতোষ সারাজীবন নীরবেই কর্ম্মের সাধনা করিয়া সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন—স্বজাতিকে সিদ্ধি-পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন।

আশুতোষ যে অর্থের জন্য জজীয়তী লন নাই, ইহা কে না জানে? যখন তিনি ওকালতি ছাড়েন, তখন তাঁহার যথেষ্ট আয়।

জজীয়তীর মাহিনা সে আয়ের অর্দ্ধেক নহে। আশুতোষ সম্মান গৌরব বলিয়াও উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। কারণ কালের হাওয়া বদলাইয়াছে দেশের মতিগতি অন্যরূপ হইয়াছে, তাহা আশুতোষ বেশ বুঝিতেন। তিনি যে স্বভাবতঃই ধামাধরা খয়ের খাঁ ছিলেন না—গোলামী ভাব—slave mentality—যে সম্পূর্ণ তাঁহার স্বাধীনধাতুর বিরুদ্ধ ছিল, তাহা কে না জানে? আশুতোষ যে কিরূপ স্বাধীনচেতা তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাহা জানে? যিনি উনিভারসিটির কর্ম্মক্ষেত্রে বজ্রনির্ঘোষে মৃতকল্প জাতির কর্ণে স্বাধীনতার মহামন্ত্র নিনাদিত করিয়াছিলেন—যে মন্ত্র চিরদিন হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিলে বাঙ্গালী—ভারতবাসী ধন্য কৃতকৃতার্থ হইবে, সেই স্বাধীনতা যজ্ঞের মহামন্ত্র Freedom first, Freedom second, Freedom always যাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে বিঘোষিত হইয়াছিল—সেই মহাপুরুষ আশুতোষই তো স্বাধীনতাযজ্ঞের হোতা, স্বাধীনতার পূতমন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মর্ষি। হেন আশুতোষকে কে বলিতে পারে স্বার্থপর তোষামোদী দাসভাবাপন্ন ব্যক্তি?

আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে স্বদেশের করায়ত্ত করিতে না পারিলে, জাতীয়জীবন জাগরণের উপায়ন্তর নাই। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সংমিশ্রণ সম্মিলন ব্যতীত সে উদ্দেশ্যও সংসিদ্ধ হইতে পারে না। আশুতোষ জানিতেন উপযুক্তরূপে বিস্ফোরক বারুদ প্রস্তুত করিয়া, যথাসময়ে অগ্নি প্রয়োগ করিতে পারিলে ভীষণ অগ্ন্যুদ্গম নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী—আরও জানিতেন

জাতীয় জীবনের প্রকৃষ্ট বারুদ তৈয়ারীর প্রকৃষ্টক্ষেত্র বিদ্যাপীঠ আর তাহার উপাদান তরুণজীবন। জাতীয়নেতার পক্ষে দুইটাই খুব বড় জিনিস। আশুতোষ এই দুই শ্রেষ্ঠক্ষেত্র ও উপাদানকে উপযুক্তরূপে তৈয়ারী করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

ঐ দুইটাই তখন সম্পূর্ণ কর্ত্তৃপক্ষের করায়ত্ত। আশুতোষ ঐ দুইটাকে স্বজাতির হাতে লইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বেমালুম মিশিয়া জজীয়তী লইলেন। কর্ম্মবীর আশুতোষ যথার্থই জানিতেন প্রকৃত গৌরব কার্য্যে—বাহিরেও নহে—কথায়ও নহে। যাহা দেখিয়া লোকে বিচার করিবে, সেই কার্য্যেই প্রকৃত গৌরব নিহিত।

লর্ড কর্জ্জন আশুতোষকে চিনিয়াছিলেন। আশুতোষ নিজ শক্তিতেই তাঁহাকে চিনাইয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় আইনে আশুতোষের প্রবল শক্তি প্রকটিত হইয়াছিল। আবার যখন লাট সভায় বজেট আলোচনা হয়, তখনও আশুতোষ বিশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে কথা এখনও অনেকেরই মনে জাগরূক আছে।

বজেট আলোচনার সময় আশুতোষ কিছুকাল নীরব ছিলেন। লর্ড কর্জ্জন নিজেই তাঁহার মতামত চাহিলেন। আশুতোষ তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বজেট আলোচনা করিয়া, তাহার বিশেষ গলদ দেখাইয়া দিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লর্ড কর্জ্জন আশুতোষের অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় পাইলেন। আশুতোষকে রাজশক্তিতে সম্মিলিত করিবার জন্য

ইচ্ছুক হইয়া আশুতোষকে জজীয়তী পদে নিযুক্ত করিলেন। আশুতোষের অসাধারণ প্রতিভাসম্ভূত কৃতীত্ব লাট কর্জ্জনকেও এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে তিনি মুক্তকণ্ঠে সে কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপীঠই আশুতোষের প্রাণের পরম প্রিয়পদার্থ ছিল। আর আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন এই পবিত্র পীঠকেই অবলম্বন করিয়া স্বদেশের উন্নতি ও স্বজাতির কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। অন্য সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন আলোচনা উপায় অনুষ্ঠান নিতান্ত নিস্ফল না হইলেও, ইহার তুলনায় নিতান্তই সামান্য। বিদ্যাপীঠকে সম্যকরূপে স্বদেশীয় শক্তির মধ্যে আনিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সম্মিলন ও তাহার সাহায্য নিতান্তই প্রয়োজন। ইহাই প্রকৃষ্টরূপে অবধারণ করিয়া আশুতোষ জজীয়তী পদ সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

আশুতোষ জজ হইয়া যেরূপ অসাধারণ কৃতীত্ব প্রদর্শন করেন, তাহা বিশেষরূপে লিখিবার তেমন প্রয়োজন দেখি না। কারণ তাহা চিরকাল বাঙ্গালীহৃদয়ে উজ্জ্বল চিত্র পটের ন্যায় সুদৃঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় শুনা যায় বাঙ্গালীর মধ্যে জজরূপে অসাধারণ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আইনের সূক্ষ্মমর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব যেমন মোকর্দ্দমার বিচারে প্রয়োগ করিতেন—গতানুগতিকভাবে

নজিরের ধারা ধরিয়া চলিতেন না, আশুতোষের বিচার কার্য্যও তদ্রূপ ছিল।

আশুতোষের জজীয়তী ও তাহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শী নব্য ব্যবহারজীবী অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

বিচারক ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারজ্ঞ বলিয়া স্যর আশুতোষ যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা এত সুপরিচিত যে সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার অবসর নাই। দীর্ঘকাল তিনি বাঙ্গলার প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহার দর্শন করিয়া এই সেদিন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে অসাধারণ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও বিচারক ও ব্যবহারজীবী সকলের কাছে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা খুব অল্প বিচারকের ভাগ্যেই ঘটে।

স্যার আশুতোষ যে সময়ে বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন সে সময়ে দেশের আইন কানুন নানা ব্যবহার বিধিতে এবং নানা নজীরে লিপিবদ্ধ হইয়া এত সুনিরূপিত হইয়া গিয়াছিল যে কেবল মাত্র সেই সুনির্দ্দিষ্ট আইন উপস্থিত ব্যবহারে প্রয়োগ করা ভিন্ন আইনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নূতন বিধি প্রণয়নের অবসর বিচারকদের বড় ছিল না। তাই বিলাতের লর্ড ম্যান্স ফিল্ড বা লর্ড হোল্টের মত, কিম্বা আমাদের দেশের দ্বারকা-নাথ মিত্র, মথুস্বামি আইয়ার প্রভৃতির মত আইনের মৌলিক বিধি আলোচনা করিয়া, তার সুনিপুণ প্রয়োগ দ্বারা চিরস্থায়ী খ্যাতি বা প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিবার অবসর তাঁর খুব

বিস্তীর্ণ ছিল না। কিন্তু তার অসাধারণ শক্তি এত আইন-নজীরের কড়াকড়ির ভিতরও আপনাকে প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্যর আশুতোষ কোনও দিন কেবলমাত্র মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দিকে নজর রাখিয়া রায় লেখেন নাই। আইনের তর্ক উপস্থিত হইলে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া এমন ভাবে তিনি রায় লিখিতে চেষ্টা করিতেন যাহাতে সে আইনের তর্কের চিরদিনের মত সুস্থির ভাবে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল, কিন্তু তিনি আইনের তর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারের অবসর পাইলে তাহাতে তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি প্রয়োগের অবসর লাভে ঠিক তেমনি আনন্দ লাভ করিতেন যেমন আনন্দ তিনি পাইতেন অঙ্কশাস্ত্রের জটিল সমস্যার সমাধানে। আশুতোষ উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে জজ হইয়া যে কিরূপ অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত নির্ভীক ভাবে বিচার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালায় অতীব সুপরিচিত। বিবেক বিবেচনা, যুক্তি তাঁহার বিচারবুদ্ধিকে যে সত্য সিদ্ধান্তের শেষ সীমায় প্রেরণ করিত, তিনি কোন জাগতিক শক্তির মুখাপেক্ষী না হইয়া, বিজয়ী বীরের ন্যায় সেইখানেই উপনীত হইতেন।

বাঙ্গলার কে না জানে সেই বিখ্যাত রাজবিদ্রোহের মামলার কাহিনী—যাহাতে কয়টী তরুণবয়স্ক বঙ্গীয়যুবক

অভিযুক্ত হইয়া বিষম নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল? তখন ব্যারিষ্টার প্রবর গার্থ কর্তৃপক্ষের পক্ষ সমর্থক রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গার্থ-সাহেব নানারূপ স্থূল কৌশল অবলম্বন করিয়া আসামী দিগকে দণ্ড দেওয়াইবার জন্ম কতই বৃথা যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়াছিলেন। বহু যুক্তির মধ্যে মিঃ গার্থ একটা বড় যুক্তি তর্ক আসামীগণের বিপক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে আসামীগণের ঘরে 'গীতা' 'চণ্ডী' আদি রাজবিদ্রোহ-উদ্দীপক কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই বলিয়া ব্যারিষ্টার গার্থ বিশেষ আস্ফালন আরম্ভ করিলেন।

তখন ন্যায়ধর্ম্মরূপী আশুতোষ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সিংহ গর্জ্জনে গার্থের সে অসার যুক্তি-জালকে আক্রমণ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন। আশুতোষ বলিয়াছিলেন—মিঃ গার্থ, গীতা চণ্ডী যদি রাজদ্রোহজনক হয় তবে আমাকেও আসামী করা তোমাদের কর্ত্তব্য। কারণ আমার ঘরেও ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বহুল পরিমাণে সংগৃহীত রহিয়াছে। তুমি জান না যে ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ কি অপূর্ব্ব সামগ্রী! কত গভীর জ্ঞান শান্তি পরমানন্দের আধার ঐ সকল অসাধারণ ধর্ম্মগ্রন্থ!"

গার্থ সাহেব আশুতোষের সেই বজ্রনির্ঘোষে স্তম্ভিত হইলেন। আর সে সম্বন্ধে কথা লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এদেশে ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণের বিচার-

ইতিহাসে সে অমূল্য কথাগুলি চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিবে।

পুলিস জুলুমের এক উৎকট মামলা-নাট্য অল্পদিন পূর্ব্বে হাওড়ায় অভিনীত হইয়াছিল। জনৈক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক তাহাতে পুলিস কর্ত্তৃক বিশেষ লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। এমন কি হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত তাহাতে পুলিসের পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটি বড়ই নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। হাওড়ার স্থানীয় বিচারকর্ত্তা স্বয়ং পুলিসেরই জয়যুক্ত বিচার রায় প্রদান করিলেন। তাহাতে এক বিষম আতঙ্ক বিভীষিকার আঁধারে কিরূপে দেশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা এখনও অনেকে ভুলিতে পারে নাই। সৌভাগ্যের বিষয় ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটি উচ্চপদস্থ অর্থবান ছিলেন। তিনি আপীল করিয়া হাইকোর্টের আশ্রয় লইলেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার আপীলের বিচার ভার পড়িল নির্ভীক বিবেকবান বিচারপতি আশুতোষের উপর। আশুতোষ নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত বিচার করিলেন। পুলিসের দণ্ড বিধান করিয়া, তিনি ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির পক্ষে জয়যুক্তরায় প্রদান করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস উচ্ছসিত হইয়াছিল! শতমুখে বঙ্গ আশুতোষের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। কে ভুলিয়াছে এখন সে কথা?

তখন অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিল এ মোকদ্দমায়

পুলিসের জয় নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যখন পুলিসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের জয়লাভের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। কিন্তু আশুতোষের বিচাররায় দেখিয়া দেশ যুগপৎ হর্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

আশুতোষের যেরূপ আইনজ্ঞান ও অপূর্ব্ব বিচারশক্তি ছিল, তাহাতে তিনি যে স্থায়ীভাবে বঙ্গীয় হাইকোর্টে চিফ-জষ্টিসের পদে আসীন থাকিবেন, সকলেই এ আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু আশুতোষ যতই বিদ্বান বা বুদ্ধিমান হউন না কেন, তিনি যে ভারতবাসী। সরস্বতী তাঁহাকে যে কৃপা করিয়াছিলেন, সে কৃপা তিনি বৈদেশিক রাজ-শক্তি হইতে কিরূপে লাভ করিবেন? আশুতোষকে বিচার ব্যাপারে কেহই কখন পরাজিত করিতে পারিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না।

যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে, তেমনি উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারক্ষেত্রে তিনি সর্ব্বত্রই বিচার বিতর্কের সংগ্রামে জয় পতাকা লাভ করিতেন। জয়মাল্য যেন সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র আশুতোষেরই করতলগত।

কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? আশুতোষ যে ভারত-বাসী। আশুতোষের শরীরের বর্ণ শ্বেত নহে। আশুতোষ কিরূপে ইংরাজরাজের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির মহাগৌরব সম্মান সঙ্কুল পদ পরিশোভিত করিতে

সমর্থ হইবেন? নাই হউন—চিফ জষ্টিশের সম্মান গৌরব মণ্ডিত পদ তিনি পাউন বা নাই পাউন, আশুতোষ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের বিচারপতির পদে আসীন হইয়া কি তেজস্বিতায়, কি নির্ভীকতায়, কি জ্ঞানবিচারে, কি বুদ্ধিমত্তায়—সর্ব্বগুণে—সর্ব্ব শক্তিতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এদেশীয়ের পক্ষে নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব্ব অতুলনীয়, একথা মুক্তকণ্ঠে নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

আশুতোষের নিরপেক্ষ বিচার, ন্যায় যুক্তি সঙ্গত নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কি অর্থী প্রত্যর্থী, কি উকিল ব্যারিষ্টার সকলেরই এমন একটা আস্থা ও বিশ্বাস ছিল যে আশুতোষের আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, তাহার বিচার যেন অমানুষিক কোন দৈবশক্তির দিব্যদৃষ্টি দ্বারা নিষ্কাষিত হইবে বলিয়া, সহজ স্বাভাবিক একটা ধারণা তাহাদের সকলেরই মনে জাগিয়া উঠিত।

এ সম্বন্ধে একটা কথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন—আমরাও শুনিয়াছি। ৺রাস বিহারী ঘোষের ন্যায় সুচতুর সুদক্ষ ব্যবহারজীবী বর্ত্তমানযুগে ভারতে বেশী নাই বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। একবার এদেশের একজন খুব বড় ধনী একটা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া স্বর্গীয় রাসবিহারীর শরণাপন্ন হন। তিনি সনির্ব্বন্ধে রাসবিহারীকে অনুরোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন—আপনি

একটু চেষ্টা করিলে আমি মোকদ্দমাটি পাইতে পারি। তাহার প্রচ্ছন্ন অর্থ এই যে কোন রূপ আইনের যুক্তি অথবা অন্য কোনরূপ অবস্থার বাহ্যিক যুক্তি খাটাইয়া বিশেষ যত্ন চেষ্টা করিলেই মামলায় জয়লাভ হইতে পারে। রাসবিহারী উত্তরে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—মোকদ্দমাটি আশুতোষের আদালতে পড়িয়াছে। অন্য ঘরে হইলে দেখা যাইত। আশুর কাছে কোনরূপ মৌখিক যুক্তি খাটিবে না।

আশুতোষের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শী বিরাট ব্যবহারজীবী রাসবিহারীর পর্য্যন্ত এইরূপ উচ্চ অভিমত ছিল। অপরের পক্ষে তো কোন কথাই নাই।

আশুতোষ কখন অর্থী প্রত্যর্থীর মুখ দেখিয়া বা উকিল বারিষ্টারে মুখ চাহিয়া বিচারব্যাপার সমাধান করিতেন না। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে যথার্থই ন্যায় সত্যের প্রতিনিধি হইয়া, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অবতার রূপে বিচার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। বিচারকালে তাঁহার প্রশান্ত পবিত্র সুগভীর মূর্ত্তি দেখিয়া স্বতঃই দর্শকের মনে হইত, ধর্ম্মাধিকরণকে এই মহাপুরুষয় যথার্থই ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। বাস্তবিকই বিচারকালে আশুতোষের অতি প্রশান্ত অতি গভীর চিন্তাশীল প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই তাঁহাকে মনে হইত। সুলেখক উকিল বলিয়াছেন—

এক সময় আমি আইন সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকার

সম্পাদকীয় দপ্তরে কাজ করিতাম। তখন আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্যর আশুতোষের অন্যূন দুইটি করিয়া রায় ছাপিতাম। অনেকে ইহা আমাদিগকে স্যর আশুতোষের প্রতি অন্যায়-পক্ষপাতের অভিযোগ করিতেন। কিন্তু আমরা জানি যে স্যর আশুতোষ যে বিপুল পরিমাণে ভাল ভাল নজিরের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহাতে সপ্তাহে দুইটি নজীর ছাপিয়াও আমি সবগুলি নিঃশেষ করিয়া উঠিতে পারিতাম না। ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে স্যর আশুতোষ তাঁর দীর্ঘ কালের জজীয়তীতে যে সব নজীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে যে ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ আইনজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তার খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলেও একটি মহাভারত লিখিতে হইবে। গত বিশ বৎসরের মধ্যে প্রিভিকাউন্সিল ও ভারতের সকল হাইকোর্টে যতগুলি নজীর প্রকাশিত হইয়াছে তার মধ্যে পরিমাণের দিক দিয়াই আর উৎকর্ষের দিক দিয়াই দেখ, স্যর আশুতোষের প্রণীত নজীর অন্য সকল নজীরের অন্ততঃ সমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর তার মধ্যে খুব বেশীর ভাগ আইনের নানা প্রশ্নের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপূর্ণ এক বিরাট প্রবন্ধ-বিশেষ। স্যর আশুতোষের রায়ের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি কখনও কেবলমাত্র অন্ধভাবে পুরাতন নজীর অনুসরণ করিয়া যাইতেন না। কোনও আইন ঘটিত সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি মৌলিক তথ্যগুলি অনুশীলন করিয়া

তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট তথ্য নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্ব মোকর্দ্দমায় এই রায় প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং বর্ত্তমান মকদ্দমায় সেই নিয়ম খাটিবে, এমন কথা সার আশুতোষ খুব সুপরিচিত তথ্য বিষয়ে ছাড়া কখনই করিতেননা। পুর্ব্বের সমস্ত নজীরগুলি হইতে তিনি বড় বড় (principle) বা তথ্য নির্ণয় করিয়া সেই তথ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদনুসারে মোকর্দ্দমার নিস্পত্তি করিতেন। নজীর অনুসারে বিচার করা বৃষ্টিন বিচার পদ্ধতির বিশেষত্ব্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার নজীরই আইনের প্রধানমুল। সেখানকার ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে এমন একসময় আসিয়াছিল যখন বিচারকেরা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্ব নজীরের অনুসরণ করিয়া মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন। পক্ষান্তরে ফ্রান্স জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে বিচারকেরা নজীর মানিতে বাধ্য নন, তাঁরা প্রত্যেক মোকর্দ্দমার সমাধা করেন আইনের মুলসূত্র গুলির বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বারা। নজীরের ভারে পীড়িত ইংলণ্ডীয় ব্যবহারশাস্ত্রে সেইজন্য কোনও দিনই মুলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ফ্রান্স বা জার্ম্মানীর মত বেশী পরিমাণে হয় নাই; গতানুগতিক হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু কিছু দিনহইল ইংলণ্ডে নজীরের চেয়ে আইন শাস্ত্রের আলোচনা বেশী আরম্ভ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচারকরাও নজীরের দাসত্ব কতক পরিমানে পরিত্যাগ করিয়া মুলতত্ত্বের অনুশীলনে অধিক মনোযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমেরিকা এ বিষয়ে ইংলণ্ডের চেয়ে অনেকটা বেশী অগ্রসর হইয়াছে। আমেরিকার বিচারকদের আধুনিক রায় গুলি দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁরা নজীরের ভিতর তত্ত্ব গুলির বিশ্লেষণ ও তাহাদের গুরত্ব নিরূপণ করিয়া প্রয়োগেই অধিক যত্নবান, নজীরের কথাগুলি মাছিমারা কেরানির মত নকল করিয়া যাইবার আগ্রহ তাঁদের তত নাই। আমাদের দেশে স্তর আশুতোষই সর্ব্ব প্রথমে আমেয়িকার নজীর আমদানী করেন। উকীল থাকিতেই তিনি আমেরিকার নজীর পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং বিচারক হইয়া তিনি আমেরিকার নজীরে তাঁর রায় বোঝাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমেরিকার নজীরের সঙ্গে সঙ্গে স্তর আশুতোষ বিশেষ ভাবে পাইয়াছিলেন আমেরিকার বর্ত্তমান যুগের বিচারকদের নজীরের প্রতি এই বিশিষ্ট ভাবটা। তিনি নজীরের কথার ভিতর দিয়া তার অন্তর্নিহিত তথ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেন এবং সেই তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া অনেক সময় নজীরের কথা গুলিকে পাশ কাটাইয়া যাইতেন। যেখানে স্তর আশুতোযের মনে হইয়াছে যে আইনের মৌলিক বিধি অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিৎ সেখানে কোনও দিনই তিনি বিরুদ্ধ নজীর আছে বলিয়া বিচলিত হন নাই। আমার একটি মোকর্দ্দমায় আমি যে কথা বলিতেছিলাম তার বিরুদ্ধে তিনটি নজীর ছিল, আমার সপক্ষে একটি নজীরও ছিলনা। আমি আমার বক্তৃতার আরম্ভের সময়েই সে কথা

বলিয়া লইয়াছিলান। মামলাটি ছিল অত্যন্ত ছোট, তাঁয়েদাদ, বোধ হয় পঞ্চাশ ষাট টাকার অধিক হইবেনা। অনেক বিচারক হয়তো এস্থলে আর বিচার না করিয়া নির্ব্বিবাদে পূর্ব্ব নজীর অনুসারে নিষ্পত্তি করিয়া হাঙ্গামের হাত হইতে উদ্ধার পাইতেন। কিন্তু আমি যখন বলিলাম যে নজীর আমার বিরুদ্ধ হইলেও যুক্তি আমার স্বপক্ষে এবং মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া তর্ক উপস্থিত করিলাম তখন স্যর আশুতোষ তৎক্ষণাৎ উৎকর্ণ হইয়া আমার যুক্তির আলোচনা শুনিলেন। আমি তখন সামান্য জুনিয়ার, অপরপক্ষে ছিলেন বিচক্ষণ বহুদর্শী একজন স্বনামখ্যাত উকীল। কিন্তু তথাপি স্যর আশুতোষ আমার যুক্তি মূলে পূর্ব্ব নজীর গুলি উপেক্ষা করিয়া আমার স্বপক্ষে রায় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। এই ঘটনাটি একাধিক বিষয়ে স্যর আশুতোষের বিচার পদ্ধতির নমুনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

তাঁর সর্ব্বদা আগ্রহ ছিল আইন ও নজীরকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার। সেজন্য তিনি (Principle) কে বরাবর নজীরের উপর স্থান দিতেন। আর একটা বিশেষত্ব তাঁর এই ছিল যে যুক্তির সারবত্তাই তাঁর কাছে বিবেচ্য ছিল, উকীলের খ্যাতি প্রতিপত্তির তারতম্যে যুক্তির ওজন তাঁর কাছে বাড়িত কমিত না। সেইজন্য স্যর আশুতোষের কাছে নূতন উকীলেরা চিরদিনই সাহস ও প্রতিপত্তির সহিত কাজ করিতে পারিয়াছে। স্যর আশুতোষ একদিনের জন্যও

বিস্মৃত হন নাই যে বৃটিশ পদ্ধতিতে বিচারককে শুধু বিচার করিতে হয় না, অবস্থা বিশেষে তাঁহাকে নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হয়। নজীরের ভিতর দিয়া তিনি অনেক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যে সব বিধি তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তার সব গুলিই যে অভ্রান্ত বা পরিপূর্ণ রূপে বিচার সহ এমন অন্যায় দাবী কেহ কোনও দিন করিবে না। কিন্তু এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে যে এই সব বিধি প্রণয়ন করিতে তিনি সর্ব্বথা সকল সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া বর্ত্তমান যুগের সমাজের আবেষ্টন ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁর এই উদার দৃষ্টির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। তাঁর তিনটি সুপরিচিত নজীরের দ্বারা তিনি ইহা স্থির করিয়া গিয়াছেন—যে আবশ্যকীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য পুরোহিত নিয়োগে প্রত্যেক হিন্দুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, আমি এ স্থানের বা এ গ্রামের পুরোহিত, সুতরাং আমর দ্বারা তোমাকে এখানকার পূজা কার্য্য করিতে হইবে, কোনও পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ বা পতিত ব্রাহ্মণের এ দাবী আইনসঙ্গত নয় বলিয়া তিনি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের কথার মারপেঁচ ধরিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে যে নিবন্ধ গ্রন্থেতে হয় তো ইহার বিপরীত ব্যবস্থা আছে—যদিও সে ব্যবস্থা খুব পরিষ্কার রূপে দেখা যায় না, কিন্তু নিবন্ধ গ্রন্থে যদিও এমন কথা থাকে তথাপি তাহা বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী নয় এবং

আজকালকার সমাজ সে বিধি অতিক্রম করিয়াছে, এই সত্য স্মরণ করিয়া স্যর আশুতোষ এ আইন বিধিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিচার কার্য্যে তিনি বহু স্থানে তাঁর নির্ভীকতা ও স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার অনেক দৃষ্টান্তই আছে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে সুপ্রসিদ্ধ ডুমরাওনরাজের ডিক্রীজারী মামলা। মহারাজা কেশওপ্রসাদ নিম্ন আদালতে ডিক্রী পাইলে সেই ডিক্রীর বিরুদ্ধে অপর পক্ষ হাইকোর্টে আপীল করেন এবং আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রীজারী রদ করিবার প্রার্থনা করেন। আদালতের চিরন্তন প্রথা অনুসারে ডিক্রীজারী রদ করিতে হইলে দরখাস্তকারীর জামিন দিতে হয়। এই মোকদ্দমায় অপর পক্ষের অন্য সম্পত্তি না থাকায় জামিনের কথাটা সঙ্গিন হইয়া উঠে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌এর অধীনে এই সম্পত্তি তখন ছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষ হইতে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের জামানতনামা দাখিল করিবার প্রস্তাব হয় যে আবশ্যক ডিক্রীর খরচার টাকা ভারত সরকারের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে। কেশও প্রসাদের পক্ষ বলেন যে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের এমন কোনও জামিন নামা দিবার অধিকার নাই এবং সেইজন্য এমন জামানতের কোনও মূল্যই নাই। সরকার অথবা কোর্ট অব ওয়ার্ডের পক্ষ হইতে ভারত-সচিবের পক্ষে এমন অসম্মানকর কথায় ভয়ানক আপত্তি করা হয়। কিন্তু স্যর আশুতোষ সম্পূর্ণ

নির্ভয়ের সহিত রায় দিলেন যে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের এমন জামানত নামা দিবার ক্ষমতা না থাকায় সে জামানত নামার কোনও মূল্য নাই এবং পরে সেক্রেটারী অব ষ্টেট এ দাবি অনায়াসে অস্বীকার করিতে পারেন এবং একাধিক স্থলে করিয়াছেন। এ ব্যাপার লইয়া গভর্ণমেণ্টের এতটা জিদ প্রকাশ পাইয়াছিল যে স্যর আশুতোষের পক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে প্রভুত পরিমাণে সাহসের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্যর আশুতোষ এমন একটা আধটা নয়, বহু মোকদ্দমায় এমনি স্বাধীনচিত্ত ও নির্ভয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

কর্তৃপক্ষ আশুতোষের অসাধারণ বিচার শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতি পদ প্রদান করেন। দুঃখের বিষয় আশুতোষ এদেশীয় বলিয়া ঐ পদে বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। আশুতোষ বিচারকের পদে সমাসীন হইয়া যেরূপ অভূতপূর্ব্ব বিচারশক্তি ও আইন অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সভ্য সমুন্নত জাতির পক্ষে অপূর্ব্ব আদর্শ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে—চিরদিনই রহিবে। তাঁহার প্রতি বিচার সিদ্ধান্তেই অদ্ভুত ব্যবহারিক দর্শনের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তি উপলব্ধ হইয়া থাকে।”

ষোড়শ অধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়।

এইবার যে বিষয়ের অবতারণা আলোচনা আরব্ধ হইতেছে তাহাই মহাপুরুষ আশুতোষের মহা জীবন ক্ষেত্রের অতি বিশাল পরম পবিত্র আয়তন। যে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিতে আশুতোষ আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন—যে বিদ্যাপীঠের যজ্ঞাকাণ্ডে হোতা হইয়া তিনি পূর্ণাহুতি প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সেই প্রাণের প্রিয়ভূমি, অন্তরাত্মার পবিত্র ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রেই আশুতোষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এই ক্ষেত্রেই আশুতোষের অপূর্ব্ব বিজয় নিশান—অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত।

আশুতোষ জীবনের সর্ব্ব সিদ্ধি শ্রেষ্ঠ সাফল্য নিদর্শন এই বিশ্ববিদ্যালয়। বিধাতা যেন এই বিদ্যাপীঠের সংস্করণ সম্প্রসারণ সমুন্নতির জন্যই আশুতোষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আশুতোষ উচ্চবিদ্যা অনুশীলনের সময় হইতেই জীবনের এই মহৎ চরম উদ্দেশ্য সাধন কল্পে আপনাকে উপযুক্তরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। আশুতোষ ছিলেন সাধক সম্রাজ্যের সম্রাট—সাধক কুলের শীর্ষস্থানীয়। তিনি যে সাধনার অনুষ্ঠান করিতেন

তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিতেন। সর্ব্বসিদ্ধি যেন তাঁহার করতলগত—ছিল।

বিধাতার একটা অপূর্ব্ব বিধান-কৌশল এই যে যাহা দ্বারা তিনি বিশেষ কার্য্য সমাধান করিবেন, তাহার সম্মুখে উপযুক্ত রূপে প্রয়োজনীয় উপাদান সংস্থাপন করেন—তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সেইরূপ সুযোগ-সুবিধা-সম্পন্ন করিয়া দিয়া থাকেন। যাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত কৃতী হইয়া উঠিতে পারে, তৎপক্ষে অনুকূল সুযোগের অবস্থা যেন বিধানকর্ত্তা নিজেই আপন হাতে তাহার সম্মুখে ধারণ করেন।

মহাকৃতী পুরুষ আশুতোষের পক্ষে সেইরূপ সুবর্ণ সুযোগ যেন আপনি উপস্থিত হইল। আশুতোষ যখন উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার পিতৃব্যদেব সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়-সমিতির বিশেষ সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন! উনি-ভারসিটির 'ফেলো' হইয়া রাধিকা বাবু, উহার কার্য্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য যথোপযুক্তরূপে সমাধান করেন। আশুতোষের পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পসার প্রতিপত্তি এতই প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে তিনি আর অন্য কার্য্যে নিজের মূল্যবান সময় দিবার অবসর পাইতেন না। বিশেষতঃ বিবেকবান্ ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ জানিতেন যে

ডাক্তারিব্যবসায় বড় দায়ীত্বের ব্যবসা। সে ব্যবসায়ে লোকের দেহ প্রাণ হাতে লইতে হয়—লোকের জীবনের জন্য দায়ী হইতে হয়, তাহার দায়ীত্ব অতি গুরুতর। সেই বিস্তৃত কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে সমাধান করিয়া–মহৎ পবিত্র কর্ত্তব্য সাধন করিয়া তাঁহার আর অন্য কার্য্যের জন্য অবকাশ থাকিতে পারে না। কাজেই ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ আর উনিভার-সিটির সভ্যপদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

রাধিকা বাবু উনিভাসিটির সভ্য পদ গ্রহণ করায়, উনিভার-সিটি সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় রিপোর্ট, মিনিট আদি কাগজ পত্র তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। আশুতোষ, ছাত্র অবস্থায় অতি মনোযোগের সহিত সে গুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রথমাবধি, তাঁহার পক্ষে উনিভারসিটির ব্যবস্থাবিধান প্রথা প্রণালী সুচারুরূপে বুঝিয়া লইবার বিশেষ সুবিধা হইল। আশুতোষ একমনে সে সকল তখন আয়ত্ত করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত আইন অধ্যাপক ব্যারিষ্টার মন্ট্রিও সাহেবের মৃত্যু হইল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁহার যেমন উৎসাহ অনুরাগ ছিল, তেমনি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল। কলিকাতা উনিভারসিটি সংক্রান্ত বহুদিনের আবশ্যকীয় মিনিট রিপোর্ট-আদি কাগজপত্র ও ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে

ঐ সকল কাগজপত্র ও ক্যালেণ্ডার আদি বইগুলি নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। আশুতোষ সেগুলি সবই ক্রয় করিয়া লইলেন। তিনি ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া একমনে পাঠ করিতে লাগিলেন।

আশুতোষ যে একসময়ে উনিভারসিটির প্রধান কর্ণধার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন,তাহা যেন তাঁহার ঐরূপ ভাবে ঐ সকল কাগজ পত্র ও ক্যালেণ্ডার পাঠের লক্ষণেই বেশ বুঝা যায়। নতুবা তেমন সকল নীরস কাগজ পত্র জ্ঞান বিজ্ঞানঅনুরাগী আশুতোষ অমন অনুরাগের সহিত পাঠ করিবেন কেন? উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদ লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন এ কথা তৎকালের ভাইসচান্সেলার ইলবার্ট সাহেব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি কনভোকেসন সভায় শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আশুতোষের গুণগ্রাহী ইলবার্ট স্বদেশ প্রত্যাগমনের পুর্ব্বে আশুতোষকে সাদরে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি?

আশুতোষ বিনীতকণ্ঠে কহিলেন—"আপনি ইচ্ছা করিলে আমার জন্য অনেক কাজই করিতে পারেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করুন যাহাতে আমি উনিভারসিটির সভ্য পদ লাভ করিতে পারি।"

আশুতোষ জানিতেন ইলবার্টের তখন ভারতে প্রভূত ক্ষমতা

ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে আশুতোষকে একটা খুব বড় চাকুরি দিতে পারিতেন।

স্বাধীনচেতা আশুতোষের প্রাণ কখনই চাকুরীর উমেদারী করে নাই। সে প্রাণ চিরদিনই যে দাসত্বের প্রতিবাদী—পরাধীনতার প্রতিকূল। আশুতোষ চাকুরি চাহিলেন না। উনিভারসিটির সভ্যপদ প্রার্থনা করিলেন।

ইলবার্ট আশুতোষকে আশাপ্রদ বাক্যে কহিলেন—"ভাল, চেষ্টা করিব।"

ইলবার্ট আশুতোষের উনিভারসিটির সভ্য পদের জন্য বিশেষ লিখিয়া বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার অনুপস্থিতি বশতঃ আশুতোষের পক্ষে বিশেষ সুফল সত্বর কিছু ফলিল না।

আশুতোষ নাছোড়বান্দা—একবার যাহা ধরিতেন, কর্ম্মবীর কর্ম্মযোগী তাহাতে সিদ্ধির শেষ সীমায় না পঁহুছাইয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। আশুতোষ নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সে সময়ে যাঁহারা তাঁহার প্রধান পৃষ্টপোষক সহায় ছিলেন তন্মধ্যে মনস্বীপ্রবর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, দেবকল্প পূত চরিত্র সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জষ্টিস ওকেনেলি ও অধ্যাপক বুথ সাহেব প্রধান। আশুতোষের কৃতজ্ঞহৃদয় চিরদিনই ইহাঁদের প্রতি প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

আশুতোষের বয়স অল্প বলিয়া, উনিভারসিটির বহু প্রাচীন সভ্য, তাঁহার বিপক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু অসাধারণ

শক্তির প্রচণ্ড বেগ দুর্দ্দমনীয়। কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে? আশুতোষের ছাত্রজীবনের অসাধারণ কৃতীত্ব অপূর্ব্ব প্রতিভা তখন বহু সভ্যের নিকট পরিচিত হইয়াছিল। আশুতোষ বি-এ, এম-এ পরীক্ষায় গণিতেব পরীক্ষক হইয়া কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও কাহারও নিকট অবিদিত রহিল না।

আশুতোষের বিপক্ষকুলের আপত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তি ও বিচার মন্দিরে স্থান পাইল না। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিজয়ী বীর আশুতোষ বিজয়মাল্য লাভ করিলেন। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদ লাভ করিলেন। এ পক্ষে ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার ও সার গুরুদাসের চেষ্টাই আশুতোষের পক্ষে বিশেষ ফলবর্ত্তী হইরাছিল।

আশুতোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদ লাভ করিলে, তাঁহার গণিতগুরু অধ্যাপক বুথ স্বয়ং সে সুসংবাদ লইয়া পরম আনন্দিত হৃদয়ে আশুতোষের সকাশে উপস্থিত হইলেন। আশুতোষকে সে সংবাদ শুনাইয়া তিনি উৎসাহ ভরে কহিলেন —"কেবল এই সভ্যপদ পাইলে চলিবে না। দুই মাস পরে সিণ্ডিকেটে মেম্বার নির্ব্বাচনের সময় হইবে। সেই সময় সিণ্ডিকেটের মেম্বর তোমাকে হইতে হইবে।" আশুতোষ অদম্য বীর। তিনি অবিচলিত চিত্তে সিণ্ডিকেটের মেম্বার হইবার জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক বুথের পরামর্শ অনুসারে আশুতোষ হিতৈষী সার গুরুদাস ও ডাক্তার মহেন্দ্র

লালের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে সন্দিহান হইয়াই হতাশভাবে কহিলেন—'এতো অল্প বয়সে অত বড় গুরুতর পদ লাভ কি সম্ভব।'

আশুতোষ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি তাঁহার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জষ্টিস ওকেলেনির সহিত এই সম্বন্ধে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। গুণগ্রাহী ওকেলেনি আশুতোষকে ভালরূপেই চিনিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আশুতোষকে আন্তরিক ভাবে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন—আমার যতদূর সাধ্য ততদূর তোমার জন্য চেষ্টা করিব। তাহাতে কোনরূপ অন্যমত হইবে না।

জষ্টিস ওকেনেলি মুক্তকণ্ঠে দৃঢ়দর্পে যে আশায় আশুতোষের নিরাশ আঁধারআচ্ছন্ন হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিলেন সে আশার আলোক দেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দিতে পারেন নাই। তখনও দেশে আভিজাত্যের ও বয়সের একটা প্রবল শক্তি প্রবীণ ও প্রাচীন প্রাণে যে জাগরিত ছিল, তাহা এইরূপ বহু দৃষ্টান্তেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

পুরুষোত্তম শৈশবে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। আশুতোষ তরুণ বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুতর সভ্যপদ-ভার স্বীয় দৃঢ় স্কন্ধে ধারণ করিলেন।

অধ্যাপক বুথের কথা তাঁহার প্রাণে গ্রথিত হইল। 'সিণ্ডিকেটে তোমায় প্রবেশ করিতেই হইবে।' আশুতোষের দক্ষ দৃঢ় প্রাণ গুরুবাক্য বরণ করিয়া লইল।

জষ্টিস ওকেনেলি নিজে আশুতোষের সিণ্ডিকেটের মেম্বার হইবার পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশা দিলেন। তিনি আরও আশ্বাস ও উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন যে 'ফ্যাকল্টি অব আর্টসের Faculty of Arts' সমিতিতে কয়জন মুসলমান সভ্য আছেন, সে সকল মুসলমান সভ্যগণের ভোট প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে একথা গুপ্ত রাখাই কর্ত্তব্য।'

আশুতোষ, জষ্টিশ ওকেনেলির কথায় আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তখন তিনি মুসলমান শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, আর সুপণ্ডিত কর্ণেল জ্যারেট ছিলেন তাহার সেক্রেটারি।

অতঃপর ফ্যাকল্টি অব আর্ট সমিতিতে পাঁচজন সিণ্ডিকেটের মেম্বর নিযুক্ত হইবার নোটিশ বাহির হইল। ওকেনেলি মহোদয় বিলাত গমন করিলেন। যাইবার সময় আশুতোষের জন্য তাঁহার বন্ধু কর্ণেল জ্যারেটকে বিশেষ অনুরোধের সহিত বলিয়া গেলেন।

এই সময়ে কর্ণেল জ্যারেটের পরিবারমধ্যে এক বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটিল। তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃতু ঘটিয়া জ্যারটের প্রাণ মুহ্যমান করিল। সেই নিদারুণ শোকের সময় কর্ণেল আশুতোষকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন কহিলেন।

সিণ্ডিকেটের মেম্বার নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসময়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভা আরম্ভ হইল। আশুতোষ আশঙ্কা করিয়া

ছিলেন—হয়তো কর্ণেল জ্যারেট তদবস্থায় তাঁহার জন্য বিশেষ কিছুই করিতে পারিবেন না।'

জ্যারেট মহাপ্রাণ সত্যপালক ছিলেন। সেই বিষম শোকের অবস্থায় তিনি যথাসময়ে উক্ত সভায় উপস্থিত হইলেন। আশুতোষের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন ও তাহাতে সফলকাম হইবার বিশেষ সম্ভাবনাও হইল।

কিন্তু আশুতোষের পক্ষে এক বাধা উপস্থিত হইল। সার আলফ্রেড ক্রফট পূর্ব্বাবধি আশুতোষের প্রতি বাম হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং আবার উক্ত সভার সভাপতি হইলেন। আশুতোষকে দেখিয়া ক্রফট মনে মনে নিশ্চয়ই বিরক্ত হইলেন। কিরূপে প্রবল প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে প্রথমে একেবারে নির্ব্বাচিত করিয়া দিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আশুতোষ দমিবার পাত্র নহেন। নির্ভীকতায় সাহসে তিনি ভীমপরাক্রম ভীম। সংসারের কোন বাধাবিঘ্ন আশুতোষকে দমাইতে পারিত না। কোন শক্তিমান শত্রু তাঁহার সম্মুখে গর্ব্বোন্নত শিরে তিষ্ঠিতে পারিত না।

কর্ণেল জ্যারেট পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় মুসলমান সভ্যগণকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভোটে আশুতোষেরই জয়ের আশা হইল। ক্রফট, মর্ম্মাহত ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে কর্ণেল জ্যারেটের প্রভাব প্রতিপত্তির পরাক্রমে মুসলমান সভ্যগণ ও অপর কয়জন আশুতোষের

হিতৈষী, আশুতোষকে নির্ব্বাচন করিবেন স্থির করিয়াছেন, তখন তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন! তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে রেজিষ্ট্রার টনি সাহেবের নাম উত্থাপন করিলেন। স্বর্গীয় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মনে করিয়াছিলেন আশুতোষের অতি অল্প বয়স। তখন তাঁহার বয়ক্রম মাত্র চব্বিশ বৎসর। এমন অল্প বয়স্ক তরুণ যুবকের উপর অত বড় গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ ভার চাপান কর্ত্তব্য নহে। এই মনে করিয়া তিনি সার আলফ্রেডের মত সমর্থন করিলেন। তিনি জানিতেন না যে সেই অল্প বয়সের আবরণের মধ্যে এক মহাশক্তি বিদ্যমান। কিছুতেই কিছু হইল না। বিপক্ষগণের সকল প্রতিকূল যত্ন চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্যপদে মনোনীত হইলেন।

আশুতোষের এই নির্ব্বাচন ব্যাপার সত্যই অতি অদ্ভুত। একে তাঁহার বয়স তখন অতি অল্প—কেবল ২৪ বৎসর মাত্র। তাহাতে সার আলফেডের ন্যায় প্রবল প্রতিপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত। স্বপক্ষের হিতৈষীগণও বিশেষ আশান্বিত নহেন। এমন অবস্থায় আশুতোষের জয়ের আশা কোথা? কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী যে আশুতোষের চিরসহচরী। আশুতোষ বিজিত পরাভূত হইবেন কেন?

এই ভাবে এই অবস্থায় এক প্রতিভার মহাশক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে প্রবিষ্ট হইল। সেই শক্তি যে অল্পকালের মধ্যে জীর্ণ পুরাতন গতানুগতিক উনিভারসিটিকে

একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন ছাচে নূতন প্রাণে, নূতন শক্তিতে এরূপ বিশ্বরিমোহন রূপে গড়িয়া তুলিবে কে তখন তাহা মনে করিয়াছিল ?

যাহা ভারতে অলীক স্বপ্নের ন্যায় নিতান্তই অসম্ভব ছিল, উনিভারসিটির নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, কর্ম্মবীর আশুতোষ সেই অসার অলীক স্বপ্নকে সত্যে পরিণতকরিয়া তুলিলেন।

আশুতোষ উনিভারসিটিব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহার প্রাণে নবশক্তি নব নব ভাব জাগরিত করিয়া বিশেষ উদ্যোগে তাহার সংস্কার সমুন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া স্বীয় সাধনার আসন সংস্থাপন করিলেন, যাহাতে নিজের ক্ষতি অপচয় যাহা হয় হউক, সমগ্র জাতির অভ্যুদয় উন্নতি সংঘটিত হয়, তাহাই হইল তখন আশুতোষের জীবনের মহামন্ত্র। বাস্তবিক সময় হিসাবে, নিজ উপার্জ্জনের উপায় হিসাবে, নিজ পাণ্ডিত্য কৃতীত্ব প্রদর্শনের সুযোগ হিসাবে আশুতোষকে বড়ই বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু জাতিগত—জাতীয়কল্যাণগতপ্রাণ—আশুতোষ, এক স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি মঙ্গলের কথা মনে করিয়া হিমাদ্রির ন্যায় অচল অটল রহিলেন। অপর কোন ক্ষতিই তাঁহাকে কখনই বিচলিত করিতে পারে নাই। ২৪ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—দীর্ঘ ৩৭ বৎসর কাল একাদিক্রমে তিনি তিল তিল করিয়া স্বদেশের বিদ্যাপীঠে আত্ম-

বলি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সে নীরব অজ্ঞাত ঋণ কি পতিত জাতি কখন পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে?

আশুতোষ, নিজ স্বভাবসুলভ মৌলিক গবেষণার চেষ্টা বলি দিয়া, স্বদেশের মনস্বী বৈজ্ঞানিকবর্গের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিত করিয়া গিয়াছেন। এই যে এখন বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক কৃতী ব্যক্তিগণ বিজ্ঞান জগতে অদ্ভুত সৃজন কৌশল দেখাইয়া সভ্য-সমাজ স্তম্ভিত করিতেছেন, তাহার মূলীভূত এক শ্রেষ্ঠ কারণ এই আশুতোষ।

বঙ্গীয় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণকে মৌলিক গবেষণার সুযোগ প্রদানের জন্য, আশুতোষ কতই আত্মত্যাগ, কতই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অবশ্য সকলে জানে না। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক মনস্বীগণের জন্য উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহে যে কতই ভোগ ভুগিতে হইয়াছে, তাহাও অবশ্য অনেকে জানে না। নাই জানুক—আশুতোষ নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া সে সকল কথা কাহাকে জানাইতেও চাহিতেন না—কিন্তু যে কয় জন জানে তাহারই আশুতোষের অসাধারণ কৃতীত্ব কার্য্যকুশলতায় আর সর্ব্বোপরি তাঁহার আত্ম-ত্যাগে বিস্মিত বিমুগ্ধ হইয়াছে।

বিদ্যানুশীলনই আশুতোষের স্বভাব ধর্ম্ম। মৌলিক গবেষণা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ সংস্কার। বিদ্যা ও গবেষণায় মৌলিক তত্ত্ব অনুশীলন ও আবিষ্কার করিয়া, শিক্ষা জগতে স্থায়ী কীর্ত্তি সম্মান অর্জ্জনের শক্তি আশুতোষের যেমন ছিল, তেমন শক্তি অতি

অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। কিন্তু আশুতোষ স্বেচ্ছায়, কেবল স্বদেশীয় বিজ্ঞান বিশারদগণের সুবিধা সমুন্নতির জন্য আর দেশের উন্নতি কল্যাণের জন্য, আপনার সকল স্বার্থ অনায়াসে পায়ে ঠেলিয়াছিলেন। হেন মহাজন মহাপুরুষের ঋণ কোন স্মৃতিতর্পণে পরিশোধিত হইতে পারে? সম্পূর্ণ নাই হউক, কথঞ্চিৎ পরিশোধের উপায় চিন্তা একটা গুরুতর জাতীয় কর্ত্তব্য নয় কি?

অজ্ঞ অকৃতজ্ঞ সমালোচকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যজ্ঞকুণ্ডে আশুতোষের আত্মাহুতির কথা জানিত না—জানিয়াও জানিতে চাহিত না। তাই নীচ বৈরীভাব অবলম্বন করিয়া—যখন তখন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিত। আশুতোষ তাহাদের কথার উত্তরে একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন:—Plans and schems to heighten the efficiency of the University have been the subject of my day-dreams. They have haunted me in the hours of nightly rest. To University cocerns, I have sacrificed all chances of study and research, possibly, to some extent the interest of family and friends and certainly. I regret to say good part of my health and vitality.

দধীচি দেবকার্য্য সাধন জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, আশুতোষ,

স্বদেশের বিদ্যা বিজ্ঞানের জন্ত তেমনি আত্মা-হুতি প্রদান করিয়াছিলেন। একথা যে অস্বীকার করে সে অধম নিতান্তই অকৃতজ্ঞ।

আশুতোষ বিদ্যাপীঠের কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীর সাধনা করিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় প্রবেশ করিয়াই তিনি তাঁহার সেই প্রাণের সাধন-তপস্যা আরম্ভ করিলেন; তাঁহার সেই সাধনার অপূর্ব্ব সিদ্ধি সাফল্যের কথা এদেশের শিক্ষার ইতিহাস চিরদিন মহাসম্মানে সমাদরে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে।

আশুতোষ সাধনায় সিদ্ধকাম হইলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া এক বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইল। 'গোলামখানা' বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটা ঘৃণিত উপেক্ষিত বিষয় হইয়া উঠিল। উনিভারসিটি ভবন "To Let" বলিয়া বিদ্রুপের বিজ্ঞাপন বক্ষে ধারণ করিয়াছিল।

দলে দলে বহু ছাত্র উহার সম্বন্ধ সংস্রব পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বড় লজ্জা ও সঙ্কটের ব্যাপার বিঘটিত হইল।

ভারতের কর্ত্তা লর্ড মিণ্টো এ অবস্থায় কি করিবেন—কিসে উনিভারসিটিকে রক্ষা করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন অবস্থায় কে এমন কর্ম্মবীর আছে যে উনিভারসিটি তরণী বানচালি অবস্থায় রক্ষা করিতে পারে?

লর্ডমিণ্টোর তীক্ষ্ণদৃষ্টি মহাকৃতী পুরুষ আশুতোষের

প্রতি নিপতিত হইল। আশুতোষকে তিনি সাগ্রহে বরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আশুতোষের অসাধারণ প্রতিভা অদ্ভুত শক্তি, সেই সঙ্কট হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্ধার করিল। দিনে মহাত্মা ও দেশবন্ধুর যুগপৎ আন্দোলনে উনিভারসিটির কি শোচনীয় অবস্থাই হইয়াছিল। আশুতোষ ভিন্ন কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত?

আশুতোষের দূরদৃষ্টি ভবিষ্যৎ জ্ঞান বুঝিল দেশে এখনও সে সময় হয় নাই। প্রতীচ্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা ত্যাগের সময় এখনও আমাদের পক্ষে আসে নাই। আশুতোষ প্রাণে জানিয়াছিলেন সে সময় যদি কখনও দেশে আইসে, তবে তাহাকে তিনিই ঘাড়ে ধরিয়া উপযুক্ত সুযোগে আনিবেন, আর সে শক্তি সিদ্ধির জন্য এখনও শিক্ষাক্ষেত্রের সাধনা প্রয়োজন। আশুতোষ এই সকল অতি সূক্ষ্ম কথা সূক্ষ্ম বিচারে বুঝিয়া লইয়া দৃঢ় করে বিশ্ববিদ্যালয় তরণীর হাল ধারণ করিলেন। বীর সাধক আশুতোষ বীরাসনে বসিয়া যে কি অসাধ্য সাধন করিলেন যাহা দেখিয়া সমগ্র ভারত বিস্মিত স্তম্ভিত হইল, তাহা সামান্য লেখনীতে লিখিয়া আর কি বলিব—কি বুঝাইব? এ দেশীয় শিক্ষার ইতিহাসে রহিবে সে অদ্ভুত—অপূর্ব্ব কাহিনী!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের কৃতীত্ব কাহিনী সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ পৃথক গ্রন্থ লিখিতে হয়। সে সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কথা বলিব না। কেবল

বিখ্যাত সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর যে করুণ কাহিনীতে সে কথা কহিয়াছেন আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব। সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতেই আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অদ্ভুত কৃতীত্ব কি অপূর্ব্ব ভাবেই ফুটিয়া পড়িয়াছে।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাশালা ছিল তাঁহার মানসী কন্যা। তাঁহার প্রাণের শোণিতে এই বিদ্যাশালা পুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব বিজয়শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বঙ্গীয়ভারতী আর কাহার বাহু আশ্রয় করিয়া বঙ্গদেশে দাঁড়াইবেন? বঙ্গের সরস্বতী পূজা প্রকৃত পক্ষে এখন হইতে উঠিয়া গেল।"

বিশ্ববিদ্যালয়টি তিনি ভারতবর্ষের এক মাত্র বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে এখানে বিদ্যার যে সমারোহপূর্ণ উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বজাতির ডাক পড়িয়াছিল। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় হইবে প্রাচ্য বিদ্যার মহাকেন্দ্র, এই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। নানারূপ অভাব অভিযোগ দ্বেষ হিংসা ও অন্তরঙ্গকে অগ্রাহ্য করিয়া, তর্জ্জনী হেলনে নিরস্ত করিয়া আমাদের এই বিদ্যাপীঠ তাঁহার আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার ও প্রাচ্য ভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। রুশিয়ার স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি কেন ভিলোগ্রফ এই নিমন্ত্রণে এখানে আসিয়াছিলেন। ফরাসীর প্রাচ্য বিদ্যার

শিরোমণি সিলভ্যানলিভি, জর্ম্মানীর উইটার নীড ও গুণ্ডেনবর্গ বিলাতের প্রাচ্য বিদ্যার কল্পতরু টমাস প্রভৃতি কত দেশেরই পণ্ডিতগণ আশুতোষের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁহাদের পদরজ দিয়াছিলেন এদিকে অধ্যাপকগণের জাপানী চৈনিক দ্রাবিড়ী সিংহলী মারহাট্টা, টিবেটান প্রভৃতি নানাদিক দেশাগত পণ্ডিতেরা তো আমাদের বিদ্যাপীঠ অবিরত কলরবে মুখরিত করিতেছেন। কনভোকেসনের সময় সে কি দৃশ্য! কাহারও উষ্ণীষে রামধনুর বর্ণ খেলিতেছে, কাহারও টুপি মন্দিরের চুড়ের মত উঁচু হইয়া আছে, একদিকে পার্ব্বত্য রোমাবৃত্ত শিরোভূষণের পার্শ্বদেশ চুম্বন করিয়া শিরাজ মৌলভির প্রকাণ্ড পাগড়ির স্বর্ণখচিত রেখাগুলি দেখা যাইতেছে। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি সর্ব্বজাতির মিলনস্থান জগন্নাথ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। দারভাঙ্গা গৃহে যেদিন তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি উন্মোচিত হয়, তখন বাঙ্গলার লাট কারমাইকেল সাহেব বলিয়াছিলেন, "কোন একটা জিনিসকে বিরাট কল্পনায় আয়ত্ত করিবার শক্তি আশুতোষের আছে, কিন্তু সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি অনেকের নাই, আশুতোষের তাহাও আছে।" একাধারে কবি ও সাধকের ন্যায় বিরাট কল্পনা, অপর দিকে বিশাল কার্য্যকুশল বাহু-শক্তি, এই দুইগুণের অপূর্ব্ব মিলনে আশুতোষ বরেণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কেহ জগতে আছেন কিনা তাহা আমরা জানি না।

শত শত ভূর্জ্জপত্র ও প্রাচীন কাগজের লিখিত পুঁথি তিনি সমস্ত এসিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিলেন। অসংখ্য তীব্বতীয় পুঁথি, জাপানি পুঁথি, ১১০০ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি, দারভাঙ্গাগৃহের কোথায় কোণায় পড়িয়া রহিয়াছে—তাহাদের জন্ম আলমারী তৈরী হইতেছে। ইহা ছাড়া কত যে বিরল বহুমূল্য পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, ঈজিপ্টের প্রাচীন মূর্ত্তির ছবি, কত দেশের মানচিত্রের অতি দুর্ল্লভ সংস্কৃত পুঁথি যে আনাইয়াছিলেন তাহা অবধি নাই! প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার্থীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে হইবে, এখানে না আসিলে তাহার শিক্ষা পূর্ণ হইবে না, এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়িয়া তোলা ছিল—তাঁহার সংকল্প। কেবল অধ্যাপক নহে, তাঁহাব উদার সার্ব্বভৌমিক আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া কত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে কলিকাতায় ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তিনি ইহার মধ্যেই প্রাদেশিক ভাষার অনুশীলনের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। কেহ যদি ভারতীয় কোন প্রাদেশিক ভাষার তুলনামূলক চর্চ্চা করিতে চান, তবে এই স্থানে নানাদেশীয় অধ্যাপক ও ছাত্র মণ্ডলীর সহিত আলোচনা করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন, পৃথিবীর অন্য কোথাও তিনি সে সুবিধা পাইবেন কিনা সন্দেহ।

সুবিখ্যাত অধ্যাপক সুনীতি কুমার করুণকণ্ঠে বলিয়াছেন—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হ'য়ে

দাঁড়িয়েছে, এখানে আজ কাল যে এত বেশী বিষয় আলোচনার সুযোগ হয়েছে, এ কেবল তাঁরই সাধনায়, আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে জগৎকে নানা বিষয়ে কিছু না কিছু নূতন কথা শোনাতে পেরেছে এত তাঁরই শুভেচ্ছায়—তাঁরই প্রেরণায়।

আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে কত মূল্যবান গৌরবের কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা এরূপ সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ স্থানে বর্ণনা করা যায় না। এক কথায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বিশালতা দেখিলে বুঝা যায় আশুতোষ কত বিরাট মহাপুরুষ ছিলেন। উনিভারসিটিতে কত ভাবের কত ফ্যাকল্টি, কত বিভাগের কত বোর্ড তাঁহারই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান। দার্শনিক বিভাগ, ঐতিহাসিক বিভাগ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগ —কত ভাবের কত বিভাগ।

সকল বিভাগের অধিনেতা পরিচালক ছিলেন এক আশুতোষ। এসকল বিভাগ লইয়া দিনের মধ্যে কত সভা সমিতির অনুষ্ঠান হইত। সকলেরই তত্ত্বাবধায়ক একা আশুতোষ। সে সকল বহু বিভাগের বহু প্রকারের বিশেষ ভাবিবার বুঝিবার কার্য্য, সকল গুলির সুন্দর রূপে সাধন সমাধানের কর্ত্তা ছিলেন একা আশুতোষ। কি অদ্ভুত অপূর্ব্ব শক্তি! কি অসাধারণ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা! এক শুনিয়াছি য়ুরোপে ছিলেন নেপোলিয়ন—এক সময়ে বহু গুরুতর কর্ম্ম সাধন করিতে—আর দেখিলাম এই অধোপতিত দেশে এক আশুতোষকে একই কালে বহু কার্য্যের গুরুভার ধারণ করিতে। বাঙ্গালীর পক্ষে কি সামান্য সাধারণ

গৌরবের কথা? আশুতোষকে পাইয়া যথার্থই বাঙ্গালা দেশ ধন্য হইয়াছে—বাঙ্গালী জাতি কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। এই পতিত দেশ অভিশপ্ত জাতি যদি এই মহাপুরুষের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে পারে, যদি সেই বিরাট-পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে, তবেই সে ধন্য কৃতকৃতার্থ তবেই—ক্রমেই তাহার মুক্তির রুদ্ধপথ উন্মুক্ত হইবে।

আশুতোষ, লর্ড কর্জ্জনের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিধানের সমর্থন করিয়াই নাকি হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন; এইরূপই দেশের অনেকে মনে করিয়াছিল। লর্ড কার্জ্জনও কথার ভাবে ভঙ্গিতে সেই ধারণারই পোষকতা করিয়াছিলেন। তাই অনেকে মনে করিত—আশুতোষ রাজশক্তির পক্ষপাতী—দেশের হিতৈষী নহেন। আশুতোষ নিজের দেশকে—জাতীয় শিক্ষাকে—জাতীয় ভাষাকে উন্নতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অকৃতজ্ঞ দেশবাসীর সেইরূপ অনেক কথাই নীরবে সহিয়াছেন। কিন্তু দেশের লোক এখন জানিয়াছে, আশুতোষ নিজের স্বার্থের জন্য নয়, দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আপনার অন্তরের ভাব অপূর্ব্ব তেজস্বিতা অসাধারণ স্বাধীনতারবহ্নি প্রাণের নিভৃত কোণে চাপিয়া রাখিয়া, কি কার্য্যই সফল করিয়াছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের যে স্বাধীনতার কল্পতরু সমূলে ছেদন করিবার জন্য—যে উচ্চ শিক্ষার দ্বার চিররুদ্ধ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিধান ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই বিধানেরই অদ্ভুত

প্রয়োগ-কৌশল দ্বারা আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বৃক্ষকে সজীব রাখিয়া উচ্চ শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য কি অদ্ভুত ক্রিয়া-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন! সেই জন্যই তিনি যে কোন কলঙ্কের পশরা মাথায় বহিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আজ আর সেজন্য কাহাকেও অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। আশুতোষের অকাল ও হঠাৎ মৃত্যুতে দেশ-ব্যাপী যে প্রবল শোকের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহাতেই দেশের যে অকৃতজ্ঞতার পাপ তাপ নিশ্চয়ই বিধৌত হইয়াছে।

পুরুষসিংহ আশুতোষ কখনই তোষামোদী স্বার্থপর ছিলেন না। তাহা হইলে তিনি বোধ হয় চিরদিনই ভাইসচান্সালারে পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কখনই তোষামোদ জানিতেন না—তোষামোদের ধাতুতে তিনি গঠিত হন নাই। স্বাধীনতার অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, নির্ভীকতার অসাধারণ সাহস আশুতোষকে আর অধিক কাল ভাইস-চান্সালারের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে নাই।

সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিক টাকার বৃত্তি প্রদান করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যে পক্ষপাতিতা করিয়াছিলেন আশুতোষের পক্ষে তাহা বড় অসহ্য হয়। তাহাতে যে ভাষায় তিনি সে ব্যবস্থার তীব্র প্রতিপাদ করেন, তাহা এখনও অনেকের মনে আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিন হাজার ছাত্রের শিক্ষা ভার লইয়া গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইল মোট এক লক্ষ টাকার কিছু অধিক, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক হাজার ছাত্রের শিক্ষাভার লইয়া পাইল ৯ লক্ষ টাকা। একি অবিচার—কি পক্ষপাতিতা! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ স্বরূপ আশুতোষ তাহা কিরূপে সহিবেন?

আশুতোষ বড়ই ক্ষোভে ভাইসচান্সালারের পদত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই প্রাণের আবেগে বঙ্গের বিধাতা লর্ড লিটনকে তিনি লিখিয়াছিলেন,—I have I maintain scrupulously adhered to the cherished tradition of my office and it has never entered into my mind during the last two years that I was seriously expected to adapt myself to the wishes of your Government. * * * I send you without hesitation the only answer which an honourable mau can send—an answer which you and your advisers expect and desire. I decline the insulting offer you have made to me.

আশুতোষ ভাইসচান্সালারের পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু প্রাণের বড় প্রিয় সামগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়িতে পারিলেন না। উনিভারসিটি ছিল আশুতোষের প্রাণ, আশুতোষ ছিলেন উনিভারসিটির প্রাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে থাকিয়াই তিনি তাহার হৃদপিণ্ডকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

আশুতোষের নিকট কলিকাতা উনিভারসিটি যেমন মহা ঋণে ঋণী, তেমনি বর্ত্তমান বঙ্গদেশঋণী—তেমনি বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ঋণী। এ মহাঋণ—পবিত্রঋণকে পরিশোধ করিবে কে? এ ঋণ পরিশোধ করিবার নহে—কেবল স্মরণ করিয়া—স্মৃতিতর্পণের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পতিত জাতি ধন্য কৃতকৃতার্থ হউক।

———

সপ্তদশ অধ্যায়।

বাঙ্গলা সাহিত্য।

আশুতোষ যে বাঙ্গালীর কি অভীষ্ট দেব ছিলেন, বাঙ্গালীর মৃত জীবনের জন্য কি সঞ্জীবনী-মন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর সাহিত্যিক সম্প্রদায় যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবেন এমন বোধ হয় আর কেহ নয়। আশুতোষের কথা স্মরণ করিতে কোন সাহিত্যিকের প্রাণ না মর্ম্ম ব্যথায় আকুল উচ্ছাসিত হইয়া উঠে? যে সাহিত্যিক—শুধু সাহিত্যিকই বা বলি কেন—মাতৃভাষার প্রতি যাহারই প্রাণে একটুও অনুরাগ আছে, তাহারই হৃদয় আশুতোষের পূত স্মৃতি-তর্পণে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। হৃদয়ভেদী সে প্রাণের আবেগ কে রোধ করিতে পারে?

আশুতোষ আজন্ম বঙ্গ সাহিত্যের—মাতৃভাষার অনুরক্ত উপাসক ছিলেন। বুঝি একমাত্র মহাপ্রাণ আশুতোষই বুঝিয়াছিলেন—মাতৃভাষায় যে দীন—যে হীন তাহার আবার গৌরব কোথা—গর্ব্ব কিসের?

আশুতোষের দুইটী খুব বড়—খুব পবিত্র সাধনক্ষেত্র ছিল—এক বাঙ্গলার বিদ্যাপীঠ, অপর ছিল পতিত বাঙ্গালী জাতির পতিতা মাতৃভাষা—উপেক্ষিতা দীনা মলিনা মাতৃভাষা। আশুতোষ

জানিতেন মৃতকল্প মাতৃভাষাকে সঞ্জীব করিয়া তাহারই শুন্যসুধা দানে জাতীকে সঞ্জীব করিতে হইবে। এই পতিত জাতির উদ্ধারের সেই এক মহামন্ত্র।

ধন্য আশুতোষ—ধন্য তাঁহার জীবম—ধন্য তাঁহার সাধনা আরও বলি ধন্য সেই শিক্ষক যিনি প্রথমে মাতৃভাষার পূত বীজ আশুতোষের শিশুহৃদয়ে বপন করিয়াছিলেন যাহা কালে পরিপুষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বাঙ্গলা সাহিত্যের বিরাট-বিশাল কল্পতরু সৃজন করিয়াছেন।

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভামণ্ডলীতে প্রথম প্রবেশ করিয়াই ধরিলেন—সেই মহামন্ত্র—মাতৃভাষার উদ্ধারসাধন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ বাঙ্গালীর পক্ষে এক শুভদিন। ঐ দিনে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক খানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি প্রস্তাব করিলেন যে এণ্ট্রান্স হইতে এম এ পর্য্যন্ত সব পরীক্ষাতেই বঙ্গভাষার একটি বিশেষ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হউক। আর বাঙ্গলাভাষায় রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হউক।

এই প্রস্তাব সিদ্ধান্ত করিবার জন্য চারি মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আশুতোষ স্বয়ং তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার সমর্থন করিলেন।

তৎকালের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অনেকে কেবল আশুতোতোষের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুঃখের কথা বলিব কি? বহু দেশবাসী কৃতবিদ্য বাঙ্গালীও তথায় ছিলেন। দেশের ভাষা—ঘৃণিত উপেক্ষিত মাতৃভাষা—পতিত বাঙ্গালী জাতির পতিত বাঙ্গালা ভাষা—বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইবে, ইহা তাঁহাদের স্বদেশভক্ত স্বজাতিভক্ত প্রাণে সহ্য হইবে কিরূপে? তাঁহারা প্রস্তাব শুনিয়া অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রবল ভাবে প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন।

প্রচণ্ড আন্দোলন আলোচনার কলরবে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল। স্বয়ং সভাপতি ক্রফ্‌ট সাহেব তো আশুতোষের চিরবিরোধী। তিনি বঙ্গভাষা প্রচলের প্রস্তাবে বিরোধী না হইবেন কেন? তিনি নিজ পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষীয় সকলেই একবাক্যে উপহাস করিয়া আশুতোষের শুভ প্রস্তাবটি মূলেই নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন—নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলেন। তাঁহারা ব্যগ্র ভাবে বলিতে লাগিলেন—'বাঙ্গলা ভাষা কি আর ভাষার মধ্যে গণ্য। বাঙ্গালা ভাষায় কি এমন পুস্তক আছে বা হইতে পারে যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার যোগ্য! এ কি আবার একটা সমীচীন প্রস্তাব? আর বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষাই বা কি হইবে?"

মুসলমান সভ্যগণ বলিয়া উঠিলেন—"আমাদের সন্তানগণ

ভালরূপ বাঙ্গলা বা উর্দ্দু অথবা পার্শি কিছুই জানে না। বাঙ্গালা চলিলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ট হইবে।

সংস্কৃতের পণ্ডিতগণ দেশের পরম কল্যাণকর ঐ প্রস্তাবে বাধা দিয়া কহিলেন—বাঙ্গালা ভাষা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত হয়, তাহাতেই পরীক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয, তবে সংস্কৃতের সম্মান আদর আর দেশে থাকিবে না।

এই বিপক্ষ দলের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং সার আলফ্রেড, নবাব আবদুল লতিফ, স্যার আশুতোষের পরম সুহৃদ কর্ণেল জ্যারেট, নবাব সিরাজুল ইসলাম। আরও ছিলেন কে কে বাঙ্গালী-সমাজের সে সকল মহাপুরুষদের নাম জানেন কি? বলিতে বাক্য রুদ্ধ হয় সেই বিপক্ষদলে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, যিনি মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্চ্চা করেন, আরও ছিলেন রজনীনাথ রায় মহাশয়, আর রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আশুতোষ বিপক্ষদলের কথা নীরবে শুনিলেন। ইহাঁদের আপত্তির কথা শেষ হইলে সুপ্ত সিংহ জাগিয়া ভৈরব গর্জ্জনে সমুত্থিত হইলেন। প্রবল আগ্নেয় গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুদগম আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টা কাল আশুতোষ বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন—স্বজাতীয় ভাষা—বাঙ্গালাভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে না

চলিলে জাতীয় ভাষার উন্নতির আশা নাই। যে জাতির ভাষার উন্নতি নাই—সে জাতির অভ্যুদয়ের আশাই বা কোথা? বাঙ্গলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে না চলিলে তাহাতে ভাল গ্রন্থই বা জন্মিবে কেন? এইরূপ অনেক যুক্তিযুক্ত কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি বুঝাইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। আশুতোষের প্রস্তাবটি পরাজিত হইল। আশুতোষের প্রাণের প্রচণ্ড বহ্নি কিন্তু নিভিল না—ধিকি ধিকি কোটরগত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

আশুতোষের পক্ষেও ছিলেন কয়জন বঙ্গের মহামনস্বী—বাঙ্গলা সাহিত্যের নেতাগণ। বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্রাট স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্র, অন্যতম সাহিত্যনেতা সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু, দেশগত প্রাণ আনন্দমোহন বসু, বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—আর ছিলেন সেই প্রবীণ ভারতবন্ধু স্কচপাদরী রেভারেন্ড ডাক্তার ম্যাকডোনাল্ড।

আশুতোষের সেদিনের বক্তৃতা বঙ্গভাষার স্মৃতিমন্দিরে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ চিরবিদ্যমান রহিবে। স্বপক্ষ বিপক্ষ সভাস্থ সকলেই তাঁহার সেই বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থিরকর্ণে শুনিয়াছিলেন। কর্ণেল জ্যারেট শতমুখে সেই বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াও তাহার প্রতিকূলে নিজ অভিমত প্রদান করিলেন।

আশুতোষ সেবারে অগত্যা নিরস্ত হইলেন। সিংহ যেরূপ শিকারের জন্য সুবিধার সুযোগ ও সময় অপেক্ষা করে, আশুতোষ সেইরূপ সময় সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিধাতার রাজ্যে শুভ কখনই চিরদিন উপেক্ষিত রহিতে পারে না—কোন ক্ষেত্রেই না। অশেষ শুভকর সাহিত্যক্ষেত্রেই বা থাকিবে কেন ?

কিছুকাল পরেই সময়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। বহু সভ্যের মতি গতি জাতীয় ভাষা সম্বন্ধে ফিরিল। শক্তিশালী মহাপুরুষ আশুতোষরই তেজবীর্য্যের প্রভাবেই ফিরিয়া গেল। আশুতোষ ঠিক সময় ও সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় অভীষ্ট, যাহা তিনি চিরদিন এক সাধনীয় মন্ত্ররূপে জপ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাই সম্যকরূপে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। চির-উপেক্ষিতা দীনা বঙ্গভাষা উজ্জ্বলমূর্ত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাপীঠে প্রতিষ্ঠিত হইল—এণ্ট্রান্স হইতে এম এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় স্থান লাভ করিল।

আশুতোষের এ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে জাতীয় প্রাণে ক্ষোদিত রহিবে।

আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষাকে অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া কিরূপে তাহার উপাসনা করিতেন—তাহার উন্নতির জন্য কিরূপ আগ্রহে যত্ন চেষ্টা করিতেন—তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন তাঁহার এইরূপ কার্য্যে, তেমনি তাঁহার কথায়।

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি রূপে দুইবার নির্ব্বাচিত হইলাছিলেন। দুইবার যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব অমূল্য সম্পদ। আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষায় কোন পুস্তক লিখেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই বক্তৃতা

দুইটি বঙ্গভাষায় লিখিত বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সহিত ওজনে নিশ্চয়ই সমধিক ভারাক্রান্ত হইবে।

সেই বক্তৃতা দুইটি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম। এই দুই উদ্ধৃত স্থান হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—স্বীয় জাতীয় ভাষা মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি অদূর ভবিষ্যতে জাতীয়ভাষা সম্বন্ধে কি অপূর্ব্ব কি মহান দৃশ্যই দর্শন করিয়াছিলেন।

১৩২৬ সালে হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে আশুতোষ বলিয়াছিলেন—"আমি বলিতেছি শিক্ষার কথা, দীক্ষার কথা, ভাগবত একতার কথা। স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া যাহার যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিয়া কি করিয়া ভারতে এক ভাব, এক চিন্তা এক সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কি করিয়া সমগ্র ভারতে এক জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে তাহাই আমার বক্তব্য। বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, নিষ্পাপ, নির্ম্মল, মনোহর তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে ইহাই আমার বক্তব্য। তাই বলিতেছিলাম আমাদিগকে নিপুণভাবে দেখিতে হইবে যে কি উপায়ে এই ভাগবত, জাতীয় সাহিত্যগত একতার সমাধান করিতে পারি। যদি এই মহৎ কার্য্যের এই দুঃসাধ্য কার্য্যের সুসম্পন্নের কোন উপায় থাকে তবে তাহা আমাদের

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, যাহাতে বিদ্যার্থীরা প্রথমে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কৃতিত্ব লাভের পর, ভারতীয় কতিপয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে, বাঙ্গালী বি-এ, এম-এ, উপাধিমণ্ডিত যুবক দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে আরও দুইএকটা ভারতীয় ভাষা, হিন্দি বা মারহাট্টি উর্দ্দু বা তৈলঙ্গি ভাষা শিক্ষা করিবে, তাহা হইতে ক্রমে শিক্ষা সমাপ্তির পর ঐ ঐ যুবক, পরীকীয় ভাষায় অর্থাৎ এই হিন্দি বা মারহাট্টি ভাষার সম্পদ-সৌষ্টব ক্রমে বঙ্গ ভাষায় বিবর্ত্তিত ও ভাষার সম্পদ বর্দ্ধিত করিতে পারিবে। যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় হিন্দুস্থান আপনার ভাবে আজও নৃত্য করে, সেই উন্মাদনা বঙ্গভাষার শিরায় শিরায় বহাইতে পারিবে···শুধু এক প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রীতি প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না। ক্রমে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাবে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে দেশীয় ভাষায় এম-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে···যদি এই ভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশীয় ভাষায় এম-এ, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় তবে প্রতিবর্ষে আমরা এমন দুইচারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব—যাহারা তাহাদের স্ব স্ব মাতৃ-ভাষা ছাড়া ভারতের অপর দুই চারিটি ভাষাতেও সুপণ্ডিত হইবে। এইরূপে কিছুকাল পরে বিশ, পঁচিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পরে, আজ যেমন

ইংরাজীতে বি-এ, এম-এ অনেক লোক পাইতেছি, সেইপ্রকার স্বীয় মাতৃভাষা ত আছেই, তাহা ছাড়া, দেশীয় অপরাপর ভাষাতেও সুপণ্ডিত লোকের অভাব থাকিবে না। ফলে দাঁড়াইবে এই ভারতের ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা, দীক্ষা, মতিগতি সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাগবত একতার সাড়া পড়িবে—পরস্পরের আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে। অদূর ভবিষ্যতে, যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু দেশীয় ভাষা জানে, তাহারাও ভিন্ন দেশের মনোহর ভাব সম্পদ উপভোগ করিতে পারিবে। জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্য বন্ধনের সূত্রপাত হইবে।......ক্রমে সমগ্র ভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে। যদি একবার সেই ভারত-প্লাবিনী বন্যার আবির্ভাব হয় তবে তখন সকল অবসাদ সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে পরস্পরের সুখ দুঃখের অংশীদারের অভাব থাকিবে না। একের কান্না অপরে কাঁদিবে, একের অভ্যুদয়ে অপরে আনন্দিত হইবে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাঙ্গলাভাষার উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টান্বিত। তজ্জন্য তাহার প্রতি আশুতোষের বিশেষ অনুরাগ ছিল। পাটনার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দশম অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাহাতে তাঁহার সে অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—অদ্য

আমার প্রধানত বক্তব্য এই যে শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বৎবৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে তাহারও চিন্তা করিতে হইবে।.........তবেই তো বঙ্গভাষা অমরত্বলাভ করিবে। যদি এমনভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষীগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্থ ও শিক্ষনীয় বিষয় আরম্ভ করিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় এবং আবিষ্কার উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষনীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয় সমূহ এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদবৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন।...যে ভাষার যত সম্পদ, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তাপ্রসুত বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক......যদি বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বীগণ তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তরকালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গলার সারস্বত রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব সন্ধানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান, এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে একদিন

আসিবেই যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহ-পূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।”

বঙ্গভাষাকে কিরূপে সমুন্নত সুন্দর ভরণে বিভূষিত করিয়া জগতের সকল সভ্য শিক্ষিত জাতির সাহিত্যের সহিত সমকক্ষ—এমন কি তাহাদের চাইতেও গৌরবান্বিত হইতে পারে, তাহাই ছিল তাঁহার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি যে কতই সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছেন—কঠোর কর্ম্ম-যোগীর ন্যায় কত কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার বাহুল্য বিবরণ অনাবশ্যক। বাঙ্গলার জাতীয়সাহিত্য তাহা হৃদয়ের পবিত্র স্মৃতিমন্দিরে চিরদিন পোষণ করিয়া রাখিবে।

আশুতোষ, তোষামোদ কাহাকে বলে—তোষামোদ বলিয়া একটা ঘৃণিত ভাব মানব হৃদয়ে থাকিতে পারে, ইহাও যেন তিনি জানিতেন না। তিনি কখন বড় বড় রাজা রাজাড়া আমীর ওমরাওর সহিত মিলামিশা করিতেন না। কিন্তু বর্দ্ধমান অধিপতি মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতব বাহাদুরকে তিনি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক পরম সাহিত্যিক বলিয়া অকৃত্রিক অনুরাগ শ্রদ্ধা করিতেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেন—যিনি এত বড় লোক হইয়া, মাতৃভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহার মত স্বদেশ-হিতৈষী স্বজাতিবৎসল আর কে হইতে পারে?

বাস্তবিক মহারাজাধিরাজ সম্পদ ঐশ্বর্য্যের শীর্ষ দেশে অধিষ্ঠিত হইয়া, ইংরাজী ভাষায় সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য

লাভ করিয়া তিনি যে দীনা বঙ্গভাষাকে উপেক্ষা না করিয়া তাহার সেবা করেন—তাহার উন্নতি কল্পে এত যত্ন চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন অকৃতজ্ঞ অধম তাঁহাকে দেশহিতৈষী স্বদেশ-সেবক বলিতে কুণ্ঠিত হইবে?

আশুতোষ, কবিবর রবীন্দ্র নাথকে সেই জন্যই প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি মুক্তহৃদয়ে প্রদান করিতেন। নাটোর অধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্র নাথকে সেই জন্যই দেশের গৌরব বলিয়া মহা সম্মান সমাদর করিতেন। কোন ধনী বা জমীদার সাহিত্য সেবী হইলে সেই জন্যই স্বজাতীয় সাহিত্য সেবার জন্যই তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র হইতেন। নতুবা তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ভূসম্পত্তি বা অর্থ-সম্পদের শক্তি তাহাঁর বিরাট হৃদয়কে কখনই আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

আশুতোষ নিজে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই; কিন্তু বহু বাঙ্গলা গ্রন্থের খোজ খবর তিনি খুবই রাখিতেন। বর্ত্তমান যুগের বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসুদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি বহু লেখকগণের গ্রন্থের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এমন কি তিনি 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের বহু স্থান মুখস্থ বলিতে পারিতেন। এমনই ছিল তাঁহার স্বজাতীয় সাহিত্যে প্রাণের অনুরাগ—আকর্ষণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

গৃহ ও পরিবার।

আশুতোষ সত্যই একাধারে বজ্রের ন্যায় কঠোর—কুসুমের তুল্য কোমল। কর্ম্মক্ষেত্রে আশুতোষ যেমন কঠোর কর্ম্মী, গৃহে সমাজে তিনি তেমনি সুকোমল, সদাশয় মহাপ্রাণ উদার হৃদয় ছিলেন।

তিনি সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণার ন্যায় পত্নী পাইয়াছিলেন, সুশীল উপযুক্ত পুত্রগণ পাইয়াছিলেন—লক্ষ্মী সরস্বতী সম দুহিতাগণ ও কৃতী জামাতা লাভ করিয়া—পরমানন্দে মহা শান্তিতে গৃহসুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহের সকলের প্রতি যেমন স্নেহশীল ছিলেন, তেমনি গৃহের সকলেই তাঁহাকে প্রাণের স্নেহ পুষ্পাঞ্জলিতে পূজা করিত। গৃহে তাঁহার স্নেহের সায়র শতধারে উছলিয়া উঠিত। ভাবগ্রাহী দিলীপ কুমার সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন—তাঁর স্নেহাতীত হৃদয় এতই কোমল ছিল যে তিনি শত কাজ সত্ত্বেও রাত্রে শোবার আগে দেখ্‌তেন কোনও ছেলের ঠাণ্ডা লাগছে কি না। হয় ত হিম লাগছে ভেবে এ জানালা, ও দরজা নিজেই বন্ধ করে দিয়ে যেতেন। এ সব ছোট খাট ঘটনা গুলি বাস্তবিকই হৃদয়স্পর্শী। লোকে মহতের এ সব ছোট খাট গুণের দিকে দৃষ্টি দেয় না। কিন্তু

এই সব ছোট খাট দৈনন্দিন ঘটনার মধ্য দিয়েই আসল মানুষটির স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এক এই সব স্থানেই মানুষের ফাঁকি চলে না। * * * আশুতোষকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কোমলতার দরুণ প্রিয় পরিজন বন্ধুবান্ধব দাস-দাসী সকলেই ভাল বাস্‌ত।—আশুতোষ শত শত নিরন্ন লোককে জীবনে চিরকালের জন্য অন্নদান করে গেছেন কিন্তু এ দান মহৎ দান বলেই পরিগণিত হয়েছিল; কারণ তাঁর দানের মধ্যে শুষ্ক সম্মতি মাত্র ছিল না, ছিল—হৃদয়ের পরশ। ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁর সদা সহৃদয় ব্যবহার একথার সাক্ষ্য দেবে। যে চাকুরিপ্রার্থী তার সঙ্গেও তিনি হেঁসেই কথা কইতেন—আর সে যেন কত দিনেরই আত্মীয় এই ভাবে। আশুতোষের বিশেষ পরিচিত সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বলিয়াছেন—যেরূপ হরিদ্বারে না আসিলে আদি গঙ্গা দেখা যায় না সেইরূপ ইহাঁর সান্নিধ্যে না আসিলে, ইহাঁর দয়ার শতধার দয়ার প্রস্রবণ টের পাওয়া সম্ভব হয় না। যখন দুঃখী কোন ব্যক্তি নিজের অভিযোগের কাহিনী তাঁহাকে বলিতে থাকিত তখন ইহাঁর চক্ষু সজল হইত। বাঙ্গালী জাতির কত দুঃখ, কত কষ্ট দারিদ্র্য রোগ শোক জনিত শত দুঃখে বাঙ্গালী জর্জ্জরিত——এই দুঃখ বলিবার একটা স্থান ছিল, তাই ক্ষুদ্রতম কেরাণী হইতে বিপন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সকলেই ভবানীপুরে যাইতেন। প্রাণের দুঃখ শুনিবার জন্য প্রাণের বেদনা বুঝিবার

জন্য সেখানে একটা মহাপ্রাণ ছিল, দুঃখীরা সে কথা অন্তরে জানিয়াই তাঁহার দুয়ারে ভিড় করিত। তিনি অনেক সময় কঠোর কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে চাহিতেন, কিন্তু তাহাদের ছেঁড়াকাপড়, অন্নাভাব, শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়ার উপায়হীনতা, অত্যাচারীকৃত লাঞ্ছনা প্রভৃতি শত দুঃখ যে তাঁহার হৃদয়ে কাঁটার মত বিঁধিত ইহা তাঁহার বাহ্যিক কঠোরতা সত্বেও তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিত। আমি দেখিয়াছি দুস্থ ব্যক্তির দুঃখ কাহিনীতে তিনি সময়ে সময়ে লজ্জিত হইতেন যেন তাহাদের দুঃখ বিমোচনের ভার ভগবান তাঁহার উপরই দিয়াছেন, তাই সামর্থ্যের অভাবে সময়ে সময়ে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন। তথাপি কত শত দীন দরিদ্র যে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে তাঁহা কি গণিয়া শেষ করা যায়? রাজা তাঁহার কোষাগার মুক্ত করিলে অল্প সময়ে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু আশুতোষের প্রাণের কোষাগার কে শূন্য করিবে? তাহাতে যে দয়ার অফুরন্ত প্রস্রবণ সঞ্চিত ছিল। এইজন্য রসারোডে নিত্য ভীড় হইত। তিনি অতি বড় হইয়াও অতি ছোটদের লইয়া এই ভাবে নিত্য মহোৎসব করিয়া গিয়াছেন। এই কাঙ্গালীদের জন্য তিনি বিশ্রামের দিনে বিশ্রাম করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবন ছিল—নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মশীলতা। দ্বাদশ ঘণ্টা তাঁহার দ্বার ছিল মুক্ত, সেই দ্বারে রাজার যেরূপ প্রবেশাধিকার ছিল, ফকিরেরও ছিল তাই। এই কর্ম্ম পীড়িত হইয়া কর্ম্ম ক্লান্তির মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

কখনও দেখিলাম না, একটা মাস স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবৃত হইয়া তিনি বিশ্রস্ত আলাপের সুবিধা পাইয়াছেন। তিনি নিজেকে দেশের সকলের নিকট বিলাইয়া দিয়াছিলেন, পারিবারিক প্রীতিসুখ ভোগ করিবার অবসর আমরা তাঁহাকে দিই নাই।

যাঁহারা আশুতোষের সহিত পরিচিত ছিলেন,—যাঁহারা তাঁহার আভ্যন্তরীন জীবনের কথা জানিতেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় পদে পদে পাইতেন। কার্লাইল বলিয়াছেন—দয়া দানই হৃদয়ের মহত্ত্বপ্রচার করে। আশুতোষের দান নামের দান ছিল না—দয়ার নীরব দানই ছিল।

তিনি সর্ব্বদিকে অত বড় হইয়াও যে কিরূপ অমায়িক সহৃদয় ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট পরিচয় তাঁহার ভূরিভোজন ব্যাপারে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তখন তিনি স্বয়ং যথার্থ হিন্দু যাজ্ঞিক কর্ম্মীর ন্যায় প্রতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে প্রাণখুলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিতেন—ভোজনকালে প্রত্যেকের পাতের কাছে ঘুরিয়া দেখিতেন কে কেমন পাইতেছে—কে কেমন খাইতেছে। তখন তাঁহার হৃদয়ের আনন্দসরোবর শতধারে উথলিয়া উঠিত। তখন যথার্থই মহোৎসবের রবে আশুতোষের বৃহৎভবনের চারিদিক মুখরিত হইত। তখন আশুতোষ নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক অতি উৎকৃষ্ট সুখাদ্য ভোজন করাইতেন। তখনও সেই বিখ্যাত ভীমনাগের দেবভোগ্য মহামূল্যবান সন্দেশ

অতি উৎকৃষ্ট রসগোল্লা, পানতোয়ার প্রচুর ব্যবস্থা। প্রফুল্ল বদনে আশুতোষ অতি সামান্য ভোজনকারীর নিকট যাইয়া বলিতেন—'ভাল ক'রে খাও হে। একি খাওয়া!' কি দেব হৃদয়ই করাল কালের আঁধার কন্দরে ডুবিয়াছে! আর কি ভাগ্যহীন কাঙালী বাঙালী সে মহান হৃদয়ের অমৃতধারাবর্ষী দৃশ্য দেখিতে পাইবে।

আশুতোষের কাছে ছোট বড় ভেদাভেদ ছিল না। তিনি অতি বড়কে যেমন আদর করিতেন—অতি ছোটকে তেমনি—যেন ততোধিক স্নেহ করিতেন। কত গরীব ছাত্রের পিঠ চাপড়াইয়া কত সময় কত উৎসাহের বাক্যে হতাশ অবসন্ন হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেন।

আশুতোষ মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার মোটরচালকের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। অমিততেজা আশুতোষ তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

বিবাহাদি উৎসবে তিনি আনন্দভরে সকলের গায়ে নিজ হাতে পিকচুনা দিতেন—আর হাসিমুখে তাহাদিগকে সমাদরে ভোজন করাইতেন। তাহারা বুঝিত না—বুঝিবার ক্ষমতা হারা হইত—এমন সুন্দর মনোরম অরণ্যে—এমন দুর্জ্জয় সিংহ!

আশুতোষের এমন দেব হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগের কর্ম্ম কাহিনী আর কত কহিব? সে সকল দৈনিক ছোট ছোট কর্ম্ম—একসঙ্গে স্তূপীকৃত হইয়া, বিরাট পুরুষ আশুতোষকে বঙ্গের বিরাট হিমালয়ে পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের বিশদ বিস্তৃত

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে আর একখানি রামায়ণ বা মহাভারত লিখিতে হয়। সামান্য দুই একটি মাত্র উল্লিখিত হইল।

আশুতোষের এই অমৃতের অনন্ত উৎস হৃদয়, আবার প্রয়োজন ক্ষেত্রে কিরূপ দুর্জ্জয় সিংহ বিক্রমশালী হইত তাহা সাদা হইতে কালা পর্য্যন্ত সবাই জানে। একবার আশুতোষ ট্রেণে আসিতেছিলেন। সঙ্গে ছিল একজোড়া সখের নাগরা। গাড়ীতে এক মিলিটারি বড় সাহেব ছিল। সে সভ্যতা বিবর্জ্জিত হীনচেতা—আশুতোষের সহিত আলাপও করে নাই তাঁহার মর্ম্মও বুঝে নাই। গাড়িতে উঠিয়া একটু পরেই আশুতোষ তন্দ্রাগ্রস্ত হইলেন। বর্ব্বর মিলিটারী সাহেব আশুতোষের নাগরা জুতা দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সাহেবের মনে হইল—'আমার সঙ্গে এক গাড়ীতে চড়ে যে, তার পায়ে এই নাগরা জুতা?' সাহেব জুতা জোড়টি দূরে নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ পরে সাহেব একটু ঘুমাইলে, আশুতোষ জাগিয়া দেখিলেন তাঁহার নাগরা জুতা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর সে গাড়ীতে অন্য আরোহী ছিল না। আশুতোষ বুঝিলেন—এ দুর্ম্মতি সাহেবের কর্ম্ম। আশুতোষ সাহেবের ছাড়া কোটটি লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সাহেব জাগিয়া ব্যাপার দেখিল—কহিল—'আমার কোট কৈ?' আশুতোষ সদর্পে কহিলেন—'Your coat has gone to fetch my shoe.' তোমার কোট আমার জুতা আনিতে গিয়াছে। সাহেব বুঝিল—ভীষণ

সিংহের গায়ে হাত দিয়াছে। বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্টভাবে কত কি বলিয়া নীরব হইল।

আশুতোষ কঠোরে কোমলে—বজ্রে কুসুমে, লৌহে নবনীতে মিশ্রিত অপূর্ব্ব পুরুষশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মহান চরিত্রে দোষ ত্রুটি যাহাই থাকুক গুণ যে অশেষ অসাধারণ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মৃত্যুব্যাপার আশুতোষের অসাধারণ মহত্ব বিরাটত্ব পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত করিয়াছে। বিহারে পাটনা ষ্টেশনে, বঙ্গে হাওড়া ষ্টেশন হইতে কেওড়াতলার শ্মশান পর্য্যন্ত কি অভূতপূর্ব্ব জনতার দৃশ্য! ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, স্বদেশী বিদেশী, পুরুষ স্ত্রী কত শত লোক সজল নেত্রে মহাপুরুষের পবিত্র দেহ-খানি দেখিবার জন্য সেই বিষম রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়াছিল। শ্মশানক্ষেত্রে কি অপূর্ব্ব হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। মহাপুরুষের চিতাভস্ম লইয়া কি কাড়াকাড়ি। সকলের মুখে কি এক হতাশ নৈরাশ্যের চিহ্ন!

উনবিংশ অধ্যায়।

ধর্ম্মমত—ধর্ম্মভাব।

আশুতোষ যে মহা চরিত্রবান ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তাহা তাঁহার বিপক্ষগণও অস্বীকার করিতে পারে না। সুনীতি সৎ-ধর্ম্ম আশুতোষের জীবনের প্রধান আশ্রয় অবলম্বন ছিল। তিনি অর্থের জন্য, যশের জন্য বা সম্মানের জন্য কখনও নিজের বিবেক-বুদ্ধি বা ধর্ম্ম বিশ্বাসকে বলি দেন নাই।

কয়বার মধুপুরে ও এখানে ধর্ম্ম সভায় আশুতোষের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় আমরা তাঁহাকে পরম জ্ঞানী ধার্ম্মিক বলিয়াই বুঝিয়াছি। তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি মনুষ্যপ্রকৃতির এই ত্রিতত্ত্বের ত্রিপন্থাকে ধরিয়াই ধর্ম্মের বিশাল সাধন-ক্ষেত্রে গীতাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

আমরা কখন কখন তাঁহার সংস্রবে আসিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় গীতার ধর্ম্মকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া তিনি অবধারণ করিয়াছিলেন। গীতা যেন তাঁহার কণ্ঠস্থ হৃদয়স্থ ছিল। .গীতার বহুশ্লোক তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন।

বাঙ্গলার নবজাগরণের দিনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনস্বীগণ গীতা লইয়া যে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করেন, তদবধি

এদেশে নব্য-জীবনের ধর্ম্মক্ষেত্রে গীতা-যুগের সূত্রপাত ঘটিয়াছে। তদবধি গীতা নব্যবঙ্গের প্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থরূপে পূজিত হইয়াছে। যেমন খ্রীষ্টানের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ, তেমনি নব্য হিন্দু বাঙ্গালীর গীতাই ধর্ম্মের পরম উপাস্য আদর্শ পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গীতা ধর্ম্মই বর্ত্তমান বঙ্গের যথার্থ যুগধর্ম্ম। নব যুগের নব্য বঙ্গের আদর্শ পুরুষ আশুতোষের উপর সেই যুগ-ধর্ম্মের প্রভাব প্রচুর পরিমাণেই প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

জগতের সকল শ্রেষ্ঠ আদর্শ জীবনের মত আশুতোষের জীবনেও কর্ম্ম ও ভাব (idealism and practical) দুইটী দিকই বিশেষরূপে বিকশিত হইয়াছিল। কেবল ভাব লইয়া—ভাবুক হইয়া—আশুতোষ যেমন চুপ করিয়া বসিয়া রহিতে পারিতেন না, তেমনি ভাব হীন চিন্তাহীন কর্ম্মীর ন্যায় কেবলই স্থুলকর্ম্ম ধরিয়া প্রাণপাত করিতেন না।

প্রতীচ্য-মনোবিজ্ঞান মানব মনের তিনটী তত্ত্ব—বেদনা, বাসনা ও জ্ঞান (feeling, willing, knowing) বিভাগ করিয়া, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া, অনুশীলন তত্ত্ব (culture) নির্দ্ধারণ করিয়াছে ; আর তাহাতেই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি, তাহারই চরম সাধনায় অতিমানবের 'Superman' উদ্ভব সিদ্ধান্ত করিয়াছে। গীতা সে পরম তত্ত্ব বহু পূর্ব্বে জগৎকে দেখাইয়াছে ও মনুষ্যত্বের তিন তত্ত্বের তিন শ্রেষ্ঠ সাধন স্তর—বাসনায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানে জ্ঞানযোগ, বেদনায়

ভক্তিযোগ নির্দ্ধারণ করিয়া মনুষ্যত্ব অভিব্যক্তির প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে। প্রাচ্যে প্রতীচ্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রতীচ্যের অতিমানব (Superman) যেমন ইহকালসর্ব্বস্ব ভোগী-জীব, গীতার আদর্শমানব দৈহিক আধ্যাত্মিক উভয় শক্তিসম্পন্ন মহাত্যাগী যোগী পুরুষ।

আশুতোষ গীতার এই সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রাণে প্রাণে অনুধাবন ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। জড়প্রায় মূঢ় জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার পক্ষে গীতাধর্ম্মই যে প্রকৃষ্ট উপযুক্ত, তাহা তিনি ভালই বুঝিতেন। আরও বুঝিয়াছিলেন গীতার মহামহিমাময় ধর্ম্মই জগতের ও জীবনের পক্ষে পরম মঙ্গলকর—অতি শুভদ। তাই হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়া ব্যরিষ্টার গার্থকে বলিয়াছিলেন—'মিঃ গার্থ, তুমি জান না এই অমূল্য গীতা গ্রন্থ কি শান্তি, কত আনন্দের আধার।'

হিন্দুর পক্ষে গীতার তুল্য ধর্ম্মগ্রন্থ আর কি আছে? সাংখ্য বেদান্তের দার্শনিকবিজ্ঞান, উপনিষদের আধ্যাত্ম বিজ্ঞান আদি ধর্ম্মের সকল শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর পাতঞ্জলাদির যোগ-পন্থা সকলেরই সূক্ষ্মতত্ত্ব একমাত্র এই অমূল্য অতুল্য গীতা গ্রন্থে সন্নিবেশিত। গীতা, জ্ঞান পন্থী ভক্তি পন্থী মাত্রেরই আশ্রয় স্থল। গীতা পরম জ্ঞানী-ভক্ত আশুতোষের ধর্ম্মের অবলম্বন-দণ্ড হইয়াছিল। তাই আশুতোষ গীতার গূঢ়পন্থা অবলম্বন করিয়া, জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে আচরণ অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধি, সাফল্যের এমন কৃতার্থতা প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আশুতোষ, অধিকার অনুসারে ধর্ম্মের স্তরগত-প্রভেদ মানিতেন। জ্ঞানপন্থার দিক দিয়া দেখিলে বা বুঝিলে তাঁহাকে বিশুদ্ধ বৈদান্তিক বলিয়াই উপলব্ধি হইত। আত্মাকে পরিস্ফুরণ দ্বারা ভূমায় পরিণতি, অন্যকথায় আত্মদর্শন বা ব্রহ্মানুভূতি যে ধর্ম্মের চরমস্তর, আর তাহাই যে শ্রেষ্ঠ সাধকের শ্রেষ্ঠ সাধনপন্থা তাহা তিনি প্রকৃষ্ট রূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে, আশুতোষকে এইরূপ বিশুদ্ধ বৈদান্তিক বলিয়াই অনুমিত হইত।

তিনি নিজে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। উচ্চ তত্ত্ব চিন্তায় গভীর গবেণায় তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তদ্ব্যতীত বহু পণ্ডিতের গুঢ় তত্ত্বপূর্ণ বহু দার্শনিকগ্রন্থ তিনি সুন্দররূপেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল, আশুতোষ কেবল স্থূল জড়বিজ্ঞানের পরিচর্চ্চা করিতেন। তাহাতেই তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ধার তিনি ধারিতেন না। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। আশুতোষ সত্যই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে—কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য উভয় দর্শন শাস্ত্রেই—তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হিন্দুর বেদান্ত, সাংখ্য, বৈষেশিক, ন্যায় হইতে পাশ্চাত্য কাণ্ট, কোমট, হিগেল, মিল আদি সকল শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের দর্শন তিনি বিশেষ অধ্যয়ন ফলে অধিগত করিয়াছিলেন।

আত্মদর্শন অসম্ভব (Introspection is impossible) কোমতের এই নির্দ্দেশকে হিন্দুর পক্ষে খাটে না বলিয়া তিনি উপেক্ষা করিতেন। তিনি জানিতেন—এবং বলিতেন যে আত্মদর্শনই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদকে (Rationalism) ভক্ত হিন্দুর মতস্থ নাস্তিকধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিতেন। একবার অসাধারণ প্রতিভাশালী যুক্তিবাদী দার্শনিক কবি নোভালিজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। নোভালিজ বলেন—'আত্মার ধ্বংস সাধনই দার্শনিক ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব—(The first act of philosophy is the annihilation of self)। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ হাসিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—'আপনাকে উড়াইতে পারিলে তো ভাল হয়। কিন্তু এটা মরেও না ছাড়েও না।' সঙ্গে সঙ্গে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—'অজো নিত্যয় শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'

নৈতিক হিসাবে আশুতোষ পরম মঙ্গলবাদী (Optimist) ছিলেন। তিনি বিষাদবাদ (Pessimism) বা বর্দ্ধিষ্ণু সুখ-বাদ (Melirlsm) মোটেই মানিতেন না। সে সকল বাদের যুক্তি-প্রণালী তিনি অবহেলা করিতেন। আধুনিক সুখবাদ (Utiliterianism) বা তিনি যথার্থই উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন।

মঙ্গলে মঙ্গলময় ভগবানের জগতের সৃষ্টি—মঙ্গলে এই

জগতের স্থিতি—মঙ্গলই ইহার চরম পরিণতি! মঙ্গলবাদের এই তত্ত্ব কথা মানিয়া আশুতোষ সর্ব্বত্রই ভগবানের শুভ ভাব শুভ বিধান সন্দর্শন করিয়া ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইতেন। আশুতোষ ভগবানের পরমভক্ত—অনুরক্ত সাধক ছিলেন।

আমি যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া অন্তরের নিভৃত কোণে পূজা করিতেন। কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণ কথায় তাঁহার প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইত। আশুতোষ যথার্থই মহাভক্ত মহাজন ছিলেন। তাঁহার এক একটা জ্ঞান ভক্তির কথায় মনে হইত আশুতোষ একজন দৃঢ় ধর্ম্ম-সাধক।

আশুতোষের প্রাণে ঈশ্বরের সগুণ নির্গুণ (God personal and impersonal) উভয় ভাবেরই স্থান ছিল। তিনি জানিতেন বুঝিতেন ধর্ম্ম সাধারণ মানবের পক্ষে সত্যই একটা বিষম দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা। সাধনার স্তরভেদে ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে সাধকের প্রাণে প্রস্ফুরিত হয়। এ সিদ্ধান্তে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। আমাদের মনে হয় আশুতোষের ধর্ম্ম সাধনার পন্থা প্রণালী ঐরূপই ছিল। আবার কর্ম্মক্ষেত্রে আশুতোষ ছিলেন মহা আনুষ্ঠানিক হিন্দু। আচারে ব্যবহারে ক্রিয়া-কলাপে তাঁহার হিন্দু অনুষ্ঠান, হিন্দু সমাজের হিন্দু আচরণ কে না দেখিয়াছে?

আশুতোষের গৃহে দুর্গোৎসবাদি দেবতাপূজার অনুষ্ঠান, বিবাহে উপনয়নে নৈষ্ঠিক হিন্দুর পবিত্র আচরণ, কুল-ধর্ম্মের বিধান বহু লোকই প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

তাঁহার ভক্তির কথা আর কি বলিব? প্রাণের প্রিয়তমা দুহিতা লক্ষ্মীরূপিণী কন্যা কমলা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলে বীর্য্যবান ধৈর্য্যবান মহাপুরুষ শোকে কাতর হইয়াছিলেন। তিনি তখন পুরীধামে গমন করিয়া জগন্নাথের মন্দিরে গড়াগড়ি দিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলেন—'ঠাকুর আমায় শান্তি দাও।'

সৌন্দর্য্য-অনুশীলন, শক্তিরউদ্বোধন ভাবেরউন্মেষণ একাধারে দুর্গোৎসবে সকল ভাবের সাধনাই সংসিদ্ধ হয়; আশুতোষের ইহাই হৃদয়ের ধারণা ছিল। সেই ধারণার বশেই তিনি বর্ষে বর্ষে দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন।

মহাশক্তিবিভূতির—পরম সৌন্দর্য্য-সম্পদের প্রতীক (Symbol) রূপে আশুতোষ দুর্গোৎসবাদির পূজা অনুষ্ঠান করিতেন। সেই সকল উৎসবকালে আশুতোষের ভক্তিভাব দেখিয়া, তাঁহাকে কে পুতুলউপাসক অন্ধ ভ্রান্ত পৌত্তলিক ভাবিতে পারিত? যখন আশুতোষ ভক্তিভাবে বিভোর তন্ময় হইতেন, তখন তাঁহার জড়ভাব বাহ্যভাব ঘুচিয়া যাইত—তিনি মহাভক্তি-ভাবাপন্ন সাধক ভক্ত হইয়া উঠিতেন।

এই ভক্তির ভাবে উচ্ছসিত না হইলে জগন্নাথদেবের জড়মূর্ত্তির সম্মুখে আশুতোষের কখনই ঈশ্বর দর্শন ঘটিত না—আর তাহা

না হইলে আশুতোষ কখনই প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারিতেন না—'ঠাকুর' আমায় শান্তি দাও।' যখন আশুতোষ এইভাবে বিভোর হইতেন, তখন তিনি যথার্থই দিব্যদৃষ্টিতে বিশ্বরূপ দর্শন করিতেন। বাহিরের স্থূলভাব—জড় জগতের জড়ত্ব তাঁহার প্রাণের চক্ষু হইতে মুছিয়া যাইত। তখন তিনি গীতায় সেই মহাবচনের সার্থকতা সাধনে সমদর্শী হইয়া তাহার সত্যতা স্বীয় হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন।

"সর্ব্ব ভূতাস্থমাত্মানাং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মানি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন ॥

তখন আশুতোষের সর্ব্বভুতে পরমাত্মা দর্শন ঘটিত। আর তখন তাঁহার মানবজন্মকে ধন্য কৃতার্থ করিয়া উদয় হইত সেই পরম ভক্তের মহাজ্ঞান :—

"যজজ্ঞাত্বা ন পুন র্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষাস্যাত্মনথো ময়ি ॥

ধর্ম্ম ব্যাপারে আশুতোষ যেমন জ্ঞানভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিলেন, তেমন সাধক এখন আর কোথা? মহাপুরুষের এইতো পূর্ণ অভিব্যক্তি—এই তো ধর্ম্মের সাধনা সিদ্ধি।

আচার্য্য শঙ্করের বিখ্যাত বেদান্ত ভাষ্য শারিরকে উল্লিখিত শ্রবণ মনন, নিধিধ্যাসনাধি জ্ঞান ধর্ম্মের গুঢ় মর্ম্ম যেমন তিনি সাধনা করিতেন, তেমনি সন্ধ্যাবন্দনাদি ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গাদি

তিনি নিয়মিতভাবে নিত্য অনুষ্ঠান করিতেন। পুত্রের উপনয়ন কার্য্যে তিনি স্বয়ং আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে আশুতোষ যখন স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ শঙ্করের ন্যায় সমাধিস্থ বলিয়া বোধ হইত।

আশুতোষ, বাহ্য আচরণে আনুষ্ঠানিক হিন্দুর মতই ব্যবহার করিতেন। তখন হিন্দুর অতি ক্ষুদ্র আচরণকেও তিনি অশ্রদ্ধা করিতেন না। একবার তৈলাক্ত দেহে একব্যক্তি তাঁহার পদরজ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—'তুমি হিন্দু, আমার এই তেলমাখা অবস্থায় তুমি কেমন করিয়া আমায় প্রণাম করিবে?'

হিন্দুর আচরণে—হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার এমনই প্রাণের আস্থা ছিল।

নৈতিক হিসাবে আশুতোষ বিশ্বপ্রেমিক (cosmopolitan) ছিলেন। শুধু আপনার দেশ—আপনার জাতি বলিয়া যে বিশাল বিশ্বের সমগ্র মানব সমাজের মঙ্গল কামনাই শ্রেষ্ঠ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। প্রকৃত বৈদান্তিকের ন্যায় তিনি বুঝিতেন—মায়ার বিড়ম্বনায় আত্মায় আত্মায় জীবে জীবে যে ভেদভাব, ভেদ জ্ঞান তাহাই দূরীভূত করিয়া অবশেষে ব্যষ্টি আত্মার সহিত সমষ্টি পরমাত্মার সহযোগই প্রকৃত বৈদান্তিক ধর্ম্ম। এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া যে বিশ্বব্যাপী

প্রেম গড়িয়া উঠে তাহাই শ্রেষ্ঠ নীতি—তাহাই বিশুদ্ধ মঙ্গলবাদ (optimism).

এই ধর্ম্ম—এই নীতি—এই মহানভাব হইতে তিনি ইতিহাসে ভগবৎ সত্বা 'God in history' মানিয়া লইয়াছিলেন। মানবজাতির ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির মূলে ঈশ্বর শক্তি তাঁহার পক্ষে স্বতসিদ্ধ কথাই হইয়াছিল। সুতরাং প্রাচ্য প্রতীচ্যের সহযোগ সহানুভূতি আর ব্রীটন ভারতের একই ক্ষেত্রে সম্প্রীতি মূলক সম্মিলনের একটী গুঢ় উদ্দেশ্য তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট।

আশুতোষ কি ছিলেন—কত বড় ছিলেন, তাহা ঠিক যথার্থ ভাবে বুঝিবার সময় এখনও আমাদের হয় নাই। তিনি যে সকল মহৎ কর্ম্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাদের ফল যতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই মহাপুরুষ আশুতোষের কৃতীত্ব প্রকটিত হইতে থাকিবে, আর সেই পরিমাণে কেবল স্বজাতি কেন—সমগ্র মানব জাতি তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

আপনার সময়ের আপনার নিজদেশের লোক মহাপুরুষের মহত্বের ঠিক পরিমাণ করিতে পারে না। মানুষ এতই অন্ধ এতই ভ্রান্ত যে সে অনেক সময় আপনার সম্মুখের লোক চিনিতে পারে না। আমরা কি জানি না যে একই পরিবারের মধ্যে বসবাস করিয়াও, পরিবারের সকলকে ঠিক যথাযথভাবে আমরা জানিতে বা বুঝিতে পারি না? স্থূলদর্শী লোকের কথা তো বহুদূরের কথা। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও অর্জ্জুনেরও দৃষ্টি তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। বিরাট মুর্ত্তিতে বিভূতি ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া, ভগবানকে আপনার বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে বুঝাইতে হইয়াছিল। আশুতোষ আমাদিগকে কোন অতিমানুষিক অতি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া (miracle) দেখাইতে

পারেন নাই। কিন্তু কিছুদিনেই আমরা বুঝিব—আশুতোষ সত্যই অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন—যাহা বাঙ্গালীর পক্ষে অদ্ভুত—সত্যই সে অপূর্ব্ব miracle সাধন!

আশুতোষের বহু বিপক্ষ ছিল। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষেরই মিত্র থাকে—আবার বহু শত্রুও থাকে। আশুতোষেরও তেমনি বহু বৈরীও ছিল। তাহারা অনেক কার্য্যে আশুতোষের কাজের ত্রুটি দেখাইয়া নিন্দাবাদ করিত। শিশুপাল, কংসের কথায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিলুপ্ত হয় নাই।

বিপক্ষ বৈরীগণ, তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ ভীত অবনত হইয়া রহিত। কঠোর কর্ম্ম-সাধনা ও সত্যঅনুরাগের ফল হইতেই আশুতোষের অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার আবির্ভাব—যাহার গর্জ্জনে ভ্রূকুটিভঙ্গিতে গর্ব্বোন্নত বুরোক্রাশি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত—সাধারণ বিপক্ষতো দূরের কথা।

আশুতোষ তোষামদপ্রিয় ও তোষামদীদিগকে অযথা আশ্রয় দিতেন, প্রতিপালন করিতেন, এই একটা নিন্দারকথা তাঁহার অনেক বৈরীগণের মুখে অনেক সময় শুনা যাইত। কিন্তু তাহারা জানিত না—অথবা জানিয়াও জানিতে চাহিত না যে আশুতোষ কখন অন্যায়রূপে গুণহীন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে পোষণ পালন করেন নাই। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত—তাঁহার পার্শ্বে অনুক্ষণ ঘুরিত—হয় তো তাঁহার স্তুতি করিত। উপাসনা করিলে, স্তব করিলেই যদি তোষামদ করা হয়, তবে ভক্তি বলিয়া একটা শ্রেষ্ঠ ভাবের স্থান মনুষ্যত্বের

হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে হয়। যে আশুতোষের সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই আশুতোষের অপূর্ব্ব জ্ঞানবুদ্ধি কার্য্য, সাধনা সরলতা সহৃদয়তা, প্রাণের অকৃত্রিম অনুরাগ—যাহাতে লেফাফা দুরস্ত মৌখিক মোহ মদিরার লেশ গন্ধ মাত্র ছিল না—একাধারে এই সকল শ্রেষ্ঠ গুণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া কাহার প্রাণ না ভক্তিভরে আপ্লুত হইত !

আশুতোষ নরদেহধারী নর। তাঁহাতে ভ্রম ত্রুটি থাকিবারই কথা। আশুতোষ তো পূর্ণ ভগবান ছিলেন না—মানুষ ছিলেন। মানুষের বুদ্ধি দিয়াই তাঁহাকে বিচার করিতে হয়। নিরপেক্ষ বিচারে বুঝা যায়—আশুতোষের দোষ থাকিলেও সে পূর্ণ-চন্দ্রে কলঙ্ক—কমলে কাঁটা। যে যাহাই বলুক আশুতোষ যে কত বড় ছিলেন তাহা এক কথায় বর্ত্তমান বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠনেতা দেশবন্ধু স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ চিত্তরঞ্জন অতি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—"তিনি (আশুতোষ) উৎকৃষ্ট বিচারপতি ছিলেন, কিন্তু শুধু উৎকৃষ্ট বিচারপতি বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়, তিনি শিক্ষার অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, কিন্তু শুধু শিক্ষার নেতা বলিলে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা হইতে অনেক বড় ছিলেন, সমাজ সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু শুধু সে দিক দিয়া দেখিলেও তাঁহার সকল দিকটা দেখা হয় না। তিনি ছিলেন একটা জাতকে গড়িয়া তুলিবার বিশ্বকর্ম্মা। কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না ? কোন দিক সামলাইবার জন্য তাঁহার হস্ত প্রসারিত হইত না ?'

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাইকোর্টে খুব বড় কাজ করিতেন। আবার বাঙ্গালী কীর্ত্তনীয়াদিগের উৎসাহিত পুরস্কৃত করিবার সভায় সভাপতি হইতেন। মধুপুরে বিখ্যাত কথকের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে নিজভবনে আনিয়া উৎসাহিত করিতেন। এমন সর্ব্বদিকে দৃষ্টিসম্পন্ন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ আর এ পতিত বাঙ্গলায় কে? কে আর বাঙ্গলাকে উদ্ধার করিবে—বাঙ্গালীকে জীবন দিয়া জাগাইবে।

সমাপ্ত